প্রতিচিন্তা

খতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

পঞ্চম বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০১৫

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও জোশিতা জিহান অর্নব

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2015; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনৈতিক অর্থনীতি

ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি ৯
নুরুল ইসলাম

পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা সম্পদ : প্রামাণ্য মূল্যায়ন ১৫
আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

প্রবাসে বাংলাদেশ

একাত্তরের সত্তা : যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ টাওয়ার হ্যামলেটকে তাড়িয়ে বেড়ায় ৩৫
সারাহ গ্লিন

অনুস্মৃতি

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রেকর্ড করা হয় ১৯৭০ সালের আগেই... ৫৫
আবদুল আহাদ

সীমান্ত ইতিহাস

১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস ৮১
আশফাক হোসেন

সমাজ

বাংলাদেশে কিশোরীদের যৌন হয়রানির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ১৩১
পাপড়ীন নাহার, মার্টিন ভ্যান রিওয়্যাক, রিয়া রিইস

পর্যালোচনা নিবন্ধ

স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র ১৫১
মিজানুর রহমান খান

বই আলোচনা

ভয়ের সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধান ১৭৬
রেজাউল হক

লেখক পরিচিতি ১৮৬



ষাট দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা ব্যাপকভাবে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত। এ ছয় দফার ভিত্তি রচিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে এ অঞ্চলের প্রথিতযশা তৎকালীন সময়ের তরুণ অর্থনীতিবিদেরা যখন দুই অর্থনীতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম তাঁর 'দুই অর্থনীতি : ছয় দফার ভিত্তি' প্রবন্ধে এ তত্ত্ব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস জানানোর প্রয়াস পেয়েছেন। লেখাটি তাঁর গ্রন্থ *মেকিং অব এ নেশন বাংলাদেশ : এন ইকোনমিস্ট'স টেল* থেকে অনূদিত হয়েছে।

পাকিস্তানি শাসনের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির ৪৪ বছর পার করতে চলেছি আমরা। মানবতাবিরোধীদের বিচারকার্যের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসক ও সেনাবাহিনীর এদেশীয় তাদের সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতন ও অনাচারের যাতনা কিছুটা হলেও লোপ পাবে। মুক্তির স্বাদ পরিপূর্ণ করতে তা অপরিহার্য। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় পাওনা রয়েছে তা যে আদায় হয়নি, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের কাছে কী পরিমাণ সম্পদ পাবে এবং তা আদায়ের মাধ্যম কী হতে পারে, সে সম্পর্কে এদেশের মানুষের ধারণা থাকা দরকার। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তাঁর লেখায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিকীসহ লেবার পার্টি থেকে তিনজন বাঙালি বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের সংসদ সদস্য এবার নির্বাচিত হয়েছেন। যেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর নাতনি নির্বাচিত হয়েছেন, সেই টাওয়ার হ্যামলেট ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালি সত্তার সঙ্গে একীভূত এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। টাওয়ার হ্যামলেটের ভূমিকা এবং সেখানে বাংলাদেশের উত্তরাধিকার নিয়ে *প্রতিচিন্তার* পাঠকদের জানানোর উদ্দেশ্যে সারাহ গ্লিনের এই প্রবন্ধটি ছাপাতে উৎসাহী হলাম।

'১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস' লেখাটি ঐতিহাসিক কিছু প্রশ্ন সামনে রেখে তার তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক হবে। আশফাক হোসেন সেই নির্দিষ্ট সময়ে আসাম ও সিলেটের সার্বিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভূমিকার বিশ্লেষণ তুলে এনেছেন। সীমান্ত ইতিহাসের ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিকটি বিবেচনায় নিয়ে লেখাটি ছাপানো হলো।

'ইভ টিজিং' বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলেও দেশের আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য কুফল রয়েছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইভ টিজিংয়ের ফলে তাদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। 'বাংলাদেশে কিশোরীদের যৌন হয়রানি এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা' প্রবন্ধে ইভ টিজিং সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, যা এ বিষয়ের নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

সংগীতজ্ঞ আবদুল আহাদ এ দেশের সংগীত অঙ্গনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। দেশভাগের পরে সংগীত জগতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের সাধারণ সংগীতপ্রেমী মানুষ ও সংগীত গবেষকদের জন্য আবদুল আহাদ সম্পর্কে জানা জরুরি। এ দেশের সংগীতোন্নয়নে তা তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে আশা করি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় আবদুল আহাদের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন সালাহউদ্দিন আহমেদ ও মুস্তফা নূরউল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, তাঁর জবানিতে আমাদের জাতীয় সংগীত-বিষয়ক এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে তুলে আনা হলো।

বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে শাসকেরা তা বাস্তবায়নে কখনোই মনোযোগী হননি। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বদলে ক্ষমতা কেন্দ্রে কুক্ষিগত করে রাখাই নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সরাসরি রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় স্থানীয় নির্বাচন আইন হতে চলেছে। সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষাপটে কামাল হোসেনের বই *বাংলাদেশ : কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস*-এর আলোকে সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান 'স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র' নামে পর্যালোচনা নিবন্ধটি লিখেছেন। লেখাটি পাঠককে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে সহায়তা করবে।

বর্তমান বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতির পেছনে বিভিন্ন সময়ে শাসক দল ভূমিকা রেখেছে। শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অনাচার, শোষণ ও দুর্নীতির চর্চাকে অব্যাহত রাখতে ব্যবহার করা হয়েছে আতঙ্ক ও সন্ত্রাস। যার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এক ভয়ের সংস্কৃতি। এ বিষয়ে বুঝতে হলে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আলী রীয়াজের *ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি* গ্রন্থটি অনবদ্য ভূমিকা রাখবে। তরুণ গবেষক রেজাউল হক এই বইটি আলোচনা করেছেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি

নুরুল ইসলাম

দুই অর্থনীতির তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে চিন্তার সূত্রপাত হয়, কীভাবে সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা করা যায় এবং অর্থনীতির শ্লথ প্রবৃদ্ধির চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এই নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের আর্থনীতিক কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যথাযথ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী ও ধারণাগত কাঠামো হিসেবে এই তত্ত্ব পেশ করা হয়েছিল।

একই সঙ্গে, রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিণতিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের কার্যত মৃত্যু হয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় দলটির এ পরিণতি হয়, ফলে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিষয়টি উঠে আসে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, দুই অর্থনীতির তত্ত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া এবং তার প্রকৃত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা। পাকিস্তানের উন্নয়নের এই কাঠামোর উৎস নিয়ে গত কয়েক বছরে গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, যার মধ্যে অনেক কথাই ভুল ও অযথাযথ। কিন্তু ছয় দফার—যার মূল অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ ছিল এই ধারণা—ভিত্তিতে পরিচালিত স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষমেশ সফল না হলে এই যুগান্তকারী ধারণা হয়তো মহাফেজখানায় পোকার খাদ্যে পরিণত হতো, সেটা এতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। সর্বোপরি, মানুষ সফলতার ভাগীদার হতে চায়, ব্যর্থতার নয়।

পাকিস্তানে যে দুটি অর্থনীতি বিরাজ করছে, এই ধারণা প্রথম তোলা হয় ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের প্রথম খসড়া পঞ্চবার্ষিক (১৯৫৬-১৯৬০) পরিকল্পনার জন্য উন্নয়ন

কৌশল প্রণয়নে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের বিশেষ সম্মেলনে এই ধারণাটি পেশ করা হয়। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে ঢাকায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনের বিশেষ প্রতিবেদনে এই ধারণার মূল দিকগুলো বিস্তৃত করা হয়, যে প্রতিবেদন ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। পুরো প্রতিবেদনটি আমার বই *বাংলাদেশ—মেকিং অব দ্যা নেশন*-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রতিবেদনের যে অংশটি নিচে উদ্ধৃত করছি, সেটার আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই : 'পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে, বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য, দেশটিকে দুটি ইউনিটে ভাগ করতে হবে। পাকিস্তানের দুটি ইউনিটের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলেই তার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অধিক জনসংখ্যা, তুলনামূলক অধিক বেকারত্ব এবং দুটি ইউনিটের মধ্যে শ্রমিকদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় একেবারেই না যাওয়া—এসব বিষয় আমলে নিতে হবে'। 'আমাদের মতে, পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক অপরিহার্যতা হচ্ছে, দুটি অংশের পরিসংখ্যান আলাদা আলাদাভাবে দেখানো, যেমন : জাতীয় আয়, ব্যালান্স অব পেমেন্ট ও আর্থিক সম্পদ—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক'। ১০ জন অর্থনীতিবিদ এটি প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করেছিলেন, আর সম্মেলন তা অনুমোদনও করে। এই ১০ জনের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে কনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, তার আগের বছরই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে আমি হার্ভার্ড থেকে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছি। অন্যান্য অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন : এম এন হুদা, মাজহারুল হক, এ রাজ্জাক, নুরুল ইসলাম, এ সাদেক, এ ফারুক, এ এন এম মাহমুদ, মো. সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ হোসেন ও শফিকুর রহমান। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই মানুষদের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। ১৯৫৯-৬০ সালে দ্রব্যমূল্যের দ্রুত বৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখতে গঠিত প্রাইস কমিশনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় আমি উপর্যুক্ত কাঠামোটি বাজিয়ে দেখতে পেরেছিলাম। কমিশনে আমিই ছিলাম একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ সদস্য। দুই অর্থনীতি তত্ত্বের মৌলিক প্রস্তাব ছিল, দাম বাড়াসহ সব অর্থনৈতিক বিষয়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতির মাত্রা ছিল অনেক বেশি। আর এর কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও দুই পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভিন্ন। কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা এর কঠোর বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে নতুনভাবে দেখার ব্যাপারটা তাঁদের কাছে ছিল অভিশপ্ত ব্যাপারের মতো, এর মধ্যে তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ পেয়েছেন। কমিশনের প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত ও পৃথক নোট দিয়ে আমি বাধিত হয়েছিলাম।

পরবর্তী কাজ ছিল পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধারণা পেশ করা, অর্থাৎ দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছে ব্যাপারটি তুলে ধরা। ১৯৬১ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার আমন্ত্রণ পান। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অনুন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার। এই দলে ছিলেন এম এন হুদা, এ এফ এ হুসেইন, আবদুল্লাহ ফারুক (মাজহারুল হকের অনুপস্থিতিতে) ও নুরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের বিস্ময়করভাবে দীর্ঘ ও খোলামেলা মতবিনিময় হয়। আলোচনার পর তিনি একটি লিখিত স্মারকে আমাদের বিশ্লেষণ ও সুপারিশ পেশ করতে বলেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে আমরা সেই স্মারকলিপিটি তাঁর কাছে পেশ করি। দলের তরুণতম সদস্য হিসেবে প্রতিবেদনটি লেখার দায়িত্বও আমার ওপরই ন্যস্ত হয়। দলের সদস্যরা এর সঙ্গে একমত হয়ে তা অনুমোদন করলে আইয়ুব খানের সচিবের কাছে আমরা সেটা পাঠিয়ে দিই। যেহেতু তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই জীবিত আছি, ফলে তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার মৃত সহকর্মীদের অবদানের কথা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিজ কাঁধে তুলে নিলাম। স্মারকলিপিটির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের প্রণীত আগের একটি প্রতিবেদনের বিস্তৃত রূপ (আমার বই *বাংলাদেশ—মেকিং অব দ্যা নেশন*-এ এটি পুনর্মুদ্রণ করেছি)।

স্মারকলিপিটির মূল বিশ্লেষণ ও সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ : দুই অর্থনীতি তত্ত্বের সারকথা হলো, পাকিস্তানের দুই ইউনিটের শ্রমিকদের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে আসা-যাওয়ার অভাব। পাকিস্তানের এক অংশে বিনিয়োগ হলে আরেক অংশের শ্রমিকেরা সে কারণে লাভবান হয় না। দুই অংশের মধ্যে পুঁজি সঞ্চালনের মাত্রাও সীমিত হওয়া এবং যোগাযোগের খরচ বেশি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। তা ছাড়া দেখা গেছে, যোগাযোগের খরচ বেশি হওয়ায় পাকিস্তানের এক অংশ থেকে আরেক অংশে পণ্য রপ্তানি করার চেয়ে একই দামের পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা সাশ্রয়ী।

ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা না করে মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়, ফলে বৈষম্য বাড়ে। এর কারণ হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক স্থানের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবকাঠামো স্বাধীনতার আগে থেকেই উন্নত হওয়ায় সেখানে বিনিয়োগ করা অধিক লাভজনক ছিল। কিন্তু দেখা গেল, স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে অধিকতর বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল, সেটা আর হলো না। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো এ কারণে যে স্বাধীনতার পর অনুন্নয়ন ব্যয়েরও সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানেই হয়েছে। আর প্রতিরক্ষা ব্যয়েরও সিংহভাগ সেখানেই হয়েছে। ফলত, অবকাঠামোতে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। এসব ব্যয়ের পুঞ্জীভূত ফলাফল হিসেবে দেখা গেল, পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ও সম্পদ বেড়ে গেল, যার ফলে আবার

পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আরও বেড়ে গেল। উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশি সহায়তার বণ্টনের বেলায়ও বৈষম্যমূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ফলে পশ্চিমে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এমনকি সেখানে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহও বেশ উদারভাবেই করা হয়েছে।

দুই অর্থনীতির ভিত্তিতে উন্নয়ননীতি প্রণয়ন করতে হলে উপার্জনমূলক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা আলাদাভাবে করতে হবে। সে কারণে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট পরামর্শটি আমার দিয়েছিলাম : দুই অঞ্চলের জন্য স্বাধীনভাবে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পরিমাণগত লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। এই স্বাধীন লক্ষ্য অর্জনে দুই অংশের জন্য পৃথক আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

সক্রিয় পরিস্থিতিতে দুই অঞ্চলের খরচের তুলনামূলক আনুমানিক হিসাব করতে হবে, এর মধ্যে সামাজিক ও ভৌগোলিক ওভারহেড ক্যাপিটালের ভবিষ্যৎ বিকাশের পরোক্ষ প্রভাবও আমলে নিতে হবে। একইভাবে, পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের যেসব পণ্যের বাণিজ্য হবে, তার উৎপাদনমূল্যের সঙ্গে পশ্চিমের অ্যাবসোলিউট কস্টের তুলনা করা যাবে না। বরং পশ্চিম থেকে আমদানি করা পণ্যের ল্যান্ডেড কস্টের সঙ্গে তার তুলনা করতে হবে।

এর পাশাপাশি, পূর্ব পাকিস্তানে কর্মসংস্থান বাড়ানোর অতি জরুরি চাহিদা পূরণের জন্য দুই অংশের মধ্যকার মূল্যের তুলনার মানদণ্ড যখন প্রয়োজন তখনই বদলাতে হবে।

শেষমেশ, পাকিস্তানের দুই অংশের সম উন্নয়নের জন্য সংবিধানে ধারা থাকতে হবে। যেমন সেই ধারায় বলা থাকবে, ২০ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়নের ভার মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে। সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য এর সুপারিশ করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট বিনিয়োগ ১৯৬০-৬৫ কাল পর্যায়ে ৩০ শতাংশ থেকে ১৯৭৫-৮০ কালপর্বে ৬০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

এই প্রতিবেদনের কৌশল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আইয়ুব খান যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা দিয়েই তাঁকে ধরা, আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো। আর একই সঙ্গে সরকার-প্রধান হিসেবে তাঁকে দেখানো, তাঁর সরকার কীভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আর আইয়ুব খান যদি বলে ফেলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কোনো দায়িত্ব নেবে না, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমরা বলতাম, দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে দিয়ে নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে তাদের উন্নয়ন হোক, যেটা একটা কাঙ্ক্ষিত সমাধান হতে পারে। সেই বিকল্প পরিস্থিতির জন্য আমরা নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট পরামর্শটি দিয়েছিলাম :

কেন্দ্রের হাতে স্রেফ তিনটি কাজ থাকবে : প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও দুই অংশের আন্তযোগাযোগের কয়েকটি দিক।

প্রতিটি অঞ্চলের মুদ্রা ও ঋণনীতি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের স্থানীয় পরিচালকেরা নির্ধারণ করবেন, যদিও মুদ্রা থাকবে একটিই। সব সরকারি রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা যে অঞ্চল থেকে এসেছে, তা সেই অঞ্চলেই ব্যয় হবে। দুই অঞ্চল নিজেদের সামর্থ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যয়ের কারণে যেভাবে লাভবান হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার বহন করবে।

প্রতিবেদনের উপসংহারে আমরা বলেছিলাম, উপর্যুক্ত পরামর্শগুলো গৃহীত হলে একটি বিশেষজ্ঞ দল এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি নির্ধারণ করতে পারবে। আমরা আরও বলেছিলাম, 'বর্তমান দলটি সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখছে, আর প্রয়োজন হলে তারা এই বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনও দিতে পারে।' আইয়ুব খানের সচিবালয় থেকে এই প্রতিবেদন-বিষয়ক কোনো সাড়া আমরা পাইনি। ফলে আমরা ধরে নিই, প্রতিবেদনটি তাঁর আস্থাভাজন উপদেষ্টা পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রীদ্বয় আমাদের দলটিকে বিপথগামী বা রাজনীতিকদের দ্বারা প্রতারিত বলে আখ্যা দেন, এমনকি তিনি আমাদের আরও খারাপ অভিধা দেন, আমাদের নাকি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। সে কারণে তাঁরা আইয়ুব খানকে পরামর্শ দেন, এই প্রতিবেদনকে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সংকুচিত কার্যক্রম সম্পর্কে একই রকম পরামর্শ ১৯৫০-এর মধ্যভাগেই দেওয়া হয়েছিল। যেমন : যুক্তফ্রন্ট তার ২১ দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু তিনটি বিষয় রাখার কথাই বলেছিল : প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা।

আইয়ুব খানকে আমরা যে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু গোপনীয় দলিল ছিল না, যদিও কয়েকজন অর্থনীতিবিদি এটি পেশ করেছিলেন। এ ব্যাপারটি জোর দিয়ে বলতে চাই। সেই দলের সদস্যরা চাইলে আগ্রহীদের সঙ্গে প্রতিবেদনটি নিয়ে কথা বলতে পারতেন। ফলে তখন অনেক অর্থনীতিবিদই প্রতিবেদনটির মূল দিক ও সুপারিশগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন, একদম টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি সম্পর্কে না জানলেও। উপর্যুক্ত প্রতিবেদন পেশ করার পর তা গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এরপর এই দুই অর্থনীতির তত্ত্ব ও আন্ত-আঞ্চলিক বৈষম্যের ব্যাপারটি পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও গণপরিসরে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়, অর্থনৈতিক সাংবাদিক, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আলোচনায় বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বিস্তৃত যুক্তিতর্কসহ এই স্মারকলিপি ও তার সুপারিশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক-বিষয়ক গণআলোচনার মধ্যে স্থান করে নেয়।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী রেহমান সোবহানের সঙ্গে প্রতিবেদনটি নিয়ে শুধু আলোচনাই করিনি, আমি এই দলিলের সব খুঁটিনাটি অর্থাৎ এর যুক্তিতর্ক ও সুপারিশ

সবকিছু নিয়েই একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছি। এই বিষয়ক গণআলোচনার সঙ্গেও আমরা যুক্ত ছিলাম। আমার বিভিন্ন পেশাজীবী সহকর্মীর সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি, যাঁরা এই বিষয়ে লিখতেন বা আলোচনা করতেন।

দ্বিতীয়ত, আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদেরও এই প্রতিবেদনটির কপি দিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই সুপারিশের পক্ষে তাঁদের সমর্থন আদায় করা। তাঁদের মধ্যে বিচারপতি ইব্রাহীম ও এ কে খান প্রতিবেদনটির ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তখন বিচারপতি ইব্রাহীম উপ-উপাচার্য ছিলেন। তিনি এত উৎসাহী হয়েছিলেন যে প্রতিবেদনটির পরামর্শসহ একটি মেমো পাঠিয়েছিলেন আইয়ুব খানের কাছে।

তৃতীয়ত, এই প্রতিবেদনটি আমরা পেশ করেছিলাম ১৯৬১ সালের মে-জুন মাসে, আর আইয়ুব খান সে বছরেরই অক্টোবর মাসে একটি ফিন্যান্স কমিশন গঠন করেন, যার কাজ ছিল : ক. কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে রাজস্ব আদায়ের কাজ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া, খ. করসহ কেন্দ্রীয় রাজস্ব, বিদেশি সহায়তা ও অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। আমি সেই কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলাম। আমি কমিশনের একমাত্র অর্থনীতিবিদ ও পূর্ব পাকিস্তানের অনানুষ্ঠানিক সদস্য ছিলাম। এটা পরিষ্কার যে স্মারকলিপিটির বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক ছিল। ফলে কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের সঙ্গে আমি সে বিষয়ে কথা বলি। ডি কে পাওয়ার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত প্রধান সচিব (উন্নয়ন), তিনি ছিলেন সেই ফিন্যান্স কমিশনের পূর্ব পাকিস্তান অংশের নেতা। তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের অনেকেই তখন এই প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতেন, তাঁরা গণপরিসরে আমাদের লাইনের দুই অর্থনীতি তত্ত্বের নীতিগত ব্যঞ্জনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চালিয়ে যান। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের তেমন একটি গোষ্ঠী ছিল ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল প্রগ্রেস, যে দলে ছিলেন রেহমান সোবহান, কামাল হোসেন, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ। তাঁরা ১৯৬৬ সালে আমাদের প্রতিবেদন পেশের এক বছর পর দ্য *চ্যালেঞ্জ অব ডিসপ্যারিটি* নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এর খসড়া করেছিলেন রেহমান সোবহান, তাঁর মূল প্রতিপাদ্য আর আমাদের স্মারকলিপির মূল প্রতিপাদ্য একই ছিল।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যে আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকেই গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান যুক্ত ছিল, যেটা আমি আগে বর্ণনা করেছি। এর মাধ্যমে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এক নড়বড়ে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেন, যার মধ্যে আবার ভাঙনের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। আর বাকিটা ইতিহাস।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা

সম্পদ : প্রামাণ্য মূল্যায়ন

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল এই ২৪ বছর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি, বৈদেশিক সাহায্য নীতি তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার প্রবণতা বরাবর লক্ষণীয় ছিল। ভূখণ্ড-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়াকে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার বলে। ভূখণ্ডের ওপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন: রাজনৈতিক নিষ্পত্তি, স্বেচ্ছা একত্রীকরণ, ভূখণ্ডের হস্তান্তর, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের সব সুবিধা অর্জনের অধিকারী। দ্বিপক্ষীয় পর্যায় এবং জরুরি প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি তুলে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরি। পাকিস্তানি শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ঘোষিত সম্পত্তির হিসাব এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের পাওনার সমন্বয় করেও এ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। পাকিস্তান মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কাদের মোল্লার ফাঁসিকে এবং মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদণ্ডের রায়কে কেন্দ্র করে যে অকূটনৈতিকসুলভ আচরণ করছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের কাছে প্রাপ্ত সম্পদের দাবি আবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপিত করা বাংলাদেশ সরকারের জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশেও এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সোচ্চার হতে হবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

অর্থ ও সম্পত্তির দাবি, রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার, দায় গ্রহণ, সম্পদ বণ্টন, আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক তৎপরতা।

ভূমিকা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পদ বণ্টন বিষয় অমীমাংসিত সমস্যা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনো দেশ বিভক্ত হয়ে পড়লে বা স্বাধীন হলে দেশটির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও বণ্টন হয়ে থাকে। অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদের একটি অংশ বাংলাদেশের প্রাপ্য হলেও স্বাধীনতার ৪৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও বাংলাদেশ কোনো সম্পদ পাকিস্তানের কাছ থেকে পায়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের অনীহার কারণে উচ্চপর্যায়ে কিছু আলোচনা ও কমিটি গঠন ছাড়া কোনো অগ্রগতি হয়নি। অন্যদিকে দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের জোরালো তৎপরতার অভাবে বিষয়টি পাকিস্তান আমলে আনেনি। এর ফলে দুদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যেমন সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত হতে পারেনি, অন্যদিকে বাংলাদেশ সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে হয়েছে বঞ্চিত। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে : প্রথমত, বাংলাদেশের পাকিস্তানের কাছে অর্থ ও সম্পদ দাবির ভিত্তি তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত, সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন উপস্থাপনা এবং তৃতীয়ত, সম্পদ বণ্টন বিষয় দুদেশের মধ্যে এযাবৎ যেসব কূটনৈতিক তৎপরতা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা।

এক. বাংলাদেশের পাকিস্তানের কাছে অর্থ ও সম্পত্তি দাবির ভিত্তি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল এই ২৪ বছর বাংলাদেশ বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি, বৈদেশিক সাহায্য নীতি তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার প্রবণতা বরাবর লক্ষণীয় ছিল। যে কারণে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের মাথাপিছু আয়, উন্নয়ন-ব্যয়, রাজস্ব খাতে ব্যয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্য গড়ে ওঠে। বৈষম্য নিরসনে সরকারের উদ্যোগের অভাব, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। যে কারণে স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল একটি বিপর্যস্ত ভূখণ্ড। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। ঢাকায় জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালনা কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১.২ বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে ১২৪৯ কোটি টাকা।[১]

এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত কয়েকটি খাতের বৈষম্য তুলে ধরলে দাবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায়। ১৯৪৯ সালে দুই অঞ্চলের ব্যবধান ছিল যেখানে ৬৩ টাকা (২১.৯%), তা ২০ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২০২ টাকায় (৬১.০৫)।[২] দ্বিতীয়ত, রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি প্রকটভাবে দেখা যায়। ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ৭২৮.৫ কোটি টাকা আয় করে খরচের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত থেকে বরাদ্দ পায় ১৩৩৬.২ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ১৭৮১.৭ কোটি টাকা আয় করে ব্যয়ের জন্য পায় ২৭৬৭.১ কোটি টাকা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উন্নয়ন খাতে পায় যথাক্রমে ৮৫১.৫ কোটি ও ১১০৭.৬ কোটি টাকা।[৩] এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষণীয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ৭৬৪০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি পেলেও পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে ২০২৪ মিলিয়ন ডলার বা ২৬.৬ শতাংশ।[৪] অবশ্য এ ঋণের ৬৪৩৯ মিলিয়ন ডলার কাজে লাগানো হয় এবং বাংলাদেশ পায় ১৯৪১ মিলিয়ন ডলার বা ৩০ শতাংশ।[৫] অথচ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ৫৬ শতাংশ কিংবা সমবণ্টনের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ ঋণ প্রাপ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। চতুর্থত, পাকিস্তানের বাণিজ্যনীতির মধ্যেও শোষণের বীজ রোপিত ছিল। ১৯৪৭-৭০ সালের মধ্যে মোট রপ্তানির ৫৪.৭ শতাংশ আয় করেছে পূর্ব পাকিস্তান, এর পরিমাণ ছিল ২৫,৫৫৯ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৫,৩৭০ মিলিয়ন ডলার (৩১.১ শতাংশ)। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান আয় করেছে ২১,১৩৭ মিলিয়ন টাকা (৪,৪৪০ মিলিয়ন ডলার)। মোট রপ্তানি আয়ের ৪৬,৬৯৬ মিলিয়ন টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আমদানির জন্য এ সময় বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ২০,০৬৭ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৪,২২৬ মিলিয়ন ডলার এবং পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে ৯,৩১২ মিলিয়ন ডলার।[৬] এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের উদ্বৃত্ত ৪৪২২ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, রপ্তানি আয় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ হবে ২০০০ মিলিয়ন ডলার। অর্থনৈতিক শোষণের আরও একটি ক্ষেত্র ছিল দুই অঞ্চলের বাণিজ্য। ১৯৪৭-৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হয় ১৭৩৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয় ৩৩০৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য।[৭] এমনিভাবে দুটি অঞ্চল বাণিজ্যের নামে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন ও অর্থ পাচার করে। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল সরকার-নিয়ন্ত্রিত *দৈনিক বাংলা* দাবি করে শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের ৫০০০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

দুই. রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার, দায় গ্রহণ ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন

ভূখণ্ড-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়াকে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার বলে। ভূখণ্ডের ওপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন : রাজনৈতিক নিষ্পত্তি, স্বেচ্ছা একত্রীকরণ, ভূখণ্ডের হস্তান্তর, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের সব সুবিধা অর্জনের অধিকারী।

রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার দুটো আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এগুলো হচ্ছে চুক্তি-সংক্রান্ত ১৯৭৮ সালের ২৩ আগস্ট এবং ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল প্রণীত 'ভিয়েনা কনভেনশন'। ১৯৮৩ সালের কনভেনশনের ৪০-৪১ ধারায় দায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশবিশেষ একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে একাধিক রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয় তখন বিভক্ত রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের ঋণও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ হবে। সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে হস্তান্তরিত ভূখণ্ডে অবস্থিত বা হস্তান্তরিত ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত সব স্থাবর ও অস্থাবর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং তহবিলের অধিকার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের ওপর বর্তাবে। এই বিধান সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক আদালত ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত এবং অভিমতেও অনুরূপ স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এমনকি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বা বিদেশে অবস্থিত হলেও তা যদি হস্তান্তরিত ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে তার অধিকার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের। তাহলে আন্তর্জাতিক আইনের উত্তরাধিকারীর অধিকার এক কথায় এভাবে প্রকাশ করা যায় যা ১৯৭৮ সালের 'ভিয়েনা কনভেনশনের' আর্টিক্যাল ২-এ বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের তহবিল এবং অস্থাবরসহ সব বিষয়ে সম্পত্তিতে হিস্যার অধিকারী।[৮] আন্তর্জাতিক আইনের এসব ধারার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা, স্থাবর সম্পত্তি, বিমান (পিআইএ), ব্যাংক-বিমা, রেলওয়ে, শিল্পসহ অন্যান্য খাতে অর্থ দাবি করতে পারে। এমনকি ১৯৭১ সালের আগে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের অনেক সম্পত্তি বিদেশের মাটিতে ছিল, যেমন দূতাবাসের ভবন বা ভবন স্থানে অনেক অস্থাবর সম্পত্তি ছিল। আন্তর্জাতিক আইনের ওই কনভেনশনের ১৭-১৮ ধারায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে এই সম্পদ পাওয়ার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে আইনে পূর্ববর্তী বা সাবেক রাষ্ট্রের ঋণের দায় গ্রহণও জরুরি।[৯] আন্তর্জাতিক আইনে যেহেতু নতুন রাষ্ট্রকে উত্তরাধিকার রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয়, তাই বাংলাদেশের মতো যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ ও বণ্টনের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করা জরুরি।

অবশ্য পাকিস্তান আমলে নেওয়া ঋণের মধ্যে বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমাপ্ত প্রকল্পের মোট ৫০৬.৭৬১ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৩.৪৮৫ মিলিয়ন ডলারের দায় গ্রহণ করে।[১০] এ ছাড়া চলমান প্রকল্পের ১৪৫.৮৬ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৩৬.১২১ মিলিয়ন ডলারের দায়ও বাংলাদেশ গ্রহণ করে। পাকিস্তান এত দিনের দাবি বৈদেশিক ঋণের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয়ের যে হিসাব দেখানো হতো বাংলাদেশের ঋণের দায় গ্রহণের ফলে বৈদেশিক ঋণ-সংক্রান্ত দুদেশের টানাপোড়েনের অবসান ঘটে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর ঋণ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যত তৎপর ছিল বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে সম্পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে ততটা তৎপরতা দেখায়নি।

তিন. সম্পদ বণ্টন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও কূটনৈতিক তৎপরতা, ১৯৭২-২০১৫

স্বাধীনতার পর সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি বাংলাদেশ বিক্ষিপ্তভাবে উত্থাপন করলেও ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের স্বীকৃতির পর বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। মূলত বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়সহ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির স্বার্থে সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অপপ্রচার খণ্ডনে ব্যস্ত থাকায় এত দিন বাংলাদেশ এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৭৪ সালের জুন মাসের মধ্যেই পাকিস্তান আমলে নেওয়া ঋণ পরিশোধে বিশ্বব্যাংক ও দাতাদেশগুলোর নির্ণীত ফর্মুলার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সমঝোতায় পৌঁছালে তার পক্ষ থেকে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারটি আরও গুরুত্ব পায়। সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে বাংলাদেশ গুরুত্ব দেওয়ার পর থেকে পাকিস্তান অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। পাকিস্তান সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের কাছে সম্পদ বণ্টনের জোরালো দাবি না করলেও স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা (স্বাধীনতার আগে যাদের বাংলাদেশে ব্যবসা ছিল) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের কাছে সম্পদ দাবি করতে থাকে। এভাবে বাংলাদেশের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে পাকিস্তান আগাম প্রতিষেধক নেয়, যাতে করে বাংলাদেশ সম্পদ বণ্টনে কোনো রকম জোরালো দাবি না করতে পারে। অবশ্য বাংলাদেশের দাবি আন্তর্জাতিক আইনে যতটা জোরালো ছিল তার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের দাবি টেকানো ছিল কষ্টকর। তাই সম্পদ বণ্টনে

পাকিস্তান সরকার কার্যত মৌনভাব অবলম্বনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিষ্ক্রিয় রাখার নীতি গ্রহণ করে।

তবে এটা ঠিক, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক অবাঙালিরা যুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে তাদের সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান রেখেই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার তাদের সম্পত্তি প্রথমে পরিত্যক্ত এবং পরে জাতীয়করণ করে সরকারের অধীনে নিয়ে আসে। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে করাচিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রিসার্চ ঢাকা ও করাচির স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির হিসাবের ওপর ভিত্তি করে একটি সমীক্ষা চালায়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকাশিত রিপোর্টে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন যে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের ২১০ কোটি রুপির সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৯৮ কোটি রুপি পাট শিল্প, ২৫ কোটি রুপি কাগজ ও বোর্ড শিল্প, ২২ কোটি রুপি বিদ্যুৎ ও তেল, ২০ কোটি রুপি রেয়ন ও সিনথেটিক এবং ১৭ কোটি রুপি সুতা বয়ন খাতে। অবশ্য এই হিসাবে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের পাওনার একটি ভিন্ন খতিয়ান এই সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়। দেখা যায় যে ৪৯৮৩.৮৫ লাখ রুপি বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যবসা ও শিল্পের দাবির সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ২১০ কোটি রুপির সম্পদ যোগ করলে মোট দাবির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১৯৩.৮৫ কোটি রুপি।[১১] এই সমীক্ষাটি সরকারি পর্যায়ে সম্পন্ন না হলেও এর পেছনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের দাবির বিপরীতে এ রকম একটি আগাম প্রতিষেধক নিয়ে রাখা। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের শেষদিক থেকে অস্পষ্টভাবে পাকিস্তানের কাছে পাওনা সম্পদের দাবির বিষয়টি উত্থাপন করতে শুরু করে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যেকোনো দেশকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেনে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেন।[১২] অবশ্য এখানে অর্থনৈতিক লেনদেন বলতে তিনি সম্পদ বণ্টনকে বুঝিয়েছেন কি না সেটা স্পষ্ট নয়। তাঁর ওই বক্তব্যের ভেতর দিয়ে এ সময় বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদেশগুলোর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ওপর ঋণের দায় চাপানোর পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ের নিষ্পত্তিরও তিনি ইঙ্গিত দিয়ে থাকতে পারেন। অবশ্য বাংলাদেশ স্বীকৃতিসহ বিহারিদের প্রত্যাবাসন, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যতটুকু সোচ্চার ছিল, সম্পদ বণ্টনের দাবিতে ততটা ছিল না। হয়তো এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য ইচ্ছেকৃতভাবেই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। অবশ্য ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে জাপান

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের এ সম্পর্কে বলেন, 'ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছেন এ কারণে যে স্বীকৃতি দিলে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশকে সম্পদের অংশ দিতে বাধ্য হবেন। পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের সব সম্পদ নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের কোনো জাহাজ ও বিমান পর্যন্ত রেখে যায়নি। তাদের উচিত দ্রুত স্বীকৃতি ও আমাদের প্রাপ্য সম্পদ ফেরত দেওয়া। আমি আন্তর্জাতিক আইনে ন্যায়সংগত প্রাপ্য ছাড়া পাকিস্তানের কাছ থেকে আর কিছুই চাই না।'[১৩]

অবশ্য ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভের পর বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সচেতন হয়। এত দিন পাকিস্তানের স্বীকৃতির ব্যাপারটিকে সামনে রেখে এ বিষয়ে তেমন জোর না দিলেও এ পর্যায়ে এসে বাংলাদেশ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। এ বছর ৬ মার্চ অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, পাকিস্তানের স্বীকৃতি তার কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব সম্পত্তির হিস্যা আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছে।[১৪] ৫-৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান আলোচনায় বসে। সম্পদ বণ্টন ইস্যুটি বৈঠকে উপস্থাপিত হবে, বৈঠকের প্রাক্কালে এমন ধারণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে বেশ আলোচিত হয়। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন দিল্লি যাওয়ার প্রাক্কালে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। বৈঠকের দুই দিন আগে সরকার-নিয়ন্ত্রিত *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদের ওপর বিস্তারিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনার পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা। এতে বলা হয়, ১৯৭০ সালের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর (১৯৪৭) থেকে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তান বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২৪৪৬ কোটি ১১ লাখ ৮ হাজার টাকা অর্জন করে। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করে ২৮৫৮ কোটি ৭২ লাখ টাকা। এর থেকে দেখা যায়, এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তান আমদানি করে ৪১২ কোটি ৯৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা বেশি অর্জন করেছে। অথচ ওই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান আমদানি করে ৪৮৬১ কোটি ৬৩ লাখ ৫ হাজার টাকার পণ্য। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমদানি করা হয় মাত্র ২৩৩৫ কোটি ৩৯ লাখ ৫১ হাজার টাকার পণ্য। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে হিসাব করা হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ২৯৩৯ কোটি ১৯ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া উচিত ছিল। এটা শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাওনার পরিমাণ। স্বাধীনতার পর মুদ্রামানের ৬৪ শতাংশ হ্রাসের কারণে ১৯৭৪ সালে সেটা দাঁড়ায় ৫০০০ কোটি টাকা। এ হিসাবের সঙ্গে দুটি দেশের

উন্নয়ন-ব্যয়সহ মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি ধরা হলে পাওনা আরও বেড়ে যায়।[১৫] ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে শুধু ত্রিমুখী প্রত্যাবাসনকে প্রাধান্য দেওয়ায় শেষত সম্পদ বণ্টন ইস্যুটি আর উত্থাপিত হয়নি। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে দুটি দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক অমীমাংসিত বিষয় যেমন বিহারিদের প্রত্যাবাসন ও সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে পাকিস্তানের ইতিবাচক উদ্যোগের ওপরই নির্ভরশীল। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দেন যে দুটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর এ বিষয় একটি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হবে। তাঁর এই বক্তব্যে ভুট্টোর আসন্ন ঢাকা সফরে এ বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তবে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের পর সরকারি ও বেসরকারি মহলে এ বিষয় আলোচনা হতে থাকে।

বাংলাদেশে তখন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট চলছিল এবং বাংলাদেশ সরকার তার প্রাপ্য সম্পদের অন্তত কিছু অংশ লাভের মাধ্যমে যেন সংকট থেকে উত্তরণের কথাই ভাবছিল। যদিও এই দাবি তোলা যত সহজ ছিল তার অর্জন ছিল তার চেয়ে বহুগুণে কঠিন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসেই পাকিস্তানের কোনো কোনো মহল ও গণমাধ্যম থেকে বাংলাদেশের কাছে পাল্টা সম্পদ দাবি করা হয়। উর্দু পত্রিকা *নওয়া-ই-ওয়াক্ত* ১৯ এপ্রিল এক প্রতিবেদনে দাবি করে, শুধু বিহারিদের বাংলাদেশে ৫৫০০ কোটি রুপি সম্পদ রয়েছে এবং বাংলাদেশের উচিত পাকিস্তানকে ওই অর্থ ফেরত দেওয়া।[১৬] এই প্রতিবেদনের হিসাব থেকে বুঝতে কঠিন হয় না যে বাংলাদেশের ৫০০০ কোটি টাকার দাবির বিপরীতে ৫৫০০ কোটি রুপির পাল্টা দাবির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সম্পদ দাবির ভিত্তিকে দুর্বল করা। এ মাসের শেষদিকে অবশ্য পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবি করে বাংলাদেশে অবাঙালি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিহারিরা অন্তত ৩০০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ ফেলে এসেছে।[১৭] অবশ্য কিসের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। মে মাসে পাকিস্তানি ব্যবসায়ী সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তানি ব্যবসায়ী সমিতি' করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং হলের এক সভায় অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে তাদের ফেলে আসা ৪০০-৫০০ কোটি রুপির সম্পদ উদ্ধারে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে।[১৮] এপ্রিল মাসে *দৈনিক বাংলায়* প্রতিবেদন প্রকাশের পর পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা ও ব্যবসায়ীদের সম্পদ দাবির অতি-উৎসাহী মনোভাবের পেছনে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবিকে দুর্বল করে দেওয়াই যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পাকিস্তানের এই উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভুট্টোর ঢাকা সফরকালে ১৯৭৪ সালের জুন মাসে প্রথম আনুষ্ঠানিভাবে সম্পদের হিস্যা দাবি করে। তাঁর সফরের

প্রাক্কালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭১ সালের পাকিস্তান সরকারের পরিসংখ্যানকেই বিবেচনায় রাখে এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে চারটি নীতি নির্ধারণ করে। এগুলো হলো :

১. জনসংখ্যা নীতি : এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৫৬ শতাংশ সম্পদ দাবি করতে পারে, ২. সমতার নীতি : এই নীতিতে বাংলাদেশ ৫০ শতাংশ দাবি করতে পারে, ৩. বৈদেশিক মুদ্রানীতি : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ভিত্তিতে ৫৪ শতাংশ সম্পদের দাবি করতে পারে, ৪. সমগ্র দেশের সম্পদের অনুপাতের নীতি : এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৪৪ শতাংশ সম্পদ দাবি করতে পারে।

সারণি-১

জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের মোট দাবি

খাত	**টাকার পরিমাণ** (কোটি টাকায়)
কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের ওপর দাবি	২১৯৯.০৮
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন	২৪৬.৮৭
করপোরেশনসমূহের হিসাবের ওপর দাবি যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি	৩২৪০.০০
মোট	**৫৬৮৫.৯৫**

সূত্র : মতিউর রহমান, 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক একটি প্রকাশিত হিসাব', সাপ্তাহিক *সন্ধানী*, ঈদসংখ্যা, মে ১৯৯৮, পৃ. ২৩।

এই হিসাব প্রণয়নে পাকিস্তান সরকারের চলতি ব্যয়, পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত ব্যয়, প্রতিরক্ষা ও প্রতিরক্ষা খাতে প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্যকেও বিবেচনায় রাখা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সেটিও বিবেচনায় আনা হয়। এই হিসাবে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনী যে ধ্বংসসাধন ও ক্ষয়ক্ষতি করে তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের এই হিসাবে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের পাওনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫৬৮৫.৯৫ কোটি টাকা (সারণি-১)। অবশ্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের পাওনার একটি হিসাব এতে দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তান ১০.৮৮ কোটি টাকা পাবে (সারণি-২)।[২০] যদিও বাংলাদেশের পাওনা সম্পদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দুজন পশ্চিমা গবেষক পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা ৩৯৭৫ মিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করেন (সারণি-৩)। যদিও এ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি ধরা হয়নি।

সারণি-২

জনসংখ্যার ভিত্তিতে জায়গা বদল মোট দাবি	
পাকিস্তান	**টাকার পরিমাণ** (কোটি রুপি)
ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড (ইপিএফ)	২.৬৩
হাউস বিল্ডিং করপোরেশন (এইচবিএফপি)	৮.৮৮
মোট	**১০.৮৫**

Source: Syed Serajul Islam, Bangladesh-Pakistan Relations: From Conflict to Cooperation, in Emajuddin Ahmed (Ed.) *Foreign Policy of Bangladesh: A Small States Imperative,* Dacca: UPL, 1981, p.59.

১৯৭৪ সালের জুনের শেষদিকে ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরকালে দুটি দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে যে খসড়া দলিল দেওয়া হয়, তাতে সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈঠকে বাংলাদেশ স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের ১১,০০০,০০০ ডলারসহ মোট ৪০০০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ দাবি করে।[২২] অবশ্য প্রথমদিকে বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করতেই রাজি হয়নি। ভুট্টো মনে করেন, তাঁর সফরসঙ্গীর ১০০ জনের মধ্যে কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। বাংলাদেশের চাপে পাকিস্তান এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত একটি কমিটি গঠনে রাজি হয়। তবে পাকিস্তান এ কথাও জানিয়ে দেয় যে নীতিগতভাবে সে এই প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত নয়।[২৩] এর থেকে এই ইস্যুতে ভুট্টোর কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি যে সময় ক্ষেপণের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সারণি-৩

সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের পাকিস্তানের কাছে পাওনা পরিমাণ (১৯৭১ সাল পর্যন্ত)			
অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীল সম্পদের মূল্যমানে	১৪,৬০০	৬,৪৫০	২১,০৫০
বৈদেশিক ঋণ	৮৫০	১৫০	১,০০০
বৈদেশিক ঋণ	৫০০	-	৫,০০০
স্বাধীনতার আগে মোট সম্পদ (১+৩-২)	১৪,২৫০	৬,৩০	২০,৫৫০
সমবণ্টনের ভিত্তিতে সম্পদ হওয়া উচিত	১০,২৭৫	১০,২৭৫	২০,৫৫০
এই ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা	-৩,৯৭৫	+৩৯৭৫	-

Source: Just Faaland and J. R. Parkinson. *Bangladesh the Test Case of Development,* London: C Hurst & Company, 1976, p.190.

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা, অস্থাবর সম্পত্তি, শিপিং, বিমানসহ সব সম্পদ নিয়ে গিয়েছে। তাই তিনি শুধু মজুত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার খাতে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কিছু অর্থ দুই মাসের মধ্যে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।[২৪] পাকিস্তান এই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং কোনো কোনো উৎস থেকে ভুট্টোর বাংলাদেশের কাছে বৈদেশিক ঋণ খাতে পাল্টা ৪-৬ বিলিয়ন ডলার দাবির প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়।[২৫] পাকিস্তানের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে অমীমাংসিত ইস্যু বিশেষ করে সম্পদ বণ্টন বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি এবং বাংলাদেশের দৃষ্টিতে সফরটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদিও পাকিস্তানের দৃষ্টিতে অমীমাংসিত ইস্যু মীমাংসার লক্ষ্য থেকে নয়, বরং সফরটি ছিল মূলত অনুসন্ধানমূলক এবং তাই এটি সফল।

অবশ্য পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলো স্বাধীনতার পর স্বীকৃতির বিরুদ্ধে অন্যতম যুক্তি হিসেবে বাংলাদেশের পাওনা সম্পদ-সংক্রান্ত দাবিকে তুলে ধরে। ভুট্টোর সফরের সময় তারা বাংলাদেশের এই দাবির সমালোচনায় আবারও মুখর হয়ে ওঠে। স্বয়ং ভুট্টো ঢাকঢোল পিটিয়ে ঢাকা এলেও সফরের ব্যর্থতার বিষয়টি আড়াল করতে দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের দাবির সমালোচনায় এসব দলের সঙ্গে একাত্ম হন। ১৯৭৪ সালের ২০ ডিসেম্বর ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন সম্পদ বণ্টনের নতুন বিষয় উত্থাপন করছে। আমি খুশি হতাম যদি সম্পদ বণ্টনের পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণ এবং তার দায়-দায়িত্বের বিষয় নিয়েও আলোচনা হতো। কিন্তু তারা শুধু সম্পদ চায়, দায় গ্রহণ করতে চায় না। এর অর্থ দাঁড়ায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তারা ৫৬ শতাংশ সম্পদ পাবে এবং পাকিস্তান তাদের তা দিয়ে দেবে। যা আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো অসম্ভব এবং এর ফলে সম্পর্ক স্থাপন বাধাগ্রস্ত হবে।[২৬] ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানের দৈনিক *মিয়ানচি* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের সম্পদ দাবির সমালোচনা করেন।[২৭] অন্যদিকে পাকিস্তান কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে পূর্বশর্ত হিসেবে সম্পদ বণ্টন ও অবাঙালি প্রত্যাবাসনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। এ বিষয়ে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গিগত অমিলের কারণেই শেখ মুজিব আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। দ্বিপক্ষীয়ভাবে সম্পদ বণ্টন বিষয়ে তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় বাংলাদেশ ইস্যুটির অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরার পথে ১৯৭৪ সালের ৪ অক্টোবর লন্ডনে হিথরো বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অগ্রগতি অমীমাংসিত সমস্যাবলির সমাধানের ওপর নির্ভরশীল। আমরা

আমাদের সম্পদের ন্যায্য হিস্যা চাই। আমরা তো কারও কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি না।[২৮]

১৯৭৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত জ্যামাইকার রাজধানী কিংসটনে কমনওয়েলথ সরকার-প্রধানদের বৈঠকে সম্পদ বণ্টন-সংক্রান্ত ইস্যুটির সমাধানে আলাদাভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের তেলমন্ত্রী ওতেইবা ১৮ জুন ঢাকা সফর শেষে পাকিস্তান সফর করেন। এরপর ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জেদ্দায় ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্পদ বণ্টন-সংক্রান্ত ইস্যুটি উত্থাপন করার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা ফিরেই বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এমন একটি ধারণাও দেন।[২৯] বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখে এবং কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের মধ্যে যেকোনো একটি দেশের মধ্যস্থতা কামনা করে। ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশের উদ্যোগের কারণে তিনটি বিষয় সফল হয় : প্রথমত, পাকিস্তানের অপচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম দেশ, বিশেষ করে আরব দেশগুলো সম্পদ বণ্টন বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ আরব বিশ্বের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে; তৃতীয়ত, পাকিস্তানের অপপ্রচার ব্যর্থ হয় এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে আসন্ন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে আবারও আলোচনা হবে।[৩০] অবশ্য পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের সম্পদ বণ্টন ইস্যু উপস্থাপনের সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয় যে যেহেতু বিষয়টি খুবই জটিল, তাই বাংলাদেশের প্রথম সহজ সমস্যাগুলোর সমাধান করে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।[৩১] অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত অপর ইস্যু অর্থাৎ বিহারি প্রত্যাবাসনও ছিল একই ধরনের জটিল সমস্যা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কের পূর্বশর্ত হিসেবে এ দুটো বিষয়কেই চিহ্নিত করে। তাই পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো নিছক সমালোচনার স্বার্থে সমালোচনা করলেও সমস্যা সমাধানে কোনো পথ দেখায়নি।

১৯৭৫ পরবর্তী সম্পদ বণ্টন ইস্যু

তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ফলে আগস্টে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত সম্পদ বণ্টন ইস্যুটি উত্থাপিত হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্রুত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অতি-উৎসাহের কারণে বাংলাদেশের নতুন শাসকেরা সম্পদ বণ্টনের মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়াই সঠিক মনে করেন। এমনকি সম্পদ বণ্টনের দাবি প্রত্যাহারেও রাজি হয় এবং সেই শর্তেই অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ

তার সুফল ঘরে আনতে ব্যর্থ হয় এবং লেনদেনে এবারও বঞ্চিত হয়। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এক সরকারি ঘোষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে খুশি হয়, কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বড় অংশই তাদের মালিকানাধীন ছিল এবং এ খাতে বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সরকারের কাছে পাওনা ছিল প্রায় ৫০.৫ মিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই ছিল পাকিস্তানিদের।[৩২] বাংলাদেশে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও সরকার ১৯৭৮ সাল থেকে কিছু কিছু পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দিতে থাকে।

১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে সরকারের এক আদেশে পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সাপেক্ষে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি করে হাইকোর্টে রিট আবেদনের সুযোগ পান। এই অধ্যাদেশে যেসব অবাঙালি প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি মালিকানা বাঙালিদের হাতে ন্যস্ত সে সমস্ত সম্পত্তির বেলায় আলাদা নিয়ম জারি করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাঙালি মালিকদের অংশ বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ অধ্যাদেশের পরপর দুই প্রক্রিয়ায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোনো নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে পাকিস্তান মালিকানাধীন পরিত্যক্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি মালিকানা বাঙালিদের অনেকে নিজেদের নামে লিখিয়ে আনে ও পরবর্তীকালে সেসব সম্পত্তির ওপর নিজেদের অধিকার দাবি করে। অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি মালিকেরাও ঢাকা এসে নিজেদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুরোনো দলিলের মাধ্যমে কম ক্ষেত্রে পাকিস্তানি মালিকেরাও ঢাকা এসে নিজেদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুরোনো দলিলের মাধ্যমে কম দামে বিক্রি করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহু অবাঙালি মালিক এ সুযোগে ঢাকা এসে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট, নন অপশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি বের করে নিজেরাই রিটের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পত্তি ফিরে পাওয়া অবাঙালি ব্যবসায়ীরা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে। এসব অবাঙালি টাকা পাকিস্তান বা অন্যত্র পাচার করে। এভাবে আইনের ফাঁকে অবৈধভাবে বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি নতুনভাবে হস্তান্তরিত হওয়ায় কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার আকারে দেশের বাইরে পাচার হয়। অথচ কোনো বাঙালি পাকিস্তানে অবস্থিত তাদের সম্পত্তির ওপর মালিকানা ফিরে পায়নি।[৩৩]

অবশ্য বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পাকিস্তান স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার নীতি অব্যাহত রাখে। ফলে বাংলাদেশের আশাবাদ নিরাশায় পরিণত হয়। ১৯৭৬

সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগা শাহী ঢাকা সফরে এলে বিষয়টি প্রথমবারের মতো নতুন সরকারের আমলে উত্থাপিত হলে তিনিও বিষয়টির ওপর বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে তাঁর পূর্বসূরিদের মতো তা এড়িয়ে যান। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব তবারক হোসেনের পাকিস্তান সফরকালে সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গটি আবারও উত্থাপন করা হলে জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংকটের দোহাই দিয়ে বিষয়টি আবারও এড়িয়ে যায়। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া পাকিস্তান সফরকালে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় সম্মত বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৪] তবে আগা শাহীর একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায় এ বিষয় পাকিস্তান কতটুকু আন্তরিক ছিল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, বাংলাদেশ যেহেতু উত্তরাধিকার রাষ্ট্র নয় তাই সে সম্পদের দাবি করতে পারে না। বাংলাদেশ এই মন্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে এবং সমতার ভিত্তিতে সম্পদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে।[৩৫] বাংলাদেশের এই প্রতিবাদের কোনো জবাব পাকিস্তান না দিলেও বাংলাদেশ তার সম্পদের হিস্যার দাবিতে অনড় থাকে। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামস-উল-হক পাকিস্তানের কাছে এ বিষয়টি উত্থাপন করলে তারা জানায়, পাক পররাষ্ট্রসচিবের আসন্ন বাংলাদেশ সফরের সময় সচিব পর্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু আগা শাহী না আসায় দীর্ঘদিন আর এ নিয়ে আলোচনা হয়নি।

দুই বছর পর পাকিস্তানের নতুন পররাষ্ট্রসচিব রিয়াজ পিরচা ১৯৮০ সালের ২৪ অক্টোবর তিন দিনের সফরে ঢাকা এলে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়, দুটি দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এবং দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবদের কাছে প্রেরিত রিপোর্টের ভিত্তিতে শিগগিরই ইসলামাবাদের সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুদেশের পররাষ্ট্রসচিবদের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব এম এ এস কিবরিয়া সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে বৈঠক ও সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করলেও[৩৬] সে যাত্রায় তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৮০ সালে এ ব্যাপারে একটি আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করলেও সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এরপর ১৯৮১ সালের মধ্যে পাকিস্তানের অসহযোগিতার কারণে এ সম্পর্কিত কোনো বৈঠকই হয়নি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব কাঠমান্ডু সফরকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিবকে বৈঠক ডাকার আহ্বান জানালে দেশে ফিরে তিনি বৈঠকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরও এ ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। অবশ্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে দুরকমের বক্তব্য দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,

পাকিস্তান সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে একটি যৌথ কমিশন গঠন-সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮১ সালের ২৪ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এটা একটা আলোচনাসাপেক্ষ ব্যাপার। এ ব্যাপারে আলোচনায় উভয় সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।[৩৭] এ থেকে বোঝা যায় যে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে কার্যত কোনো রকম অগ্রগতি হয়নি, বরং জিয়ার মৃত্যুর পরপর *টাইমস অব ইন্ডিয়া* এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করে যে বাংলাদেশ সম্পদের দাবি প্রত্যাহার করেছে। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র একে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। সূত্রটি আরও উল্লেখ করে, ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের সদস্যদের নাম পাকিস্তানকে জানানো হয়েছে এবং কমিটি শিগগিরই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৩৮]

এরপর ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পাকিস্তান সফরে গেলে তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব দেওয়া হলেও সম্পদ বণ্টন বিষয় কোনো আলোচনা হয়নি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও খুব বেশি চাপ পাকিস্তানের ওপর ছিল না তা জেনারেল এরশাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের ১৯৮৯ সালের ৮ জুনের একটি বিবৃতি থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদের সঠিক ও স্বীকৃত পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালানো হচ্ছে।[৩৯] একই বছর অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ঢাকা সফরে এলে 'বাংলাদেশের যখনই প্রয়োজন হবে পাকিস্তানিরা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে'—এ ধরনের গালভরা মন্তব্য করলেও সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে যুক্ত বিবৃতিতে দায়সারা গোছের কয়েক লাইন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। বিবৃতিতে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত এ বিষয়ে একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণে উভয় সম্মত হন বলে শুধু উল্লেখ করা হয়। এরপরও একই ধারার বিবৃতি দিয়ে সব সময় পাকিস্তান পাশ কাটিয়ে যায়। বিষয়টিকে বরাবর জটিল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও জটিলতা নিরসনে কখনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিন বছর দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে দেশে ফেরার প্রাক্কালে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি হাইকমিশনার রিয়াজ হোসেনের মন্তব্যে এর প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন, I don't think it will beg easy solution. These are very complicated and complex issues. But given the goodwill and understanding on both sides some sort of a solution could be found out.

নব্বইয়ের দশকে এসেও সম্পদ বণ্টন বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশের তৎপরতার অভাবে শুধু উভয় দেশের নেতাদের সফরকালে বিক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি

কখনো কখনো হালকাভাবে আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ১৯৯০ সালের মার্চে ঢাকা সফরে এলে অমীমাংসিত বিহারি সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করলেও সম্পদ বণ্টন বিষয় গুরুত্ব পায়নি। তিনিও তাঁর পূর্বসূরিদের মতো বলেন, 'সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। এ প্রশ্নে আরও অনেক আলোচনা করতে হবে। ত্বরিত কোনো সমাধান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা আশাপ্রদ নয়।' একই বক্তব্য দেন পরের বছর এপ্রিলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত যোগাযোগমন্ত্রী মীর হাজাম খান। ঢাকা সফরে এসে তিনি সম্পদ বণ্টনের এমন সমাধান চেয়েছেন, যাতে উভয় দেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় হবে। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্ব কীভাবে দৃঢ় করা যায়—দাবিটি করে, নাকি প্রত্যাহার করে তা তিনি উল্লেখ করেননি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান সফরের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয় উপস্থাপনার ব্যাপারটি বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় আসে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং মন্তব্য করেন সম্পদ বণ্টন বিষয়টি আলোচনায় আসবে। ৫২ জন সফরসঙ্গী নিয়ে তিনি পাকিস্তান সফরে গেলেও এ ব্যাপারে যুক্ত ঘোষণায় এক লাইনের গতানুগতিক বিবৃতি ছাড়া প্রাপ্তিযোগ কিছুই ঘটেনি। যদিও প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব এ ব্যাপারে অগ্রগতিকে কিছুটা বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করেন। তিনি মন্তব্য করেন উভয় দেশ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান এ সমস্যার দ্রুত সমাধানে উপনীত হতে সম্মত হয়েছে।

দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৯৬ সালে সম্পদ বণ্টন বিষয় আবারও কিছু আলোচনা হয়। এ বছর আগস্ট মাসের ৯-১১ তারিখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব পাকিস্তান সফরকালে এবং ১৬-১৮ আগস্ট পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব নাজিমুদ্দিন শেখ ঢাকা সফরকালে সম্পদ বণ্টন বিষয় আলোচনা হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, সম্পদ বণ্টন ব্যাপারে পাকিস্তানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে কারণে খুব দ্রুত এর সমাধান সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ বিষয় অগ্রগতি হবে, পর্যবেক্ষক মহল বেশ আশাবাদ ব্যক্ত করলেও ১৯৯৭ সালের ২৪ মার্চ পাকিস্তান সফর শেষে দেশে ফিরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করেন।[৪০] কোনো অগ্রগতি যে হয়নি তা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকেই প্রমাণ হয়। ২০০২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ঢাকা সফরে এলে আবারও হালকাভাবে সম্পদ বণ্টন বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। উভয় দেশ তাঁর সফরে সন্তোষ প্রকাশ করলেও সম্পদ বণ্টন বিষয়টি ছিল ফলশূন্য।

২০০৬ সালের ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সফর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর সফরের প্রাক্কালে ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন পাকিস্তান সফরকালে বিহারি প্রত্যাবাসন ও সম্পদ বণ্টন বিষয় প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা করবেন বলে জানান। যদিও খালেদা জিয়ার সফরকালে চারটি সমঝোতা স্মারক, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সমঝোতা হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত সহযোগিতা বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। দেশে ফিরে খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান মনের মাধুরী মিশিয়ে আগের সব সফরের মতো ১৫ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, We've been discussing the issue and it will continue.[৪১] এমনিভাবে অমীমাংসিত বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো চাপ না থাকায় দিনের পর দিন পাকিস্তান বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী শাসনামলেও এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।

অমীমাংসিত সম্পদ বণ্টন বিষয়ে উপসংহারে বলা যায় যে বিগত সাড়ে তিন দশক দুদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের উভয় দেশ সফর এবং বিভিন্ন বৈঠকে সম্পদ বণ্টন বিষয় আলোচনায় উঠলেও কোনো কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উভয় দেশের এসব সফরকালে সফরের বিপুল সাফল্য পত্রপত্রিকা ও গণমাধ্যমে প্রচার করা হলেও বিধি মোতাবেক কোনো আলোচনা হয়নি। নামে মাত্র একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হলেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন পর্যায়ে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ওয়ার্কিং গ্রুপের কোনো সভাই অনুষ্ঠিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ করে কমনওয়েলথ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় তোলা হলেও ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের সরকারগুলো দ্রুত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সম্পদ বণ্টন বিষয়ে বিশেষ তৎপর হয়নি। বাংলাদেশ বরং পাকিস্তানি শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ঘোষিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ও কোনো কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান জিয়ার আমলে ফিরিয়ে দেয়। বাংলাদেশ এ সময় ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়ে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু দেশে নয়, জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন সংস্থায় ভারতের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও পাকিস্তানের ব্যাপারে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। আমাদের দেশে গণমাধ্যমও সম্পদ বণ্টন ইস্যুতে তেমন তৎপরতা দেখায়নি। বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসংগঠনসহ কোনো সংগঠনও এ ব্যাপারে সচেতনতা দেখায়নি। যে কারণে

বাংলাদেশের কোনো সরকারই এ ব্যাপারে চাপের মুখোমুখি হয়নি। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তান বিষয়টিতে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়েছে, কখনো পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছে, যার সম্মিলিত ফল হচ্ছে দাবিটির অপমৃত্যু। ১৯৭৪ সালে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০০ মিলিয়ন ডলার। তখন ডলারের মূল্যমান ছিল ৮ টাকা, এখন যা ৭৮ টাকা ছাড়িয়েছে। সে হিসাবে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের বর্তমানে পাওনা দাঁড়ায় ৩০০০০০ মিলিয়ন ডলার। দ্বিপক্ষীয় পর্যায় এবং জরুরি প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি তুলে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরি। পাকিস্তানি শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ঘোষিত সম্পত্তির হিসাব এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের পাওনার সমন্বয় করেও এ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। পাকিস্তান মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কাদের মোল্লার ফাঁসিকে এবং মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদণ্ডের রায়কে কেন্দ্র করে যে অকূটনৈতিকসুলভ আচরণ করছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের কাছে প্রাপ্ত সম্পদের দাবি আবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপিত করা বাংলাদেশ সরকারের জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশেও এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সোচ্চার হতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ, ঢাকা*: ১৯৭২, পৃ. ৯৪-৯৫।

২. রেহমান সোবহান, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি," দ্রষ্টব্য সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, দ্বিতীয়* খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬১৯।

৩. Rehmen Sobhan, "The Balance Sheet of Disparity," *The Forum*, 14 November 1970.

৪. *Report on Economic Relation Between East and West Pakistan, Karachi* : 1961, pp. 48-50.

৫. M. Nazrul Islam, *Pakistan Malaysia*, A *Comparative Study in National Integration*, Dhaka: Academic Publishes, 1990, p.55.

৬. Central Statistical Office, *Monthly Foreign Trade Statistics*, June 1970, Karachi: Government of Pakistan Press, 1970, p.1.

৭. *Economic Survey of East Pakistan 1967-70*. Dacca: Government of East Pakistan Press, 1969, p.22.

৮. H. O. Agarwal, *Intenational Law*, Allahabad : Allahabad Law Agency, 1987, p. 146.

৯. উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের জন্যও চুক্তি জরুরি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় এমনি একটি চুক্তি হয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুটি দেশের সম্পদ বণ্টনের জন্য গভর্নর আর. জি. কেসিকে পার্টিশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করা হয়। যদিও এই অর্থ বণ্টনে দুটি দেশই কৌশলের আশ্রয় নেয়। তাই দেখা যায় যে, সম্পদ বণ্টনে আন্তর্জাতিক আইন থাকলেও তা উদ্ধার অত্যন্ত জটিল। এ সম্পর্কিত আলোচনা জন্য দ্রষ্টব্য V.B. Kulkarni, *Pakistan, Its Origin and Relation with India*, Dhaka: Academic Publishers, p. 108. আরও দ্রষ্টব্য *Lok Sobha Debath*, Vol-32, 1973, p. 57.

১০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক খণ্ড ২, সংখ্যা ১৪, ৮ জুন ১৯৭৯, পৃ. ৮৫৭-৮৬৩।

১১. *Hindustan Standard*, 27 June 1974.

১২. *Pakistan Horizon*, Vol. XXV, No. 4, 1972, p. 86.

১৩. *Asian Recorder*, Vol, XIX, No. 51, 1973, p. 11749.

১৪. *দৈনিক বাংলা*, ৭ মার্চ ১৯৭৪।

১৫. *ঐ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৪।

১৬. *POT Pakistan* Series, Vol. 11, Part 46, 24 April, 1974, p. 265.

১৭. *Economist*, 27 April, 1974.

১৮. *Morning Weekly* (Karachi), 19 May 1974.

১৯. মতিউর রহমান, "বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক একটি অপ্রকাশিত হিসাব," *সাপ্তাহিক সন্ধানী*, ঈদসংখ্যা মে ১৯৮৮, পৃ. ২২। পরিকল্পনা কমিশনের এই দাবিসংক্রান্ত সরকারি দলিল পাওয়া যায়নি। মতিউর রহমানের এই প্রবন্ধ ছাড়া সাপ্তাহিক *রোববার* এ "বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক," ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যার এক প্রতিবেদনে কর্পোরেশনসমূহের কাছে জনসংখ্যা ও সমতার ভিত্তিতে প্রাপ্য অর্থের একটি বিশদ তালিকা পাওয়া যায়। এ দুটি প্রতিবেদন এবং মতিউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই হিসেব বের করা হয়েছে। মতিউর রহমান বর্তমানে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক।

২০. Syed Serajul Islam, "Bangladesh-Pakistan Relations : From Conflict to Cooperation," in Emajuddin Ahmed (ed), *Foreign Policy of Bangladesh : Small States Imperative,* Dacca: UPL, 1948, p. 59.

২১. Just Faaland J.R. Parkinson, *Bangladesh The Test Case of Development,* London: C. Hurst and Company, 1976, p. 190.

২২. Denis Wright, *Bangladesh Origin and Indian Ocean Relations (1971-1975),* Dhaka: Academic Publishers, 1988, p. 198.

২৩. Dilara Chowdhury, *Bangladesh and South Asian International System,* Dhaka: Academic Publishers.

২৪. *New York Times*, 9 July 1974.

২৫. *Ibid*, 29 June 1974.

২৬. *POT Pakistan Service,* Vol. II, 30 December 1974, p, 956.

২৭. *Pakistan Times*, 18 February 197.

২৮. *দৈনিক বাংলা*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৪।

২৯. *POT Pakistan Services*, Vol, III Part 4, 16 July 1975, p. 433.

৩০. Iftekhar A. Chowdhury, "Bangladesh's External Relations: the Strategy of Small Power in A sub-System," Unpublishet Phd. Thesis, Canberra : Australian National University, 1979, p. 124.

৩১. *POT Pakistan Series*, *op.cit*, p. 433.
৩২. মতিউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
৩৩. জগলুল আলম, "করাচিতে লেনদেন ২০ কোটি টাকার লোকসান", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ১৯৮১, পৃ. ২১-২২।
৩৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৭।
৩৫. Mohammad Shamsul Haq, *Bangladesh in International Politics the Dilemmas of the Weak States*, Dhaka: UPL, 1993, p. 156.
৩৬. *The Hindu*, 28 October 1980.
৩৭. দৈনিক *সংবাদ*, *২৫ এপ্রিল* ১৯৮১।
৩৮. দৈনিক *বাংলা*, ২৫ জুন ১৯৮১।
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুন ১৯৮৯।
৪০. ঐ, *২৫ মার্চ* ১৯৯৭।
৪১. *Bangladesh Observer*, 16 February 2006.

প্রবাসে বাংলাদেশ

একাত্তরের সত্তা : যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ টাওয়ার হ্যামলেটকে তাড়িয়ে বেড়ায়

সারাহ গ্লিন

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ব্রিটিশ বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থনে সর্বজনীনভাবে একত্র হয়েছিল। এই প্রবন্ধ সেই যুদ্ধের প্রকৃতি ও প্রভাব, এবং ব্রিটেনে, বিশেষ করে বেশির ভাগ বাঙালির বসবাসস্থল টাওয়ার হ্যামলেটে বাংলাদেশিদের অব্যাহত লিগ্যাসি তুলে আনবে। কীভাবে একাত্তরের চেতনা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একত্র করেছে এবং নতুন অধ্যায়কে রাজনীতিকীকরণ করেছে, তার পটভূমি ও রাজনীতি এবং কীভাবে বিপ্লবী 'স্টেজ থিওরি' ও 'পপুলার ফ্রন্টিজম' বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের উগ্র সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতে সহায়তা করেছিল, তা দেখা হয়েছে এই প্রবন্ধে। কীভাবে বাঙালিদের সঙ্গে লেবার পার্টির সংযোগ এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতির উন্নয়নে ১৯৭১ সালের জনসংযোগ ভূমিকা রেখেছিল, তাও আলোচনা করা হবে।

এই ইতিহাস বাঙালিদের ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে, যা কিনা নিজ গুণেই একটি শক্তিশালী গল্প। এই প্রবন্ধে মাতৃভূমিতে উপনিবেশবাদের অবসান ও জাতিগঠন এবং ব্রিটেনে বসতি স্থাপন ও সংহতিকরণের সময়ে প্রবাসীদের মধ্যে রাজনীতির আবির্ভাবের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রভাবের বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

শব্দগুচ্ছ

বাঙালি, বাংলাদেশ, টাওয়ার হ্যামলেট, স্বাধীনতাযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, প্রগতিশীল বা বামপন্থী দলসমূহের মৈত্রী বা জোট।

প্রারম্ভিক আলোচনা

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে। যদিও তাঁর উপস্থিতি পাকিস্তান সরকার

কর্তৃক নির্ধারিত, তবু এক্ষেত্রে মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে সর্বজনীনভাবে একত্র হওয়া প্রবাসী বাঙালিরা[১] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা শেষে নতুন রাষ্ট্র হওয়ায় পূর্ব বাংলার জন্য এটা একটা বিশেষ মুহূর্ত ছিল; এটি ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্যও চরম মুহূর্ত ছিল। এই প্রবন্ধ সেই যুদ্ধের প্রকৃতি ও প্রভাব, এবং ব্রিটেনে, বিশেষ করে বেশির ভাগ বাঙালির বসবাসস্থল টাওয়ার হ্যামলেটে বাংলাদেশিদের অব্যাহত লিগ্যাসি তুলে আনবে। কীভাবে একাত্তরের চেতনা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একত্র করেছে ও নতুন অধ্যায়কে রাজনীতিকীকরণ করেছে তার পটভূমি ও রাজনীতি এবং কীভাবে বিপ্লবী 'স্টেজ থিওরি' ও 'পপুলার ফ্রন্টিজম' বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের উগ্র সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হতে সহায়তা করেছিল, তা দেখা হয়েছে এই প্রবন্ধে। কীভাবে বাঙালিদের সঙ্গে লেবার পার্টির সংযোগ এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতির উন্নয়নে ১৯৭১ সালের জনসংযোগ ভূমিকা রেখেছিল তাও আলোচনা করা হবে।

এই ইতিহাস বাঙালিদের ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে, যা নিজ গুণেই একটি শক্তিশালী গল্প। এই প্রবন্ধে মাতৃভূমিতে উপনিবেশবাদের অবসান ও জাতিগঠন এবং ব্রিটেনে বসতি স্থাপন ও সংহতিকরণের সময়ে প্রবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের কী প্রভাব, তার বিস্তৃত উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাসী সংগঠনগুলোতে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তারিত পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো বিস্তর মতাদর্শিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দেখা হয়নি। কালবির শুক্রা যদিও আদর্শগত উন্নয়ন সম্পর্কে বামপন্থীদের ভেতর থেকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি কনটেক্সচুয়াল বিশ্লেষণে এই সময়কে একই পর্যায়ে নিয়ে যাননি।[২]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

এর কেন্দ্রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে অবস্থান করে। আপাতদৃষ্টিতে এই অসম্ভাব্য সমন্বয় বারবার ঘটেছে, কিন্তু এর পেছনে গতিশীলতা (যেমনটি সোস্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি এবং ব্রিটেনের মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের অসম্ভাব্য সমন্বয়ের পেছনে ছিল) শুধু সোভিয়েত কমিউনিজমের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটেই বোঝা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সকলের মৌলিক সমস্যা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রকৃতি এবং এখান থেকেই এর সঠিক কৌশল গ্রহণ। বিতর্কের কোনো সংক্ষিপ্ত জরিপ এর ন্যায়বিচার করতে পারে না। যেকোনো বাস্তব অবস্থায় সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য একটি কৌশলগত কাল্পনিক রেখা পার করার ওপর নির্ভর করে, তাই সেই রেখার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সারমর্মে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রয়েছে যদিও সম্পূর্ণ বিতর্ককে পুনঃপরীক্ষা এর উদ্দেশ্য নয়। এ প্রবন্ধটি কিছু বাস্তবায়িত ধারণার গবেষণামূলক পরীক্ষার বিস্তারিত অবকাঠামো প্রদান করে, যে পরীক্ষাটি আবার বিস্তৃত বিষয়ে টেনে আনা যায়।

'স্থায়ী বিপ্লব' তত্ত্বে ট্রটস্কি বলেছেন সমাজতন্ত্র অর্জন করার ক্ষেত্রে শ্রমিক ক্ষমতা লাভ ও গণতান্ত্রিক সংশোধন করেই থেমে থাকতে পারবে না। প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগেই শ্রমিক সরকারকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হতে হবে এবং এটাই ১৯১৭ সালে ঘটেছে। যাই হোক, সেই বিপ্লব আন্তর্জাতিকভাবে হওয়ার কথা ছিল। এটা যখন ব্যর্থ হয় তখন স্টালিনের দল "একটি দেশে সমাজতন্ত্রের" প্রচারণা চালায় এবং সুবিধামতো বিপ্লব তত্ত্বের পূর্ব ধারণাতে ফিরে যায়—যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-পূর্ববর্তী রক্ষণশীল বিপ্লব থেকে আলাদা ছিল। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তাদেরকে প্রথম পর্যায়ে মিত্র হিসেবে গণ্য করা হতো।

জাতীয় প্রশ্নকে এই দীর্ঘ বিতর্কের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়েছে। লেনিন যুক্তি দিয়েছেন যে একটি সংঘে একত্রিত জনগণের কমিউনিস্ট ধারণা বলতে বোঝায় জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সমর্থন দেওয়া এবং সব ধরনের জাতীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করা, কিন্তু সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত না করা। এটি বাস্তবে কী অর্থ বহন করে তা প্রকৃত পরিণতির আলোকে বিচার করে দেখতে হতো, কিন্তু লেনিন জোর দিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম সব সময় সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী সংগ্রামের অধস্তন থাকবে এবং সতর্ক করেছেন যে, 'নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়াগণ শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ক্রমাগতভাবে জাতীয় মুক্তির স্লোগানকে কাজে লাগাচ্ছে।'[৩]

স্ট্যালিনের সময় এই সতর্কবাণী কাজে লাগেনি, যেহেতু কমিন্টার্ন নির্দেশ দিয়েছিল যেন কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রোগ্রাম ও কৌশলের অধস্তন থাকে। যাই হোক, ক্যান্টন বিদ্রোহ ও ১৯২৭ সালের সাংহাই ক্যু-এর ভয়াবহ পরিণতির সময়, যখন চিয়াং কাই শেক চীনা কমিউনিস্টদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে, তখন এসব নীতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলা হয়। ১৯২৭ সালে সাংহাই ক্যু ও ক্যান্টন বিদ্রোহের নীতির ক্ষতিকর ফলাফল দেখে সহযোগিতার এই কৌশল গৃহীত হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নতুন নীতি 'শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রেণি'র প্রভাবে কমিন্টার্ন অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে কাজ করতে অনাগ্রহ দেখায়।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিদের বিজয়ের ফলে এই নতুন অবস্থানের বিপদ যখন উন্মোচিত হয়, তখন আরেকটা সম্পূর্ণ কৌশলী বৈপরীত্যের সমর্থনে এটা পরিত্যাগ করা হয়। মধ্যমপন্থা উপেক্ষা করে মতাদর্শগতভাবে অথবা সাংগঠনিকভাবে

স্বাধীন হয়ে অন্যান্য নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে কাজ করায় (যাকে ট্রটস্কি যুক্তফ্রন্ট বলেন) দলটি চীনে যেসব ধারণা ধ্বংসাত্মক ছিল সেগুলো প্রতিস্থাপন করে এবং শ্রমিক দল এবং বুর্জোয়াদের জোট আহবান করা হয়। যদিও এটা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদর্শন করে, কিন্তু এটা যুদ্ধের পর অব্যাহতভাবে পপুলার ফ্রন্টিজম অনুসরণ করে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট তত্ত্বে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারণা গ্রহণ করে—বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তন সংসদীয় মাধ্যমে, যা শান্তিপূর্ণভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামো অব্যাহত রেখে অর্জন করা যায়। তবে এসব ধারণা যে শক্তিশালী রিভিসনিস্ট প্রতিক্রিয়ায় পড়তে পারে সে ধরনের ভিন্নমত বাতিল করে দেওয়া হতো, এবং তারা বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট ও তাদের সহকর্মীদের মধ্যে নতুন অর্থোডক্সি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা পুরাতন উপনিবেশ দেশগুলোর চরমপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলোয়, যেমন পূর্ব পাকিস্তান বা আধুনিক বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রভাবশালী বলে প্রমাণিত হয়।

জনগণ

জনগণ ছিল বিস্তৃত রাজনৈতিক পটভূমি কিন্তু তারা কারা যারা রাজনীতিকে কাজে রূপান্তরিত করে? সে সময় ২২ হাজার পূর্ব পাকিস্তানি ব্রিটেনে বসবাস করত যাদের মধ্যে তিন হাজার লন্ডন নগরের পূর্বাঞ্চলে বাস করত।[৪] তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল কম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্ধত হয়ে জীবনে ভালো কিছু করা। তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব কোণের সিলেট অঞ্চলের সাবেক নাবিক ছিলেন, যারা ব্রিটিশ বন্দর থেকে পালিয়েছে অথবা নাবিকদের পরিবার এবং গ্রামের মানুষ যারা কমনওয়েলথ অভিবাসন আইন-১৯৬২ দ্বারা অভিবাসন সীমিত করার সময় শ্রমিক ভাউচার প্রকল্পের অধীনে এই দেশে এসেছে। তারা অত্যাচারিত বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন ধারণ করছে যেমন অদক্ষ শ্রমিক বা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় রান্নার লোক হিসেবে কাজ করত।[৫] তারা সাধারণত এখানে কাজে এসেছিল এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য উপার্জন করত এবং অধিকাংশ সময় তারা মাথা নত করে কঠোর পরিশ্রম করত। কমিউনিটির ফোকাস ছিল মসজিদের ওপর। পাকিস্তান কল্যাণ অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫২ সালে স্বাবলম্বী গোষ্ঠী হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং অনেক বাঙালি ক্যাফে ও রেস্তোরাঁ মিটিংয়ের প্রতিষ্ঠিত জায়গায় পরিণত হয়। কিন্তু আরও কিছু উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন যেমন তাসাদ্দুক আহমেদ। তিনি ১৯৫৩ সালে ব্রিটেনে এসেছেন কমিউনিস্ট রাজনীতির আরও উদার পরিবেশের আশায় এবং তার গঙ্গা রেস্তোরাঁ রাজনেতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি-সচেতন জণগণ ছিল যাদের অনেকেই তাসাদ্দুককে রাজনৈতিক গাইড হিসেবে পেয়েছিল এবং লন্ডনের পূর্বাচলে তাদের সামাজিক নীতির বাস্তবতা

দেখেছিল। ব্রিটেনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বিভিন্ন পটভূমির বাঙালিদের একসঙ্গে করে নতুনভাবে রাজনীতিকীকরণ করা।

লন্ডনে পাকিস্তানি রাজনীতি

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বাঙালি অভিবাসীদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটেনের কাছ থেকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে অনুসরণ করে ব্রিটিশ বাঙালি রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় ফোকাস করেছিল—বিশেষ করে ইসলামাবাদের অধীনস্থ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে। বেশির ভাগ অভিবাসী গোষ্ঠীর জন্য তাদের প্রথম রাজনৈতিক ধারণা তাদের মাতৃভূমির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং ব্রিটেনে অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাঙালিদের জন্য এ দুটো বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, বিশেষ করে যখন ইসলামাবাদ সরকার পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রবাসের ওপর বাধা আরোপ করে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতি টেমস নদীর তীরে আলোড়ন তুলেছিল। দূরের ঘটনাসমূহ বাংলা পত্রিকা এবং যারা অংশগ্রহণ করে যেমন ছাত্রদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে; অন্যান্য কার্যক্রম লন্ডনপ্রবাসীকে সরাসরি প্রভাবিত করে যেমন পাকিস্তান হাইকমিশন কর্তৃক দেখানো বঙালিদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার। এবং কখনো তাদের এখানে ঘটে যাওয়া ঘটনাও প্রভাবিত করেছিল, যখন ভাসানী, 'রেড মাওলানা' ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সময়কালে লন্ডনে রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিলেন। ভাসানীকে আদর্শবাদ এবং বাঙালি বিদ্রোহের সংমিশ্রণ বলা যায়। কৃষক নেতা হিসেবে তিনি অপ্রতিরোধ্য কিন্তু অতাত্ত্বিক, শ্রেণিসচেনতা তৈরি করে যা ইসলামের সমমাত্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে।[৬] তার নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যে দলটি বাঙালি রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর্যন্ত শাসন করে কিন্তু ওই দশকের শেষে ক্ষমতার সংগ্রাম তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তিনি বামদের নিয়ে নতুন আরেকটি দল গঠন করে যার নাম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অথবা ন্যাপ।[৭]

লন্ডনে ভাসানী আবদুল মান্নানের সঙ্গে তাসাদ্দুকে যোগ দেন যিনি সাবেক নাবিক, অভিবাসনের জনক এবং ক্যাফের মালিক। তিনি কমিউনিটি সংগঠনে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাসাদ্দুক ক্যারোলাইন অ্যাডামসের কাছে স্মৃতিচারণা করে বলেন কেনসিংটনে আবদুল মান্নানের বাড়ি আলস কোর্টের গ্রিন মাস্ক রেস্টুরেন্ট পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক নির্বাসিতদের সভার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের বিরোধী দলের কেন্দ্র ছিল ২৯ সেন্ট ম্যারি এবোট টেরেস।[৮] বামদের সঙ্গে তার জোট থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে তার সঙ্গে কাজ করা তাসাদ্দুকের সেই ব্যক্তি ছাড়া ভাসানী লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বাম রাজনীতির কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাননি। 'রেড মাওলানা'

নিঃসন্দেহে দক্ষ নেতা হওয়া সত্ত্বেও কোনো স্পষ্ট মতাদর্শগত বার্তা দেননি।

ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী

লন্ডনে বাঙালি রাজনীতি উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী এলিটদের ভূমিকা, যাদের অনেকেই ছাত্র ও পেশাদার তরুণ যারা রাজনীতি শিখেছে বাংলায় স্থানীয় জাতীয়তাবাদ আন্দোলন এবং নির্যাতিত বামদের কাছ থেকে। মার্ক্সবাদী ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রামীণ জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী চালিত হয়।

নুরুল ইসলাম ছিলেন এর মধ্যে একজন ছাত্র যিনি অভিবাসনের ইতিহাসে পঞ্চাশের শেষে ও ষাটের দশকে ব্রিটিশ বাংলা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৯] তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষে লন্ডনে এসেছিলেন। রেলওয়ে ক্লার্ক হিসেবে চাকরি নেন যখন লিনকন ইনে ব্যারিস্টার হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি স্মরণ করেন নর্থ লন্ডনে একটি বাড়িতে ১৫ জন ছাত্রের একটি মিটিংয়ের কথা যেখানে তাসাদ্দুক তাদের বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদী হওয়া ভালো কিছু নয় এবং ব্যারিস্টার ও আইনজীবী হয়ে লাভ কি যদি তুমি জনগণকে শোষণ করতে চাও? বরং নিজেকে শিক্ষিত কর, মার্ক্স, এঙ্গেলস, রুশো, **ভলতেয়ার**-মাজ্জিনি পড়, টলস্টয় এবং শান্তি ও সংঘর্ষ দেখো....।'

ইংল্যান্ডে আসার পরপরই ১৯৫৩ সালে অফিস সম্পাদক হয়ে তাসাদ্দুক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার গুরু ভাসানীর মতো তিনিও অনেক দ্বান্দ্বিক মানুষ: একজন জমিদারের ছেলে যিনি উৎসাহী কমিউনিস্ট, অভিজাত ভাবভঙ্গি রয়েছে, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালো করেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সদস্য হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন।[১০] কল্যাণমূলক কাজ হলো অভিবাসী সংস্থার কাঁচামাল এবং তাসাদ্দুক তার কাজগুলোকে কল্যাণমূলক অ্যাসোসিয়েশনের জন্য দেখেছিলেন জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা হিসেবে। তিনি নিজস্ব বিশ্বাস নিজের এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে পপুলার ফ্রন্ট রাজনীতিতে ছিলেন এবং আছেন।[১১] তিনি এবং অন্যরা কমিউনিটির বড় বিষয় নিয়ে বেশির ভাগ জনগণকে সচল করেছিল এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করেছিল, কিন্তু তাদের সমাজতন্ত্র খুব গভীরভাবে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে অন্যান্য কার্যক্রমে নিমজ্জিত থেকেছিল।

তাসাদ্দুকের আলোচনায় আরেকজন নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ছিলেন শাহ লুৎফর রহমান যিনি পঞ্চাশের দশকের শেষে ঢাকায় রাজনীতি করে আইনের ছাত্র হিসেবে

এলএসইতে (লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস) আসেন।[১২] ছাত্রদের কমনরুমে 'দক্ষিণ এশিয়া কি' শীর্ষক রাজনৈতিক আলোচনায় একজন আইরিশ মহিলা কর্তৃক কমিউনিটিতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর পূর্বাচলের বাঙালিদের সঙ্গে তাঁর আজীবন সম্পৃক্ততা শুরু করেন।[১৩]

শাহ ১৯৫৯ সালে কল্যাণ অ্যাসোসিয়েশনের অফিস সহকারীর দায়িত্ব নেন, যেখানে তিনি রোববার সকালে তার স্বদেশি অশিক্ষিতদের বাড়িতে চিঠি লেখার কাজে ও অফিসের ফরম পূরণ করা শেখাতে সাহায্য করত।

শেখ মান্নানও ব্রিটেনে ছাত্র হিসেবে ১৯৬৪ সালে আসে। তাঁর মনে আছে যে লন্ডনে পাকিস্তানি ছাত্ররাজনীতিতে বামপন্থীরা কর্তৃত্ব করত এবং ২০০ ছাত্র যাদের প্রায় সবাই বাঙালি তারা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করেছিল।[১৪] ষাটের দশকের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাম রাজনীতি দ্বারা ছেয়ে যায় কিন্তু পাকিস্তানি স্বাধীনতার পূর্বেই বাঙালি সংস্কারী মতবাদের নিজস্ব কঠিন লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে।[১৫] ভাগ হওয়ার আগের ঢাকায় শেখ মান্নান তরুণ কিশোর হিসেবে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নেমে পড়েন, সেখানে তিনি দেখেন নতুন পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিমরা পূর্বের হিন্দু এলিটদের প্রতিস্থাপন করেছিল, মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ষাটের দশকে বাঙালি বামপন্থীরা ভেঙে যায়, যেখানে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিফলন ছিল। 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' ধারণাটি একটি নতুন জাতীয়তাবাদকে বৈধতা দিয়েছিল এবং বিভিন্ন স্ট্যালিনিস্ট দেশগুলোর আমলাতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ১৯৬৪ সালে চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের দিকে ধাবিত করেছিল। মাওবাদীদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছিল যারা নিজেরা কৌশলগতভাবে বিভক্ত ছিল। শেখ মান্নান বিভক্ত ন্যাপের মস্কোপন্থী সেকশনকে অনুসরণ করে। তিনি দাবি করেন বেশির ভাগ ছাত্র তার মস্কোপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী।[১৬] শাহ কমিউনিস্ট পার্টির পিকিংপন্থী দলকে অনুসরণ করে এবং নুরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে।

নূরুল ইসলাম দেখেছেন ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সামরিক শাসনের অধীনে এলে লন্ডনের ছাত্ররা নতুন রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দেখে:

> "আমরা বলেছি আমরা মুক্ত। এখানে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। পাকিস্তানে কী হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে জানানোর দায়িত্ব আছে, গণমতামত তৈরি, আন্তর্জাতিক মতামত তৈরির দায়িত্ব আছে; কারণ আইয়ুব খান ও সামরিক শাসন সকল সাংবাদিকদের অবহেলা করেছে।"[১৭]

আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত অভিবাসীদের নূরুল ইসলাম ছাত্র পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য করতেন যারা পূর্বের রাজনৈতিক ক্যাম্পেইনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। যদিও কমিউনিটি কর্তৃক তৈরি রাজনৈতিক চাহিদার গ্রহণক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাদের

রাজনৈতিক জ্ঞান সাধারণত ছিল কম। বাঙালিদের ভিত্তি রাজনীতির উন্নয়নের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার উপযোগী নয় এবং তাদের অনেকে কম শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। নুরুল ইসলাম মনে করেন চিত্তবিনোদনের অন্য উপায় না থাকা গণমিটিংয়ে লোকজন সমাগমের একটা কারণ এবং তিনি স্বীকার করেন যে ষাটের দশকের শেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা বলতে ছিল না।'[১৮] যদিও কিছু রেস্টুরেন্ট মালিক যেমন আবদুল মান্নান তাসাদ্দুকের আলোচনা গ্রুপে এসেছিল, কিন্তু শাহ বাঙালিদের অধিকাংশ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে দেয়নি, তিনি খুঁজে বের করেন তারা সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করে এবং তাদের জীবনের দিগন্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।[১৯] অনেকের মতে ছাত্ররাজনীতি অনেকটাই চরমপন্থী ছিল। শাহ স্মরণ করেন যখন তারা তাঁদের বুলেটিন পূর্ব বাংলা বিক্রয় করেন,

> অনেক মানুষ এটা পছন্দ করেনি, তারা ভাবে আমরা পঞ্চম কলামিস্ট, কমিউনিস্ট। অনেক মানুষ আমাদের বিরোধিতা করে এই বলে যে আমরা পাকিস্তান ভাগ করতে চাই। ভারতের মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান ছিল খাঁটি এক আকাঙ্ক্ষা।[২০]

শাহ-এর মতে, অন্য বাঙালিদের মধ্যে সংহতি আনার জন্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছাত্ররা 'অনুঘটক' হিসেবে কাজ করে । তিনি মন্তব্য করেন :

> বাঙালিদের রাজনীতিকরণ সহজাতভাবে লন্ডনের পূর্বাচলে ঘটেনি। এটা ঘটেছে কারণ বাঙালি সম্প্রদায়ের কিছু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, লন্ডনের পূর্বাচলের বাঙালি সম্প্রদায় সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন, বিশেষত পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে।[২১]

ছাত্ররা প্রশাসনিক, পেশাগত দক্ষতা ও বিস্তৃত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এনেছিল এবং কঠোর পরিশ্রমী অভিবাসীদের যে ধরনের সময় থাকত না তা তাদের ছিল।

এখানে দেখা যায় পূর্বের আন্দোলনের স্মৃতি কমিউনিটিকে রাজনৈতিক ধারণাগুলোর ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত গ্রহণক্ষম করে তোলে, কিন্তু তারা তৃণমূল সংগঠনের তেমন উত্তরাধিকার রেখে যায়নি। যদিও এখন অন্য প্রজন্মের কর্মী এবং নতুন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাঙালিকে কাছে টানছে। ছাত্র এবং বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ১৯৬৪ সালে হাইবুরিতে পূর্ব পাকিস্তান হাউসের প্রতিষ্ঠা দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাথমিক উৎসাহ আসে ছাত্র এবং কর্মীদের থেকে কিন্তু বাড়িটি অর্থায়ন করেছিলেন রেস্টুরেন্ট মালিকরা। শাহ স্মরণ করেন যে যদিও তাঁরা উদার ছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রথমে সতর্ক ছিলেন।[২২]

১৯৬৯ সালে যখন শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য ভারতের সঙ্গে পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তান হাউসের কর্মী ও রেস্টুরেন্ট মালিকগণ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাকিস্তানে পাঠানো হয় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য।

গণসমাবেশ

১৯৭১ সালের ঘটনা প্রবাসী বাঙালিদের আলোড়িত করেছিল এবং শুধু তাদের মাতৃভূমি একটি নতুন সম্পর্ক ত্যাগ করেনি, একটি নতুন রাজনৈতিক সচেতনতাও ত্যাগ করেছিল। ট্রিগার ছিল পাকিস্তানের নির্বাচন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর বারো বছরের একনায়কতন্ত্রের পর পাকিস্তান নির্বাচনে যায় কিন্তু নির্বাচনের আগে পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে যার ফলে লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। দুর্যোগ মোকাবিলায় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের অবহেলা বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিভেদ সৃষ্টি করে। ব্রিটেনে জরুরি ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তানি অ্যাসোসিয়েশন এবং পূর্ব লন্ডন মসজিদ[২৩] অর্থ সাহায্য বাড়ায়, ছাত্ররা সভার আয়োজন করে সবার কাছ থেকে টাকা, কাপড় ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে গণসমাবেশের জন্য।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়। অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করে, আর বাকিরা প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়[২৪] এবং লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি পায়। আসনগুলো জনসংখ্যা হিসেবে বণ্টন করা হয় যেখানে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায় এবং এটা জাতীয় সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সহায়ক হয়।[২৫] কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাগণ আওয়ামী লীগ সরকারকে গ্রহণ করেনি। মূল নেতাদের সভায় কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পেছানোর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং জনগণ ঢাকার রাস্তায় নেমে আসে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ৭ মার্চ জনগণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে লাখ লাখ মানুষকে বলে এই সংগ্রাম চূড়ান্ত মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মার্চের প্রথমদিকে লন্ডনের প্রধান পাকিস্তানি হোস্টেল চেসাম প্লেস আলোচনায় উত্তেজিত ছিল। তখনকার বামপন্থী পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট শেখ মান্নান বোর্ডে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানিকে রাখতে চেয়েছিল।[২৬] ছাত্ররা শেখ মুজিবের রেডিওতে প্রচারিত ভাষণ শুনেছিল এবং সরাসরি পাকিস্তান হাইকমিশনের বাইরে অবস্থান করেছিল। ছাত্রদের জন্য সাধারণ জীবনযাপন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিদিন রাত শুধু আলোচনায় কাটে এবং বাংলা থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। বাঙালি ডাক্তার, মহিলা ও অন্যান্য গ্রুপের সভা হতে থাকে এবং আলোচনা করতে থাকে তারা কে কী করতে পারবে।[২৭]

ঢাকায় মূল দলের মধ্যে ২৪ মার্চ সমঝোতা আসে এবং সে রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সহিংসতা ব্যভিচারের মাধ্যমে হাজার হাজার নির্দোষ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। ব্রিটেনে সব জায়গায় সভা হতে থাকে এবং অ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়। তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধব থেকে পাওয়া খবরের

ওপর ভিত্তি করে কিছু একটা করার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ছিল তাদের মধ্যে। অবশ্যই কিছু ছিল যারা পাকিস্তানের প্রতি তাদের অতীতের আনুগত্য বজায় রাখে কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল নবাব আলির মতো, যার বেপরোয়া কাজ ক্যারোলিন অ্যাডামসের মৌখিক ইতিহাসে রয়েছে :

> আমি বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন করি, (যেমন : ব্রিটেনের কাছ থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে করেছিলাম) তাৎক্ষণিক করিনি কারণ আমরা পাকিস্তান তৈরির জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, তাই আমরা এটা হারাতে চাই না, কিন্তু যখন আমরা সংবাদপত্র দেখি, বাঙালি নারীদের সঙ্গে তারা কী করেছে তার চিত্র দেখি, তখন সেটা সমর্থন না করে পারিনি। আমার পরিবারের আটজন সদস্য ছিল মুক্তিবাহিনীতে।[২৮]

ব্রিটিশ বাঙালিদের একটি গ্রুপে আনা অত সহজ ছিল না—অন্য সব সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম তৈরি হয়। কমিউনিটি রাজনীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং প্রথাগত বন্ধন[২৯], কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীর মধ্যে কম আলোচিত কিন্তু মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য ছিল। আওয়ামী লীগের মধ্যে রেষারেষি দুটি সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল। দুটোই নিজেদের আওয়ামী লীগের বৈধ ব্রিটিশ অংশ বলে দাবি করে। যা হোক, বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার বাইরে এক ভিন্ন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল। যদিও বেশির ভাগ বামপন্থী আওয়ামী লীগ ও জোট নিরপেক্ষ দলের সঙ্গে মিলে কাজ করেছে, তবুও অন্তর্নিহিত টেনশন ও অবিশ্বাস ছিল।

শেখ মান্নান উত্তাল সাংগঠনিক ইতিহাস স্মরণ করেন। সমবায় সমন্বয় পরিষদের প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টার পরে কভেন্ট্রিতে কনভেনশনের জন্য বাঙালিদের মধ্যে সভা হয়। এটা ২৪ এপ্রিল হয়। ক্যারোলিন অ্যাডামসের কাছে লুলু বিলকিস বানু সভা সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন :

> সভার সভাপতি হিসেবে তারা অন্য কাউকে চেয়েছিল, তাই যখনই কারও নাম প্রস্তাবিত হয় অন্যরা চিৎকার করে, 'না, না, সে চোর, সে প্রতারক, সে এটা সে ওটা।' (তারপর কেউ মিসেস বানুকে বলেন আমাকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য) এবং আমি বলি ঠাট্টা করবেন না, এই নরকে আমি সভাপতিত্ব করব? তারা চেয়ার ভাঙছে, একে অন্যকে মারছে, শুধু ওখানে অনেক শত্রুতা ছিল (কিন্তু তাকে চেষ্টা করার জন্য রাজি করানো হয়েছিল) এবং তারা সকলে হাততালি দেয়। অনেক শান্ত ছিল সবাই, কেউ বিরোধিতা করেনি, কারণ আমি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অদলীয় ছিলাম।[৩০]

কনভেনশনে পাঁচজনের জাতীয় কমিটি গঠিত হয়, শেখ মান্নানও ছিলেন যিনি আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি স্মরণ করেন তাঁরা কেউই আওয়ামী লীগের পরিশোধিত সদস্য ছিলেন না। এই কমিটি ক্যাম্পেইনটি সমন্বয় করে এবং একটি বড় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের দায়িত্বও ছিল এই কমিটির ওপর। তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় আওয়ামী লীগের একটি বড় দল কমিটি দখলের প্রয়াস চালায়, যারা গণহারে স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে প্রবেশের জন্য সুবিধাজনক উপায় গ্রহণ করে।[৩১] লন্ডন পর্যায়ে চৌদ্দটি ভিন্ন কমিটি এক নেতৃত্বের অধীনে আনার উদ্যোগ সফল হয়নি।

কমিটির বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ হলো বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পিকিংপন্থী, যারা কভেন্ট্রি কনভেনশনের পর সংগঠিত হয়। তারা পূর্ব বাংলায় তাদের নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে 'গণযুদ্ধ' নামে তাদের নিজস্ব পত্রিকা বের করে, যা তারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়। পপুলার ফ্রন্টিজমকে বাতিল ঘোষণা করার পাশাপাশি তারা বলে যে মার্ক্সবাদ তত্ত্বীয় গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না। বরং এটা করতে হবে মাওবাদী ধারার কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে।

মস্কোপন্থী, ভাসানী ন্যাপ-এর পিকিংপন্থী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকসহ বেশির ভাগের জন্য সার্বিক নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান হয় বাইরের হস্তক্ষেপে। যখন জেনেভাতে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে কোন্দল শুরু হয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক আবু সৈয়দ চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি বিভিন্ন দলের সমস্যাগুলো সমাধানের পক্ষে মত দেন। জাস্টিস চৌধুরীকে পরে কলকাতায় বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং কমিটিকে মধ্যপন্থী লাইনে রাখা নিশ্চিত করে। এটা একমত হয় বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য ট্রাস্টি অবশ্যই জাস্টিস চৌধুরী এবং দুজন নিরপেক্ষ অবাঙালি ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ এবং জন স্টোনহাউস হওয়া উচিত। স্টোনহাউসের পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে (তার নিজের মিথ্যা আত্মহত্যার ঘটনার পর অর্থনৈতিক জালিয়াতির জন্য অপরাধী প্রমাণিত হওয়া) বাঙালি মতামত হলো, ১৯৭১ সালে স্টোনহাউসের ভূমিকা নিঃস্বার্থ ও সৎ ছিল।[৩২] চেসওয়ার্থ ছিল ওয়ার অন ওয়ান্ট-এর চেয়ারম্যান এবং পূর্ব বাংলায় তার কাজের সুপরিচিত প্রমাণ ছিল।

অনেক ভগ্নাংশ সমস্যাগুলোর মূলে ছিল পূর্ব বাংলা কিন্তু বাঙালি গ্রামের সংযোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত যখন জনগণের বিক্ষোভের সময় উত্থান হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন নেতার একটি প্রথাগত বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত আশাগুলো করতে পারে[৩৩] এবং সামগ্রিক সংখ্যার অনুমোদনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক উপাদান পরিবেশিত হয়।

ব্রিটিশ কমিটির দুটি প্রধান কাজ ছিল : প্রজ্ঞাপন এবং অর্থায়ন। তারা পুরো বাঙালি সম্প্রদায়কে এক করতে চায় এবং শেখ মান্নান 'প্রত্যেক বাড়ি ও ফ্ল্যাটের' তদবিরের কথা স্মরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক দিক অবজ্ঞা করেন এবং স্বাধীনতার কথা বলেন।[৩৪] মতাদর্শ সাধারণত পত্রিকা ও জার্নালে ন্যস্ত থাকে। পূর্বে অন্য অভিবাসী ও নির্বাসিতদের মতো বাঙালি বিস্তৃত গণচাপের কেন্দ্র হিসেবে লন্ডনের কৌশলগত মূল্যকে উপলব্ধি করে।[৩৫] এর শেষে তারা বিক্ষোভের আয়োজন করে। সংসদীয় সদস্যদের আহ্বান করে। দলের ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্মেলন করে এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রে চিঠি ও বিজ্ঞাপন পাঠায়। যারা বাংলার ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী তারা ভাষার

ব্যবহার করতে পারে। অক্টোবরে আজিজ চৌধুরী যখন লন্ডনে পৌঁছায় তখন তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা পীর হাবিবুর রহমান তাকে বলেন কী হচ্ছে তা সবাইকে জানানোর জন্য এবং একজন বাঙালি পাসপোর্ট অফিশিয়াল তাঁর জীবন কেড়ে নেন।[৩৬] তিনি সমগ্র ইংল্যান্ডে বাঙালি সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। যখন তাঁরা এমন কারও কথা শোনেন যিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। আমি দুবার বন্দুকের মুখে পড়েছি যাতে মানুষকে সাহস জোগাতে পারি দেশের জন্য অবদান রাখতে।[৩৬] অর্থায়ন সম্প্রদায়কে আলোড়িত করে এবং সবার সাহায্যে অর্ধ মিলিয়ন পাউন্ড সংগৃহীত হয়।[৩৮] আলী সৈয়দ গয়াস এখন টয়েনবি হল প্রিজনারস ক্লাবের সদস্য। তখন তাঁর বাবার সঙ্গে বার্মিংহামে বসবাস করতেন। গৃহস্থালি কাজ করে তাঁরা ৮ পাউন্ডে সপ্তাহ চালাতেন এবং একটি গাড়ির ফ্যাক্টরিতে রাতের শিফটে কাজ করে ২৫ পাউন্ড বাড়িতে পাঠাতেন। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে আসেন এবং অনেক মাস তাঁরা মা-ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো খোঁজখবর পাননি। তিনি ৫২৮ পাউন্ড তাঁর ব্যাংকে জমা করেন এবং বাংলাদেশ ফান্ডে দান করেন।[৩৯]

গয়াস ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। টয়েনবি ক্লাবের আরেক সদস্য আবদুর রাজ্জাক তখন ব্রাডফোর্ড উল মিলে রাতে কাজ করতেন। তিনি কখনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু ১৯৭১ সালে শনিবার সকালে যখন তাঁর কাজ শেষ করেন তখন ব্রাডফোর্ডের বাঙালিদের সঙ্গে লন্ডনের বিক্ষোভে যোগ দেন এবং রাজ্জাক আওয়ামী লীগের একজন সদস্য হয়ে যান।[৪০]

এটা আলহাজ শামস উদ্দিনের রাজনৈতিক জাগরণের সময় ছিল, যিনি ১৯৬৩ সালে ব্রিটেনে আসেন এবং বর্তমানে জাতীয় পার্টির যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি। তিনি ব্যাখ্যা করেন : 'সে সময় প্রায় সবাই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হচ্ছিল কারণ পূর্বে কেউই রাজনীতিতে আগ্রহী ছিল না'।[৪১]

আন্দোলনের শ্রেণিভেদ্য প্রকৃতি সত্ত্বেও কিছু রেস্টুরেন্ট শ্রমিক তাদের চাকরি বিক্ষোভের ঝুঁকিতে ফেলেছে। তাদের বাঙালি কর্তাগণ যখন কাজ ছাড়তে এবং বিক্ষোভে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের অবৈধ অভিবাসী প্রমাণিত করার হুমকি দিয়েছেন, তখন বাণিজ্যিক স্বার্থই বিজয়ী হয়েছে।[৪২]

পূর্বাচলের বাঙালিদের[৪৩] মধ্যে কিছু নারী ছিল যাদের যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কাজে বাধা ছিল। কিন্তু সংখ্যায় কম কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত নারী ছিলেন যাঁরা ট্রাফালগার স্কয়ারে অর্থায়নের কাজ করেছেন। শাহ লুৎফর রহমানের স্ত্রী মুন্নি, শেখ মান্নানের স্ত্রী রোজি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মুক্তিবাহিনীর জন্য যুদ্ধাস্ত্র, পরিবহন খরচ প্রচারণার জন্য টাকা সংগ্রহ করা হয়। শেখ মান্নান বলেন, 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং সবাই অস্ত্র কেনার জন্য টাকা ব্যয় করতে চায়। কিন্তু আমরা যখন ভারতীয় হাইকমিশনে যোগাযোগ করি আমরা প্রত্যাখ্যাত হই।' আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনায় সংগৃহীত অর্থ অনেক কম বলে অজুহাত দেওয়া হয়।

> বৃদ্ধ লোকটি বসে হাসছিল। তিনি বলেন, 'তোমাদের কত টাকা আছে?' আমি বললাম, 'আমরা যত অস্ত্র পাঠাব তত টাকা আসবে।' তারপর তিনি বলেন, 'তোমাদের পকেট কত বড়।'[৪৪]

অকুতোভয় শেখ মান্নান ও তাঁর কিছু সহকর্মী পাকিস্তানি নৌবাহিনীর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি বলেছিলেন যে সে ব্যাক্তিগতভাবে কিছু ক্ষুদ্র অস্ত্র জোগান দিতে পারেন। কিন্তু যখন তাঁরা জাস্টিস চৌধুরীর মুখোমখি হন তখন তিনি হতভম্ব হয়ে যান।'

> তিনি টেবিলে মাথা রেখে নুইয়ে পড়েন। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে হতাশ, নিরাশ ও চূর্ণ করেছ। কীভাবে ব্রিটিশ সরকার এটার অনুমতি দেবে? যদি তারা কাল এটা জানতে পারে যে তোমরা এটা করেছ আমার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। দেশের বাইরের সকল আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা কেন এটা করেছ?

জাস্টিস চৌধুরী কলকাতায় নির্বাসিত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনারেল ওসমানী ও অন্যদের অস্ত্রের জন্য ব্যক্তিগত অনুরোধ পাঠানো বন্ধ করতে বলেন।[৪৫] যুদ্ধের পর বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে টাকা দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠনে ব্যবহৃত হয়।[৪৬]

ব্রিটিশ বাঙালিরা তাদের প্রভাবের সীমা বুঝতে পারে। এটা লন্ডনের সংস্থাগুলোর বিশ্বাস যোগ্যতা ও শান্তি ধ্বংস করে দেয়। মান্নান পরে পর্যবেক্ষণ করেন টাকা আসার পরিমাণ উৎসাহজনক কিন্তু যখন তারা শুনতে পায় যে কোনো অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে না তখন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।[৪৭]

পপুলার ফ্রন্টের লিগ্যাসি

১৯৭১ সালের সংহতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের বিশ্লেষণে বাম গোষ্ঠীদের পপুলার ফ্রন্ট নীতির প্রভাব পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলর ছিল। কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটে যেসব বাঙালি কাজে যুক্ত ছিল, তারা আন্তঃযুদ্ধ কর্মকাণ্ডে তাদের শিক্ষা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

১৯৭১ সালে পপুলার ফ্রন্ট এবং স্টেজ তত্ত্ব অনুসারে পাকিস্তান ও ব্রিটেনের অধিকাংশ বাঙালি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক ব্যবধান দূরে রেখেছে। শেখ মান্নান তাঁর অবস্থান সম্পর্কে বলেন :

> জাতীয়তাবাদ একটি রোগ। কিন্তু আমরা ১০০০ বছর ধরে অনেক অত্যাচারিত হয়েছি; আমরা জাতীয়তাবাদের ট্যাগ চাই প্রথমে, অন্যথায় আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারব না। আমরা ভাবছিলাম আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে দাও এবং স্বাধীনতার পরপর আমরা বিভক্ত হব এবং তখন তারা তাদের প্রোগ্রাম জনগণকে দেবে। যদি আমরা সফল হই সরকার আমাদের। এভাবে

আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। যদি আওয়ামী লীগ দেশে ও দেশের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র দল হতো তাহলে এটা ব্যর্থ হতো।[৪৮]

স্টিয়ারিং কমিটির একজন আহ্বায়ক হিসেবে তাঁকে 'নিরপেক্ষ' এবং 'দল নয়, জাতীয়তাবাদী চেতনা' ধারণ করতে হতো। যদি তিনি কখনো তাঁর রাজনৈতিক মতামত দিতে চান, জাস্টিস চৌধুরী তাঁকে বলবেন 'স্বাধীনতা প্রথমে নাকি তোমার মতাদর্শ প্রথমে?'[৪৯]

নুরুল ইসলাম যিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাস করতেন কিন্তু রাষ্ট্রদূত হিসেবে মুক্তি কমান্ড দ্বারা দুই মাসের জন্য ইউরোপে পাঠানো হয়, মনে-প্রাণে নিজেকে শেখ মুজিবের অনুসারী করেছিলেন 'কারণ সময়ের প্রয়োজন ছিল জাতীয়তাবাদ'। তার মানে এটা নয় তিনি তাসাদ্দুক যুগের সব আদর্শ প্রত্যাহার করেছেন : তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক শাস্ত্রে, কিন্তু অনুভব করেন যে এটা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছাড়া অসম্ভব।[৫০]

শেখ মুজিবের ক্ল্যারিজ হোটেলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণায় তাসাদ্দুকের সম্পৃক্ততা পপুলার ফ্রন্টের রাজনীতিকে সংক্ষেপে তুলে ধরে।[৫১] কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের বাম সমর্থনকারীদের কিছু ছাড় দিত এবং মুজিব হিথরোতে নামার আগে শেখ মান্নানকে এ ব্যাপারে খোলাসা করেছেন।[৫২] বেশির ভাগ বাম নেতা স্বাধীনতার কারণ প্রচারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে শেখ মান্নানকে এটা মানতে হয়েছিল।

জনগণ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। আমি তাদের রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ব বলব না কিন্তু তারা জানত না কারণ কেউ মওলানা ভাসানী থেকে বার্তা নেয়নি, রেস্টুরেন্ট, ফ্যাক্টরি, গার্মেন্টসে গিয়েছিল যেখানে আমাদের জনগণ কাজ করে। যদি আমরা যেতাম তা হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।[৫৩]

ব্রিটিশ বাঙালি সম্প্রদায়ে বামপন্থীরা আলাদা পরিচিতি পায়নি। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের বাইরে অধিকাংশ বাঙালি স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করে। যদিও লন্ডন তিন দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিধ্বনি দেখছে, কিন্তু আর কোনো গণ আন্দোলন ছিল না এবং মতামত ও অগ্রাধিকার বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কমিউনিটি তার দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের দিকে মনোযোগ দেয়। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বাঙালিদের নতুন গণপরিচয় ও পরিচিতি হয়ে গেছে বাস্তবভিত্তিক রাজনীতি যেখানে লক্ষ্য হলো বিদ্যমান ব্যবস্থার সুষ্ঠু ভাগ নেওয়া, ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া না।

আমি এটা বলছি না যে স্বাধীনতাযুদ্ধ ছাড়া বাঙালি সম্প্রদায় একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারত। এই ইতিহাস একটি সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রভাবের উদাহরণ, যা সর্বত্র অভিবাসী নীতিকে প্রভাবিত করেছে। নতুন মতাদর্শ যা পপুলার ফ্রন্টিজম থেকে আসে তা উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। সত্তরের দশকের

'কালো প্রগতিবাদ' শেষ হয়ে গেছে, যা শুধু এটার রূপকের আমূল পরিবর্তনে নয়, বরং রাজনৈতিক মূলধারার বিভিন্ন আসনে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও।[৫৪] ব্রিটিশ বাঙালিদের রাজনীতি বৃহৎ প্যাটার্নের সঙ্গে মিশে গেছে[৫৫] এবং মুক্তিসংগ্রাম একটা আন্দোলন ছিল যার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধারণা ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্যতা পেত যদি সমাজতন্ত্রের ধারকেরা নিজেদের বিদ্যমান বাম অর্থডক্সির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংকুচিত না করে ফেলত।

১৯৭১ এবং লেবার পার্টি

একই সময়ে পপুলার ফ্রন্ট রাজনীতির মূলধারার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বাম নেতাদের কাজ করাকে গ্রহণক্ষম করে তোলে। বাংলাদেশি স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনীতিকীকরণ অনেক ব্রিটিশ বাঙালিকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত করে। লেবার রাজনীতির সঙ্গে 'বাঙালি সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য ১৯৭১ সালের ঘটনা ভূমিকা রেখেছে'।[৫৬] বাঙালি অধ্যুষিত স্টেফানির সাবেক এমপি পিটার শোর বলেছেন, 'মতাদর্শগতভাবে আওয়ামী লীগ এবং লেবার পার্টির মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল।'[৫৭] বাস্তবিক অর্থে সংসদীয় দলটি বাঙালি মতামত প্রচারের জন্য চ্যানেল হিসেবে কাজ করে। শোর আমাকে বলেছেন :

আমি নিজেকে অনেক তাড়াতাড়ি গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে দেখেছি এবং আমি আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। (বাংলাদেশে) যা হয়েছে তাতে আমি ক্ষুব্ধ; আমি ব্রিটিশ রাজনীতির বেশির ভাগ মানুষের চেয়ে এ বিষয়ে ভালোভাবে জানতাম কারণ আমার অনেক সংগঠক আমাকে তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের দুর্দশার কথা বলেছে।[৫৮]

তাঁর অবদান বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পিটার শোরের প্রতি সমর্থন তার পুনর্নির্বাচনের যুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যখন মধ্য আশির দশকে জিল কোভ তাকে চ্যালেঞ্জ করে। অবশ্যই কিছু বাঙালি প্রগতিশীল ব্যক্তি সমর্থন দেয়, কিন্তু শোর দেখেছেন, 'কমিউনিটি হিসেবে বাঙালিদের সমর্থনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।'[৫৯]

যুদ্ধের পর সম্পর্কটি অভিবাসনের নতুন অধ্যায় দ্বারা উৎসাহিত হয় এবং ভবিষ্যৎ আশা ব্রিটেনের দিকে ব্যক্ত করে। সত্তরের দশকের শুরুতে অনেক মহিলা ব্রিটেনে আসে। এটা একাত্তরের অভিবাসন নীতির নিয়ন্ত্রণের অধীনে ছিল, যা যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এবং পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলার ফলাফল ছিল। আশির দশকের শুরুতে নতুন জেনারেশন স্থানীয় লেবার পার্টিতে সরাসরি কাজ করার জন্য তৈরি হয়।[৬০]

লেবার পার্টিতে রাজনৈতিক জায়গা পাওয়ার জন্য বাঙালিরা স্ট্যান্ডার্ড অভিবাসী রুট অনুসরণ করে এবং যখন পার্টি স্থানীয় টাউন হল শাসন করত তখন লেবার পার্টির পছন্দ ছিল রাষ্ট্রীয় (বাঙালি লেবার কাউন্সিলরের সাক্ষাৎকার ২০০০)।[৬১]

লিগ্যাসি

লন্ডনের পূর্বাচলের একাত্তরের অনেক কর্মী তাদের আগের প্রজন্ম থেকে বেশি শিক্ষিত ছিল এবং তারা এই দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। বর্তমান অভিবাসীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনেক কম। আনসার আহমেদ উল্লাহ, যিনি ১৯৭৫ সালে ১৫ বছর বয়সে ব্রিটেনে আসেন, লক্ষ করেন :

> আমাদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের আগে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেছে এবং এ সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং এখানে এসে তারাও একইভাবে অনুভব করে। তারা মনে করে ইতিমধ্যে তারা এটা বুঝে ফেলেছে... আমরা আক্রান্ত হয়েছি, আমরা চাকরি পাব না, ঘর পাব না এবং সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের নিচে থাকতে হবে।[৬২]

এসব মানুষ ব্রিটেনে তাদের জায়গার জন্য সংগ্রাম করতে রাজি এবং জাতিগত সচেতনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদের সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত।

শতাব্দীর শুরুতে টাওয়ার হ্যামলেটের বাঙালি সম্প্রদায় তাদের সুশীল সমাজ (২০০২ নির্বাচনের পর) ২৮টি পৌরসভাভিত্তিক নগরের ৫১ জন কাউন্সিলর (তাদের মধ্যে ২২ জন লেবার পার্টির সদস্য)। সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। ৯/১১ পূর্বে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে উগ্রবাদী মুসলিমরা চ্যালেঞ্জ করে।[৬৩] যে প্রজন্ম একাত্তরের চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কিন্তু বিশ্বাস করে ধর্ম হলো ব্যক্তিগত পছন্দ এবং একে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত।

কিছু মানুষ নির্মূল কমিটি দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করতে চেয়েছে। এই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধে ছেলে হারানো এক বাংলাদেশি মায়ের দ্বারা, যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মুক্তি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে তুলে ধরার ক্যাম্পেইন চালিয়ে গেছে। এটা বলা হয় কিছু ইসলামি নেতা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং মসজিদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। জামাতে ইসলামী পার্টি পাকিস্তান বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের যুক্তি ছিল ইসলামে রাষ্ট্রের একাত্মতা জরুরি। সরকারপন্থী বাঙালিদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে স্থানীয় জানাশোনা থাকায় যুদ্ধের অনেক ভয়াবহ নৃশংসতা চালায় বা চালাতে সাহায্য করে।

নির্মূল কমিটি ব্রিটিশ বাঙালি হিসেবে বাঙালি তরুণদের ভালো পরিচয় তৈরিতে সাহায্য করতে চায়। আনসার আহমেদ উল্লাহ স্বীকার করেন 'যেহেতু নির্মূল কমিটি রাজনৈতিক তাই এটি তরুণ প্রজন্মের কাছে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠেনি'[৬৪] এবং তাঁর সহকর্মী সুনাহওয়ার আলী মন্তব্য করেন :

> যদি তুমি বাঙালি সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে কথা বল। যদি বল 'একাত্তর কী, কী ঘটেছিল? বাংলাদেশ ও কার যুদ্ধ হয়েছিল?' তারা বলবে, মনে হয় ব্রিটিশদের সঙ্গে বা অন্য কিছু। মানুষের কোনো সূত্র নেই।[৬৫]

নির্মূল কমিটির প্রতিক্রিয়া ছিল দু ধরনের। তারা তরুণ প্রজন্মকে একাত্তরের ঘটনা জানাতে চেষ্টা করেছিল এবং এটি তারা করতে চেয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তরুণদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে। যা হোক, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ইসলামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, যা তার অনুসারীদের মতাদর্শ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা, বিরোচিত ইতিহাস, আন্তর্জাতিক শক্তি ও ভ্রাতৃত্ব এবং ভবিষ্যৎ উচ্চ সম্মানের ব্যাপারে ধর্মীয় প্রতিশ্রুতি দেয়। বিকল্প তৈরির শক্তি প্রয়োগের জন্য সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন, যা সামাজিক বঞ্চনার জন্য নিজস্ব চরম আদর্শগত ও ব্যবহারিক এজেন্ডা উপস্থাপন করতে ভয় পায় না।

উপসংহার

গত ত্রিশ বছরে একাত্তরের উদ্দীপনা অনেক রূপ ধারণ করেছে। এতে করে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গণসমাবেশের প্রভাব কমিউনিটির মধ্যে এখনো রয়েছে এবং এটা এভাবে ব্যবসায়ী, শ্রমিক, শিক্ষিতদের একই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে নিয়ে এসেছে। এখানে আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার গুরুত্ব পরীক্ষা করা হয়েছে। কীভাবে স্ট্যালিনের স্টেজ থিওরি ও পপুলার ফ্রন্টিজম বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রে কাজ করে জাতীয়তাবাদের পক্ষে তা দেখানো হয়েছে। একটা বিস্তৃত গবেষণামূলক ইতিহাসের রাজনীতির ওপর আদর্শগত উন্নয়নের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা ব্রিটিশ অভিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ব্রিটিশ বাঙালি রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় খুলেছে কিন্তু যদি আগামী প্রজন্মের জন্য একাত্তরের উদ্দীপনা হালকা হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সেই ইতিহাস এখনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। এবং এটা পূর্বাচলের বাঙালিদের জন্য সত্য, যেখানে অনেকে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক মনে করে এবং সংরক্ষণশীল ইসলামিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে নিয়ে নতুন পপুলার ফ্রন্ট গঠন করতে চায়।

তথ্যসূত্র :

(নির্দিষ্ট নির্দেশিত কিছু ছাড়া সকল সাক্ষাৎকার লেখক কর্তৃক গৃহীত)

১. বেশির ভাগ ব্রিটিশ বাঙালি নিজেদের বাঙালি বা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, যদিও কেউ কেউ প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯৭৭ সালের ইসলামিক সংবিধানের পরিবর্তনের কারণে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য বাংলাদেশি ব্যবহার করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানিদের কথা বলার সময় আমি বাঙালি ব্যবহার করেছি।

২. Kalbir Shukra, *The Changing Pattern of Black Politics in Britain*. (London, 1998).

৩. VI Lenin, *Collected Works* Vol.22 (Moscow, 1964) pp.143-156.

৪. ‘Estimating the growth of the Bangladeshi population of Great Britain’ *New Community* 16(4) (1990). এ চেরি পিচ পুরো চিত্র (ব্রিটেনে জন্মগ্রহণকারী ১,০০০ বাঙালিসহ) হিসাব করেছেন। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩,৫৬০ জন যারা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে টাওয়ার হ্যামলেটে বাস করে কিন্তু অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছে। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় টাওয়ার হ্যামলেটের ৯,৮০৮ জন পূর্ব বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং ৬৫৭ জন পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে।

৫. Yousuf Chowdhury, *The Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers* (Birmingham, 1993), and Caroline Adams, *Across Seven Seas and Thirteen Rivers* (London, 1994, first published 1987).

৬. Talukder Maniruzzaman ‘Radical Politics and the Emergence of Bangladesh’ in Paul Brass and Marcus Franda (eds) *Radical Politics in South Asia* (Cambridge Mass, 1973) pp.230-231.

৭. Lawrence Zirling *Bangladesh – From Mujib to Ershad: An Interpretative Study* (Karachi, 1992) pp.32-34.

৮. Tasadduk Ahmed, interviewed by Caroline Adams, 1980s.

৯. নূরুল ইসলামের ‘প্রবাসীর কথা’ (সিলেট, ১৯৮৯)। ১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে পরিবারের কাছে ফেরত আসার আগে ব্রিটিশ পাকিস্তানি সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক সেখানে আটক হন। তিনি এখন সিলেটের বিদেশি কেন্দ্র চালাচ্ছেন। ২০০১ সালের ১২ জুন লন্ডনে নূরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

১০. ব্রিটেনে তার পাকিস্তানি কল্যাণমূলক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কাজ ও ক্যাম্পেইন এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য জার্নাল তৈরি পাশাপাশি তাসাদ্দুক ১৯৬০-এ জাতীয় পাকিস্তানি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারী অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিল এবং ১৯৯৮ সালে স্ট্রোকের আগে ১৯৭৯ সালে স্পিটফিল্ডস স্মল বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের গোড়া থেকে চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তাঁকে তাঁর কাজের জন্য এমবিই উপাধি দেওয়া হয়।

১১. Tasadduk Ahmed, interviewed by Caroline Adams, 1980s.

১২. Shah Lutfur Rahman, interviewed 22nd August 2001.

১৩. Shah Lutfur Rahman, interviewed 18th August 2001.

১৪. Sheikh Mannan, interviewed 30th March 2002.

১৫. Khizar Humayun Ansari *The Emergence of Socialist Thought among North Indian Muslims (1917-1947)* (Lahore, 1990), and Anthony Cox ‘Paternal Despotism and Workers’ Resistance in the Bengal Jute Industry, 1920 – 1940,’ University of Cambridge PhD (1999).

১৬. Sheikh Mannan, interviewed 30th March 2002.

১৭. Nurul Islam, interviewed 12th June 2001.

১৮. Nurul Islam, interviewed 12th June 2001.

১৯. Shah Lutfur Rahman, interviewed 22nd August 2001.

২০. Shah Lutfur Rahman, interviewed 22nd August 2001.

২১. Shah Lutfur Rahman, interviewed 18th August 2000.

২২. Shah Lutfur Rahman, interviewed 22nd August 2001.

২৩. *East London Express* 8th and 15th January 1971.

২৪. ভাসানী ও তাঁর চীনপন্থী ন্যাপের বড় অংশ শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জন করে এই বলে যে মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের পরে তখনো অনাহারে ছিল।

২৫. 300 seats were directly elected and a further 13 reserved for women, of which the Awami League had 7.

২৬. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998.

২৭. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998 and by the author 30th March 2002.

২৮. Nawab Ali: transcript of interview by Caroline Adams, 1980s p.12.

২৯. John Eade, *The Politics of Community: The Bangladeshi Community in East London* (Aldershot, 1989).

৩০. Lulu Bilquis Banu, interviewed by Caroline Adams, 29th September 1990.

৩১. ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিল তাসাদ্দুক আহমেদ ও ক্যারোলিন অ্যাডামস দ্বারা সাক্ষাৎকারের সময় শেখ মান্নান এই ঘটনা স্মরণ করেন। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন।

৩২. See, for example, the tributes in the Awami League’s *Silver Jubilee Commemorative Volume of Bangladesh Independence* (London, 1997). All cheques had to be signed by Justice Chowdhury.

৩৩. For a discussion of patronage links associated with Bengali patrilineages, see Katy Gardner *Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh* (Oxford, 1995).

৩৪. Sheikh Mannan, interviewed 30th March 2002.

৩৫. Shah Lutfur Rahman, interviewed by the author 22nd August 2001, and Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998.

৩৬. Aziz Choudhury, interviewed 30th January 2001. Habibur Rahman was a NAP leader and a distant cousin of Choudhury’s.

৩৭. Aziz Choudhury, interviewed 20th February 2001.

৩৮. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998. This sum would be worth over £4m today.

৩৯. Ali Syed Goyas, interviewed 14th May 2001 (translated by Abul Kalam Azad).

৪০. Abdul Razzak, interviewed 14th May 2001 (translated by Abul Kalam Azad)

৪১. Alhaj Shams Uddin, interviewed 6th March 2001.

৪২. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams, 19th March 1998 and by the author, 30th March 2002.

৪৩. ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩,৫৬০ জন পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন যারা টাওয়ার হ্যামলেটে বসবাস করে যাদের মধ্যে ৪৭০ জন মহিলা। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৩.০০০ জন পাকিস্তানি পূর্ব বাংলার।

৪৪. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998.

৪৫. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998.

৪৬. অনিবার্যভাবে অনেক বিপথে অর্থ যাওয়ার গল্প রয়েছে—ব্যাংকে গঠিত নয় এমন পৃথক চাঁদা এবং স্থানীয় সম্প্রদায় তাদের চূড়ান্ত হিসাবের সংগ্রহ জমা দেয়নি কিন্তু এগুলো আমাদের গল্পের সীমান্তবর্তী। স্টোনহাউসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ফ্রড স্কোয়ারের মাধ্যমে তদন্ত হয় কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৪৭. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams, 19th March 1998.

৪৮. Sheikh Mannan, interviewed 30th March 2002.

৪৯. Sheikh Mannan, interviewed by Tassaduk Ahmed and Caroline Adams, 1st April 1998.

৫০. Nurul Islam, interviewed 12th June 2001.

৫১. ১৯৮৯ সালে মহিউদ্দিন আহমেদ *বাংলাদেশ অবজারভারে* প্রকাশিত চিঠিতে বলেন: "আমি তাসাদ্দুক ভাই ও শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠতার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। ক্লেরিজ হোটেলে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তাসাদ্দুক ভাই অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের (*সানডে টাইমস*-এর সাংবাদিক) সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। স্পিটালফিল্ডের স্মল বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের পান্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

৫২. Sheikh Mannan, interviewed by Caroline Adams 19th March 1998.

৫৩. Sheikh Mannan, interviewed 30th March 2002.

৫৪. Shukra (1998).

৫৫. Sarah Glynn 'East End Immigrants and the Battle for Housing: a comparative study of political mobilisation in the Jewish and Bengali communities' *Journal of Historical Geography*, 13(3) (2005).

৫৬. John Eade 'Nationalism and the quest for authenticity: the Bangladeshis in Tower Hamlets,' *New Community*, 16(4) (1990) p.496.

৫৭. Peter Shore, interviewed 15th February 2001.

৫৮. See also Shore's message in the *Silver Jubilee Commemorative Volume of Bangladesh Independence* (1997) p.37.

৫৯. The vote at the selection meeting, held 19th January 1986, was Peter Shore 46, Jill Cove 19, James McAllister 11 and Jan Alam 8.

৬০. Eade (1989).

৬১. Bengali Labour councillors, interviewed in 2000.

৬২. Ansar Ahmed Ullah, interviewed 14th November 2000.

৬৩. John Eade, Isabelle Fremeaux and David Garbin 'The political construction of Diasporic Communities in the Global City' in P. Gilbert (ed) *Imagined Londons* (New York, 2002), and Sarah Glynn 'Bengali Muslims: the new East End radicals?' *Ethnic and Racial Studies*, 25(6) (2002) pp.969-988.

৬৪. Ansar Ahmed Ullah, interviewed 14th November 2000.

৬৫. Sunahwar Ali, interviewed 23rd January 2001.



বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রেকর্ড করা হয় ১৯৭০ সালের আগেই...

আবদুল আহাদ

[আবদুল আহাদ (১৯০৮-১৯৯৪) রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক। রাজশাহী শহরে জন্ম হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার ফুকুরহাটি গ্রামে। পিতা আবদুস সামাদ খান ও মাতার নাম রহমতুন্নেসা। পিতা ও মাতামহ খানবাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান দুজনেই তৎকালীন শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। আবদুল আহাদ শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে ওস্তাদ বালি ও ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের নিকট তিনি উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেন। সে সময় তিনি কলকাতা বেতারে সংগীত পরিবেশনের জন্য মনোনীত হন এবং বাংলা ঠুমরি পরিবেশন করেন। ১৯৩৬ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে ঠুমরি ও গজল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সংগীতজগতে তাঁর আসন সুদৃঢ় করেন। ১৯৩৮ সালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। তখনকার দিনে তাঁর এ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসদীপ্ত, কারণ তখন এ দেশের মুসলিম সমাজে সংগীতের তেমন প্রচলন ছিল না। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহাশীষ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে চার বছর অধ্যয়ন শেষে ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতার এইচএমভি (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) কোম্পানিতে সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালনায় পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রখ্যাত শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছেন। আবদুল আহাদের একটি বড় কীর্তি এ দেশে আধুনিক গান ও দেশাত্মবোধক গানের গোড়াপত্তন করা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আবদুল আহাদ ঢাকায় চলে অসেন এবং পরের বছর ঢাকা বেতারকেন্দ্রে সুরকার ও প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেন। সুরকার, প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে ঢাকার সংগীতজগতে আবদুল আহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশভাগের ফলে ঢাকার সংগীতজগতে শিল্পীর যে শূন্যতা দেখা দেয়, আবদুল আহাদ নতুন নতুন শিল্পী সৃষ্টির মাধ্যমে সে শূন্যতা পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রায় দুই যুগ বেতারের 'সংগীত শিক্ষার

আসর' পরিচালনা করেন এবং এর মাধ্যমে বেতারের সংগীতজগৎকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করেন। আবদুল আহাদ সুরকার হিসেবেও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংগীতানুষ্ঠানে সুরকার হিসেবে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। উর্দু গজল ও গীত এবং বাংলাসহ এক হাজারের বেশি গানে তিনি সুরারোপ করেন। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬২ সালে তমঘা-ই-ইমতিয়াজ, ১৯৬৯ সালে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ এবং বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রদান করে। অকৃতদার আবদুল আহাদ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন প্রয়াত ইতিহাসবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ এবং জাতীয় অধ্যাপক মুস্তফা নূরউল ইসলাম। গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বর্ণনা আকারে এ রচনাটি ছাপা হলো।]

আমার জন্ম ১৯০৮ সালে রাজশাহীতে। অবশ্য আমাদের পৈতৃক ভিটা তখনকার বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার ফুকুলহাটি গ্রামে। আমার বাবা শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুল ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আরও ওপরে উঠেছিলেন। আমার নানা ওই শিক্ষা বিভাগেই আরও একটু উঁচু পদে চাকরি করতেন। তিনি ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল ছিলেন।

আমার শৈশবকাল কোথায় কেটেছে, সে কথা অবশ্য খুব ভালো মনে নেই। থাকারও কথা নয়। সম্ভবত রাজশাহীতেই। কারণ, ওখানেই আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তারপর আমার শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের কিছুটা সময় কেটেছে পাবনাতে।

আমি যে পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, সেই পরিবেশটা তখনকার অন্যান্য মুসলিম পরিবার থেকে একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। কারণ, আমার একমাত্র আপন মামা গান-বাজনা করতেন। আমার নানার বাড়িতে একটা অর্গান ছিল। সেটা আমার মামারই। তবে নানা খুব পরহেজগার মানুষ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। বাড়িতে তিনি প্রায়ই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন। গান-বাজনা করার আবহের পাশাপাশি ধর্মীয় যে পরিবেশ, সেটাও সেখানে ছিল।

আমার খালা কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা[১]। তাঁকেও আমি দেখেছি। তার পাশেই ছোটবেলায় আমি ঘুমাতাম। আমার পাশ থেকেই নামাজ পড়তে উঠে যেতেন তিনি। ভোরে কি আসরের সময়। কাজেই ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক—এই দুটো দিকেরই চর্চা আমাদের বাড়িতে পাশাপাশি ভারসাম্য রক্ষা করে চলত।

আমি আগেই বোধ হয় উল্লেখ করেছি যে লেখাপড়ার দিক দিয়ে সেকালে আমাদের পরিবার বেশ এগিয়ে ছিল। আমার নানা যে ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল ছিলেন, তাঁকে ওই পর্যায়ে যেতে নিশ্চয়ই লেখাপড়া করতে হয়েছিল। আব্বা ছিলেন প্রথমে সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুল। পরে তাঁর পদোন্নতি হয়। কাজেই তিনিও

ভালোই শিক্ষিত ছিলেন। কারণ, উচ্চপদে সরকারি চাকরি গ্র্যাজুয়েট না হলে পাওয়া যেত না।

ধর্মীয় শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সেটা আমি বা আমাদের পরিবারের কেউ মক্তব বা মাদ্রাসা থেকে পাইনি। অর্থাৎ মক্তব ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করিনি। তবে মৌলভি সাহেব ছিলেন, তিনি এসে আমাদের আরবি পড়া শেখাতেন।

আসলে আমি আমার শিক্ষাজীবন শুরু করি পাবনা থেকেই। কেননা, বাবার চাকরিসূত্রে জলপাইগুড়িতে যখন ছিলাম, তখন আমি একেবারেই ছেলেমানুষ। তারপরেই পাবনাতে চলে যাই আমি। ওখানেই আমার স্কুলজীবনের শুরু। ওখানে কলেজেও পড়েছিলাম কিছুদিন। মাঝে কিছুদিন আমি কলকাতায় কলেজে পড়েছিলাম। আমি আর্টস তথা মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলাম।

আমি গান-বাজনায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম প্রধানত আমার মামার কারণেই। মামার প্রভাবেই আমি সংগীতের জগতে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আগেই বলেছি, মামা নানার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য তিনি একটা অর্গান কিনেছিলেন। অর্গান বাজিয়ে তিনি ভালোই গান করতেন। পাশাপাশি আমার নানার বাড়িতে প্রচুর গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। দিনরাত আমরা সেগুলো বাজিয়ে শুনতাম। রেকর্ডগুলো ছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়িকা আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালাসহ আরও সব বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার। বেশির ভাগই কাজী নজরুল ইসলামের[২]। প্রথম গান শুনি আমি পাশের একটা হিন্দুবাড়িতে, একটা গজল গান—'বাগিচায় বুলবুলি তুই'। কে. মল্লিকের গাওয়া নজরুলেরই গান। শুনে সে যে কী ভালো লেগেছিল আমার! আজও সে কথা আমি ভুলতে পারিনি।

তবে আনুষ্ঠানিক চর্চার কথা যদি বলা হয়, তা হলে বলতে হবে, আমার বাবার ইচ্ছা ছিল না যে আমি গান-বাজনা করি। তবে মা আমাকে কোনো দিনই বাধা দেননি।

আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন পাবনা শহরে একজন গানের শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁর বাসায় যেতাম। গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুটা গান শেখার চেষ্টা করতাম। তবে আমার বেশির ভাগ গান শেখা গ্রামোফোন রেকর্ড শুনে শুনে। বাড়িতে রেকর্ডের বিশাল সংগ্রহ ছিল। সেগুলো অবসর পেলেই বাজাতাম আর শুনতাম। একই বাড়িতে আমার মামাও সমানতালে গান-বাজনা করতেন।

তখনকার দিনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। দু-একটা পরিবার হয়তো শহরে থাকে। তাদের বাড়িতে গান-বাজনা হচ্ছে—সমাজনেতা বা ধর্মীয় নেতারা এসব কিছুর ব্যাপারে তেমন জোরালোভাবে না হলেও একটুআধটু আপত্তি তো তুলেই ছিলেন। আসলে আমার নানা এতটাই পরহেজগার আর মুসল্লি

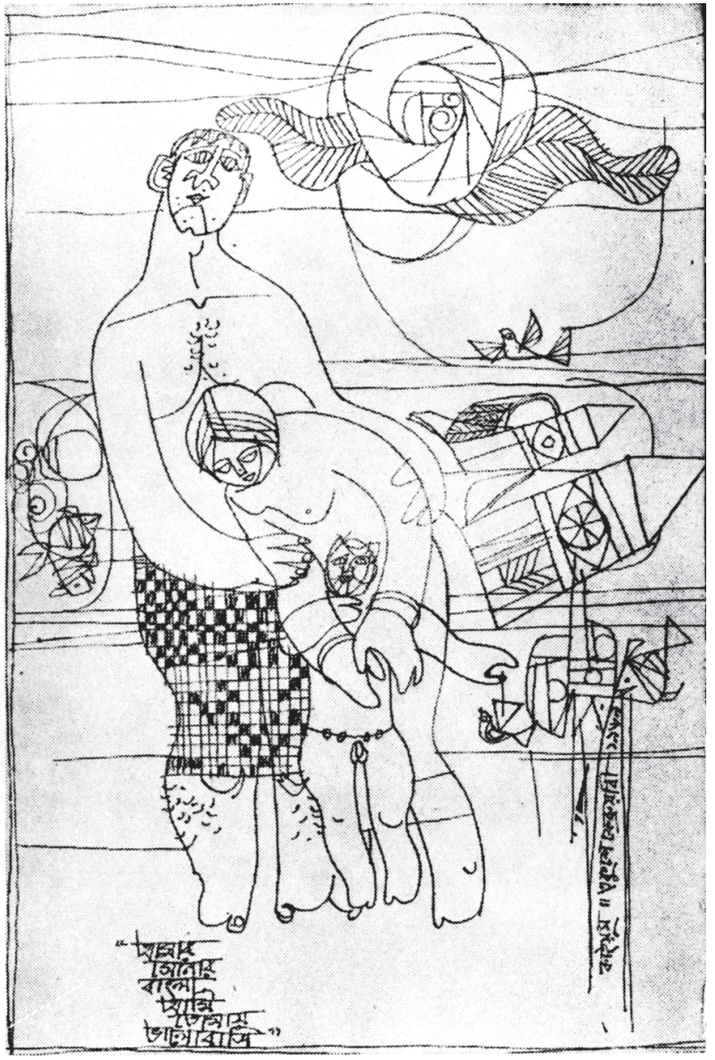

মানুষ ছিলেন যে, তাঁর জন্য তাঁরা মাথা তুলতে সাহস করেননি। তখন পর্যন্ত সংগীতচর্চার ব্যাপারটা মুসলমানরা সামাজিকভাবে গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন আব্বাস ভাই মানে আব্বাসউদ্দীন

আহমদ। তিনিই প্রথম মুসলমান যিনি গান করলেন, রেকর্ড করলেন, বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে তিনি মুসলমান সমাজে গান করলেন।

আগেই বলেছি যথার্থ অর্থে ওস্তাদ রেখে আমার গানের শিক্ষা হয়নি, রেকর্ড শুনে শুনেই সবকিছু শিখেছি। মামা গান করতেন। তাঁর গান শুনে শুনে আমার গানের তালিম পাওয়া। পাবনা শহরে দু-একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। দু-একটা গানও সেসবখানে গেয়েছিলাম। সময়টা ১৯৩৩ সাল। তবে কী গান গেয়েছিলাম সে কথা এখন আর মনে নেই।

বিশের দশকের শেষ দিক থেকে তিরিশের দশকের কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ[৩], বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা[৪], ওস্তাদ খসরু, জসীমউদ্‌দীন[৫]। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার একটু-আধটু জানাশোনা ছিল।

নজরুলকে দিয়েই প্রসঙ্গটা শুরু করি। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমার খালা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাও কবি। নজরুল ইসলাম তখন, যে জায়গাটাকে সিমলা বলা হয়, সেখানকার বিবেকানন্দ রোডের একটা বাড়িতে থাকতেন। মনে আছে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে সন্ধ্যার দিকে তাঁর ওখানে গিয়েছিলাম। একটা রেকাবিতে করে আমাদের কিছু রসগোল্লা আর সন্দেশ খেতে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রথম কাজী নজরুল ইসলামকে দেখলাম। বহুদিনের কথা। খালাই দেখা করতে গিয়েছিলেন আমাকে সঙ্গে করে। আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।

নজরুলকে পরে গ্রামোফোন কোম্পানিতে দেখেছি। কলেজে পড়ার সময়ে আর দেখা হয়নি। পরে যখন গানের লাইনে এলাম, তখন তাঁকে আমি আর পাইনি।

কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। খালার সূত্রেই পরিচয়টা হয়েছিল। তবে আমি তাঁর কাছে খুব বেশি একটা যেতাম না।

এঁদের মধ্যে আমি আব্বাস ভাইয়ের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। জসীমউদ্‌দীন সাহেবের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম। মনে আছে তাঁর কাছ থেকে আমি একটা গানও শিখেছিলাম। 'চলরে ঘাটে কদমতলে'। এই ভাঙা গলায় গাইতেন আর কী! কোনো বাদ্যযন্ত্রও বাজাতেন না। খালি গলায় গান গাইতেন। বরং বলা চলে, এদের মধ্যে ওস্তাদ খসরুর সঙ্গে আমার জানাশোনাটা খুবই ভালো রকমের ছিল। কিন্তু তাঁর ওখানে আমি তেমন একটা যেতাম না।

আব্বাস ভাই সম্পর্কেই বরং আরেকটু কথা বলি। আমি তখন হোস্টেলে থাকি। কলকাতায় কারমাইকেল হোস্টেলে। পড়ি সিটি কলেজে। আব্বাস ভাই থাকতেন বৌবাজারে ওসমানের মেস বলে একটা মেস ছিল, সেখানে। ওটার চারতলায় ওসমানের মেসে মুসলমান কেরানিদের বসবাস ছিল। বলতে গেলে ওটা ছিল বিশেষ করে তাদেরই মেস। বলেছি, আমি তখন কলেজে পড়ি। আর আব্বাস ভাই

তখন ওই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে[৬] কেরানির চাকরি করতেন। চাকরির পাশাপাশি চলছিল সমানতালে তাঁর গান গাওয়ার ব্যাপারস্যাপার।

বিকেল হলে রোজই আমি আব্বাস ভাইয়ের কাছে সেই মেসের কামরায় চলে যেতাম। নানা রকম গল্প-গুজব হতো তাঁর সঙ্গে। কখনো কখনো তিনি আমাকে লক্ষ করে বলতেন, 'চলো, আজকে আমার একটা গানের অনুষ্ঠান আছে।' আমি তাঁর সঙ্গে সেসব অনুষ্ঠানে যেতাম। এভাবেই তখন আমাদের দিন কেটেছে। এ রকম অবস্থায় একদিন আমি আব্বাস ভাইকে বললাম যে, আমি আপনার মতো গান রেকর্ড করতে চাই।

আব্বাস ভাই আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গেলেন কমলদাশ গুপ্তের[৭] ভাই সুবলদাশ গুপ্তের কাছে। তিনিও তখন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রশিক্ষক।

তো আমার খুব পছন্দ হলো না। আমি চেয়েছিলাম আরও বড় কারও কাছে যেতে। সেই থেকে আমি আর গ্রামোফোন কোম্পানিতে যাইনি। পরে অবশ্য আমি নিজের উদ্যোগে গিয়েছি। একটু ঘুরতি পথে। এসবই সেই তিরিশের দশকের কথা।

বাঙালি মুসলমানের সংগীতচর্চা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, একদিকে আমরা যেমন বাধা পেয়েছি নিজের সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। অন্যদিকে কলকাতায় আসার পর আরও ভালোভাবে গান শেখার চেষ্টা করতে গিয়ে, রেকর্ড করার চেষ্টা করতে গিয়েও নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটা ভীষণ বিপদসংকুল পথ আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল তখন।

তবে এসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রমে আব্বাস ভাইকে আমি পাইওনিয়ার বা পথপ্রদর্শক বলব। তিনি গান করলেও তাঁর আধুনিক গান কিন্তু মুসলমান সমাজ গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখন তিনি ইসলামি গান গাইতে শুরু করলেন, তখন সাংঘাতিকভাবে মুসলমান সমাজ তাঁকে গ্রহণ করে বসল। পথ তো তিনিই দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের। কাজেই খুব অসুবিধা তখন হয়নি। অবশ্য আফসারী খানমের বড় বোনকে অন্য নামে রেকর্ড করতে হয়েছিল। রেকর্ডে লেখা হয়েছিল বেবী নাম। বেবীও তখন তার গানের একটা রেকর্ড বের করেছিল।

কেন মুসলমান গায়ক-গায়িকাদের একটু ভিন্ন নাম গ্রহণ করতে হতো, সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, মুসলমান সমাজ তো তখনো জাগেনি। মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ তখন সবে দানা বাঁধছে। তখন পর্যন্ত তাদের গান-বাজনা বা সাংস্কৃতিক দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত ছিল না। কাজেই রেকর্ড যাঁরা কিনতেন তাঁরা হচ্ছেন হিন্দু সম্প্রদায়। তখন যুগটা তো অন্য রকম ছিল।

সেই অন্য রকম যুগের কথা বলতে গেলে বলতে হবে, মুসলমানদের সম্পর্কে তখন রেকর্ড কোম্পানির মধ্যে এ রকমের একটা ভয় ছিল যে, মুসলমানি নাম

দিলে হয়তো রেকর্ড বিক্রি হবে না। কাজেই গায়কের আসল নামটা গোপন করে যাও। কে. মল্লিকের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি হিন্দুও হতে পারেন, মুসলমানও হতে পারেন। তার মানে হিন্দুর গান, মুসলমানের গান—এই রকমের একটা বিভাজন ছিল কি না, এ কথা বলা যাবে না। আসলে মুসলমানের গাওয়া গান হিন্দুরা কিনবে কি না, ব্যবসা চলবে কি না, এ ব্যাপারে রেকর্ড কোম্পানিগুলোর মধ্যে সন্দেহ ছিল। তবে এ ধরনের সন্দেহের কোনো ভিত্তি ছিল কি না, আমি বলতে পারব না। হিন্দু সমাজও তখন আজকের মতো এতটা সংস্কারমুক্ত ছিল না। তারা সংস্কারমুক্ত হয়েছে ধীরে ধীরে।

মনে পড়েছে বেবীর আসল নাম ছিল আশরাফী খানম[৮], আফসারী খানমের বড় বোন। প্রথম মুসলমান মেয়ে হিসেবে প্রথম গানের রেকর্ড করেছিলেন তিনি। একটা রেকর্ডই বেরিয়েছিল তাঁর। আর ওটাই ছিল শেষ। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। সুস্থ আছেন। যে সময়ের কথা বলছি, যতদূর জানি, প্রশিক্ষক হিসেবে ইংরেজের বেনিয়া কোম্পানি জমিরউদ্দিনকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়েছিল। তিনি ওই সময় যেসব উর্দু গান ও হিন্দি গান হতো, সেগুলোর প্রশিক্ষক ছিলেন। বাংলা গানের প্রশিক্ষক হিসেবে তখন মুসলমান কেউ ছিলেন না। নজরুল ইসলামকে অবশ্য আমি প্রশিক্ষক বলব না।

এমনকি নজরুল ইসলামের গানের রেকর্ডেও তখন তাঁর নাম থাকত না। গানের কথাও যে নজরুল ইসলামের, তাও থাকত না। তাঁর কোনো নামই যেত না। অবশ্য একটা চলচ্চিত্রে সুরকার হিসেবে নজরুল ইসলামের নাম দেখেছিলাম। চলচ্চিত্রটার নাম *চৌরঙ্গী*। *ধ্রুব* ছবিতে নজরুল অভিনয় করেছিলেন। টাইটেলে তাঁর নাম ছিল কি না, মনে করতে পারছি না। কেননা, আমি তখন বয়সে বেশ ছোট। একেবারে ছেলেবেলার কথা। আমি আগেই বলেছি আমাদের পরিবারে সংগীত চর্চা হতো। তবে আমি রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় কীভাবে এলাম, সে কথা যদি বলেন, তাহলে আরও দুটো কথা বলতে হবে। তখন উচ্চমাধ্যমিক তথা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিএতে ভর্তি হব হব করছি। বাড়ির সবাই তখন ওয়ালটেয়ারে গিয়েছি বেড়াতে। হঠাৎ কাগজে দেখলাম শান্তিনিকেতন থেকে স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। তো আমি সাত-পাঁচ না ভেবেই একটা দরখাস্ত করে বসলাম।

দিন কয়েকের মধ্যেই দরখাস্তের উত্তরও এসে যায়। আমাকে বলা হয়েছে, তুমি ছাত্র হিসেবে চলে এসো। কারণ, বৃত্তি পাওয়া দরকার। আমি আর অপেক্ষা না করে চলে গেলাম। এর আগে যখন আমি কলেজে পড়তাম, তখন দুবারের মতো অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশানে ঠুমরি এবং গজলে প্রথম হয়েছিলাম। একটা ছিল ভুবন ঘোষের অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন। খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে

অনুষ্ঠিত হতো। আর একটা ছিল নাহার ফ্যামেলির উদ্যোগে। দুটোতেই আমি যোগ দিয়েছিলাম। ও হ্যাঁ, ভজনে বোধ হয় আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম।

এভাবে শান্তিনিকেতনে আমি স্রেফ কৌতূহলবশত দরখাস্ত করেছিলাম। ওই কাগজ-টাগজ দেখে। অবশ্য অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার গান শেখার কোনো পেশাদার প্রশিক্ষক ছিলেন না।

কলকাতায় যখন পড়তাম, যাঁর কাছে আমি গান শিখতাম, তাঁর নাম ছিল মঞ্জু সাহেব। তিনি ধ্রুপদাঙ্গের গান করতেন। ঠুমরিটা খুবই ভালো গাইতেন। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের উত্তর-প্রজন্মের সদস্য। খুবই গরিব ছিলেন। আমি তখন কারমাইকেলে হোস্টেলে থাকি। আমাকে তখন একজন বললেন, অল্প টাকায় একজন আছেন। পানবাগান লেনে থাকেন। চলো তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। এভাবেই আমি ওস্তাদ মঞ্জুর সঙ্গে পরিচিত হই এবং তাঁর কাছেই গান শিখি। তিনিই ছিলেন আমার গানের প্রথম আনুষ্ঠানিক ওস্তাদ। অবশ্য তার আগে আমি তো গান বেশ ভালোই শিখে ফেলেছিলাম। বলতে গেলে একেবারে নিজের চেষ্টাতেই।

রবীন্দ্রসংগীতের দিকে যাওয়া প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, ওয়ালটেয়ার থেকে দরখাস্ত করার আগে রবীন্দ্রসংগীতই যে শিখব, এ ধরনের কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। মোটেই ছিল না। কারণ, আমি তো তখন ঠুমরি গাইতাম। ঠুমরি গেয়ে আমি প্রথম হয়েছি। অতএব আকর্ষণটা আমার ক্লাসিক্যাল সংগীতের ব্যাপারেই ছিল বেশি। আগেই বলেছি, আসলে শান্তিনিকেতনের[৯] রবীন্দ্রসংগীত শেখার ব্যাপারে দরখাস্ত করেছিলাম একেবারেই ঝোঁকের বশে।

আমার নাম না শুনলেও ভর্তি করার আগে তারা আমার উপযুক্ততা বিচার করল ওই যে আমি দরখাস্তে উল্লেখ করেছিলাম যে আমি ঠুমরি গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম, সেই কথাটা। ওখানে আমি মোট চার বছর ছিলাম। মানে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চার বছর।

আসলে শান্তিনিকেতনে যে পরিবেশে গিয়ে পড়েছিলাম, সেটা দেখে আমি খুবই অবিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আজকের শান্তিনিকেতন আর সেই শান্তিনিকেতন নেই। সেই শান্তিনিকেতন এখন অনেক দালান-কোঠা-বাড়ির ভিড়ে রীতিমতো হারিয়ে গেছে। তার শান্ত পরিবেশ আমরা মনের মধ্যে এখনো দাগ কেটে রয়েছে। এবং শিক্ষক ছাত্র সবকিছু মিলিয়ে মনে হতো আমরা যেন একটা একান্নবর্তী পরিবার। এখন আর ও ব্যাপারটা আশাও করা যায় না।

শিক্ষকদের মধ্যে এখনো বহাল তবিয়তে আছেন শৈলজানন্দ মজুমদার আর শান্তিদেব ঘোষ। আমাদের আসল গুরু ছিলেন শৈলজা বাবুই। তখন তিনি ছিলেন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। সংগীত ভবনের সঙ্গে তখনো তিনি যুক্ত হননি। তবে

তাঁর কাছে গিয়ে আমি গান শিখতাম। কারণ, কণিকাকে, তিনি তাঁর নিজের হাতে গড়েছেন বলে তাঁর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল।

আমার সঙ্গে গান শিখত একটা মুসলমান ছেলে। তার নাম কালু। অন্ধ সে। ওখানকারই। মারাও গেছে। আর শিখত রাজেশ্বরী দত্ত, পরবর্তীকালে অনেক নাম করেছিল সে। তার নাম তখন ছিল রাজেশ্বরী বাসুদেব। পরবর্তীকালে সে 'পরিচয়' সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের[১০] স্ত্রী হয়ে হয় রাজেশ্বরী দত্ত। আমাদের দুজনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে তুই-তোকারি সম্বোধন করতাম। সেও মারা গেছে। তবে পাঞ্জাবি মেয়ে হয়ে সে রবীন্দ্রসংগীত শিখল কী করে, সে সম্পর্কে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারব না। আর ছিল খুবই নামকরা একজন। তবে নাচে। সে দক্ষিণ ভারতীয়। নাম সুনালিনী স্বামীনাথম। তার মা তখনকার দিনে সংসদ সদস্যা ছিলেন। আর কণিকা তখন স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত। আমি শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। রাজেশ্বরী ছিল আমার ক্লাসফ্রেন্ড।

শান্তিনিকেতনে ছেলে বা মেয়ে, হিন্দু বা মুসলমানে কোনো রকম বিভাজন ছিল না। এ রকমের কোনো কিছু অন্তত আমি অনুভব করিনি। অবশ্য কারও মনে কিছু থাকলে, থাকতেও পারে। টের পাওয়া মুশকিল ছিল।

বিএ-এমএ না পড়ে গান শিখতে গেলাম, এটা আমার বাবা-মা কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, বাবা তো চানইনি যে আমি গান-বাজনা শিখি। তাঁদের কাছে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কেননা, আমি ছিলাম মা-বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল আমি আরও লেখাপড়া করে সরকারি চাকরি করব। আমার গানের জগতে থাকাটা মায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। মা যখন দেখলেন যে, এদিকেই আমার ঝোঁক বেশি, তিনি আর বাধা দেননি। বরং তিনি শান্তিনিকেতনে গান শেখার ব্যাপারে আমাকে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন।

কণ্ঠশিল্পী বা শিক্ষক হিসেবে আমার নাম ছড়িয়েছিল চল্লিশের দশকে নয়, তার কিছুটা আগেভাগেই। কলকাতায় গিয়ে ওই যে আমি প্রতিযোগিতাগুলোতে ঠুমরি ও গজল ইত্যাদি গেয়ে প্রথম হয়েছিলাম, তখন থেকেই মুসলমান সমাজে আমার নাম কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'মোহাম্মদী'তে[১১] আমার ছবিসহ একটা ফিচার বের হয়েছিল। দৈনিক 'আজাদ'[১২]-এও 'প্রথম মুসলমান ছেলে নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে'— আমার সম্পর্কে এই রকমের প্রশংসা করে খবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এসব কিছুই ঘটেছিল আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগেই।

আর একটা কথা, ওই চল্লিশের দশকেই কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আন্দোলন আর রবীন্দ্রসংগীত—এ দুটো ঠিক

একসঙ্গে চলে না। আমি সে সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দেখেছি, পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে মুসলমানদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার ব্যাপারটা অন্যদের মধ্যে প্রশ্ন তুললেও, আমি ছিলাম ঠিক এসব কিছুর একেবারেই বাইরে।

কলকাতায় থাকতে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ফতেহ লোহানী[১৩], জয়নুল আবেদিন[১৪] ও কামরুল হাসানের[১৫] সঙ্গে।

আমি তখন পার্ক সার্কাসে থাকি। একটা মেসে। আমি আর সালেক, সম্পর্কে সে আমার জামাই হয় এবং বটু বলে একটা ছেলে মিলেমিশে সেই মেসে থাকতাম।

কাসেম সাহেবের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, ভারতভাগের পরিণামে বাংলাভাগ হলেও তিনি কলকাতাতেই থেকে যান। কমিউনিস্ট পার্টি করতেন এবং এখনো ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন। সালেকের ডাকনাম ছিল গুনু। বটু নামে আর একটা ছেলে ছিল আগেই বলেছি। আমরা এই তিনজন একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তাকে মেসে পরিণত করেছিলাম।

ওই মেসে তখন থাকতেন ফতেহ লোহানীর ভগ্নিপতি ডাক্তার খান সাহেব। উনি একদিন এসে আমাকে তাঁদের বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। যাওয়ার পর ওখানেই ফতেহ লোহানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে ফতেহ লোহানী অবশ্য আমাকে চুনীদা বলে ডাকত। এমন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম যে একদম আত্মীয়ের মতো। ফতেহ লোহানীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন সে আসলে কিছুই করত না। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা করত। পাশাপাশি ছবি-টবিতে ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার জন্য এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করে বেড়াত। কখনো নাটক-টাটকও করত।

তখনো সে পুরোপুরি অভিনেতা হতে পারেনি। তারপর ওবায়েদ-উল হক সাহেব একটা ছবি তৈরি করলেন। নাম 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'। ওতে অবশ্য সে একটা বড় রোল পেয়েছিল। ছবিটা মুক্তিও পেয়েছিল। ওটার সংগীত পরিচালক ছিলাম আমি। ওটাই বাঙালি মুসলমানের তৈরি প্রথম ছবি। কলকাতায় মহাদাঙ্গা হয় যে বছর অর্থাৎ ছিচল্লিশের কিছু আগে ছবিটার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল। দাঙ্গার কারণে অবশ্য শুটিং করতে গিয়ে অসম্ভব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল ওই দাঙ্গার পরপরই। শান্তিপূর্ণ সময়ে মুক্তি দিতে পারলে হয়তো আরও ভালো হতো।

বাংলাদেশে ছবিটার প্রিন্ট আছে কি না, সে কথা আমি ঠিক করে বলতে পারব না। ছবিটার টাইটেলে কারও আসল নাম ছিল না। একমাত্র আমি ছাড়া আর কারোরই আসল নাম ছিল না।

নায়ক তো হিন্দুই ছিলেন। নামকরা। এই মুহূর্তে অবশ্য তার নামটা ঠিকমতো মনে করতে পারছি না।

ফতেহ লোহানী এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন পার্শ্বচরিত্রে। মূল নায়কের চরিত্রে নয়। গল্পটা ওবায়েদ-উল হক সাহেবের নিজেরই লেখা ছিল। যিনি এই ছবিটা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর নাম যায়নি। নাম গিয়েছিল কিন্তু অন্য একজনের। তাঁর নাম ছিল হিমাদ্রি চৌধুরী। একমাত্র আমার নাম ছাড়া সবাইকে নাম গোপন করতে হয়েছিল। আর ফতেহ লোহানীর নাম রাখা হয়েছিল বোধ হয় কিরণমল্লিক। আগে থেকেই পরিচিতি থাকায়, টাইটেলে আমার আসল নামই গিয়েছিল। এ ছবির অর্থের জোগানদাতা ছিলেন ওবায়েদ-উল হক সাহেব নিজেই।

শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে আমার কর্মক্ষেত্র হয়েছিল কলকাতা। কলকাতার এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমি সংগীত প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর আমি রবীন্দ্রসংগীত শেখাতাম এবং শেখানো গানগুলো রেকর্ড করতে সাহায্য করতাম। বলতে ভুলেই গিয়েছি যে, শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়েই আমি প্রথমে বোম্বে গিয়েছিলাম। সেখানে মোটমাট এক বছর ছিলাম। আমি ফিল্মের সংগীত পরিচালক হব বলেই বোম্বেতে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় হয়েছিল সিনেমা পরিচালক মেহবুব সাহেবের সঙ্গে। পরিচয় হয়েছিল তখনকার বিখ্যাত গায়িকা বেগম আখতারের সঙ্গে। পরিচয় হয়েছিল অনিল বিশ্বাসের সঙ্গেও। শেষের জনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

শুনলে আপনারা হাসবেন, বোম্বেতে একটা চলচ্চিত্রে আমি অভিনয়ও করেছিলাম। কলকাতার ফণী মজুমদার তখন বোম্বেতে একটা ছবি করছিলেন। আমি তখন রীতিমতো বেকার। তো আমাকে ফণী মজুমদার বললেন, 'তুমি একটা ছোটখাটো রোল করবে কি ছবিতে?' আমি বললাম, হ্যাঁ, করব না কেন? একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম সেই ছবিতে।

তো বোম্বেতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা সহজে হওয়ার ছিল না। বড় কঠিন জায়গা ওটা। আসলে আমার ভুল হয়েছিল। প্রথমে বোম্বে না গিয়ে কলকাতাতেই আসা উচিত ছিল। উচিত ছিল পরে বোম্বে যাওয়া। সংগীত পরিচালনায় ঢুকতে গেলে অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। কলকাতা থেকে আরও হাত পাকিয়ে তবেই আমার বোম্বে যাওয়া উচিত ছিল। ছ্যাঁকা খাওয়ার পর সেটা উপলব্ধি করলাম। এসব কিছু সত্ত্বেও বোম্বেতে ছিলাম এক বছর। এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। আসলে মানুষের জীবনে সবকিছু ঠিকঠাকমতো ঘটে না। যাতেই সে হাত দেয়, তার সবকিছুই সোনা ফলায় না। তো আমার জীবনেও সেই রকম একটা সময় ছিল বোম্বাইয়ের জীবন। বুঝতে

পারছিলাম যে এখানে কিছু হবে না। কারণ, এর আগে এক জায়গায় নয়, আরও কয়েকটা জায়গায় ঢুঁ মেরে, চেষ্টা-চরিত্র করে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তারপর সেখান থেকে সোজা কলকাতায় চলে এলাম।

কলকাতায় আসার পর আমার বিশেষ বন্ধু সন্তোষ সেনগুপ্ত, গায়ক, তার সঙ্গেই আমি প্রথম দেখা করি। ও-ই আমাকে সঙ্গে করে এইচএমভিতে নিয়ে যায়। এইচএমভির যিনি প্রতিনিধি, নাম হেম সোম, আমার গান শুনলেন। গান শোনার পর বললেন, তুমি এখানকার শিল্পী তো হলেই, পাশাপাশি তুমি প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রশিক্ষক। পরে অবশ্য অন্য গানও করেছি। নিজের সুর দেওয়া গানও গাইয়েছি। তো আমাকে হেম সোম বললেন যে, কাকে নিয়ে প্রথম গান রেকর্ড করানো যায়? সুধা ব্যানার্জি বলে একটি মেয়ে ছিল। খুবই ভালো গান করত। তাকেই প্রথম আমি দুটো রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়ে দিলাম। 'গহন রাতের শ্রাবণ ধারা' এবং আরও একটি গান। এখন আর শেষের গানটির চরণগুলোর কথা মনে পড়ছে না।

তারপর থেকে তো একের পর এক আমি আরম্ভ করি গান রেকর্ড করার কাজ। সন্তোষ সেনগুপ্তকে দিয়ে আমি অনেক গান করিয়েছি। সে সময় যেসব রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা হয়েছে, তার সবই আমার পরিচালনায়। এ ছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে[১৬] দিয়ে 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' ও 'হে নিরুপমা'—এই দুটি গান প্রথম করাই আমার পরিচালনায়। আমি এইচএমভিতে যোগ দেওয়ার আগেভাগে কী কারণে যেন পংকজ বাবুর সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির একটা ঝগড়া হয়েছিল। ফলে অভিমান করে তিনি বলেছিলেন, আর আমি রেকর্ডই করব না। তাই আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধি হেম সোম একদিন বললেন, আজ তোমাকে আমি পংকজ বাবুর কাছে নিয়ে যাব। তাঁকে দিয়ে স্টুডিওতে গান রেকর্ড করাতেই হবে। এটা আমার জীবনের খুবই স্মরণীয় একটা ঘটনা। আমার তখন কতই-বা বয়স! আর পংকজ বাবুর তখন ভারত জোড়া নামডাক। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, পংকজ দা আপনাকে গান শেখানোর দুঃসাহস আমার নেই। আপনি গাইবেন, আপনার পাশে আমি শুধু বসে থাকব। আমার কথা শুনে তিনি ভয়ানক খুশি হলেন। পরে বললেন, ঠিক আছে, আপনি রোজ তিনটের সময় এখানে চলে আসবেন। চলচ্চিত্রের রিহার্সাল শেষ করে আপনাকে নিয়ে আমি বসব। তো এভাবে প্রায় এক মাসে দুটি গান আমার জন্য গাইলেন তিনি। একটি 'যখন গহন রাত্রি' আর অন্যটি 'তুমি কি কেবলি ছবি'। এই দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন তিনি। এবং আক্ষরিক অর্থে যাকে বলা হয় একেবারে হাতে-কলমেই তিনি আমার কাছে গান দুটির তালিম নিয়েছিলেন। উনি জানতেন গানগুলো। তবুও বললেন, না, আপনি যেমন করে গান করেন, ওভাবেই আমি গাইব। আশ্চর্য,

আমাকে তো তিনি তোয়াক্কা না করলেও পারতেন। তখন তো আমার কোনো পরিচয়ই নেই বলতে গেলে। খুব অবাক হয়েছিলাম এত বড় গায়ক, সংগীতজ্ঞ, ভারত জোড়া যাঁর নামডাক, আমার প্রশিক্ষণে গান করতে কোনো ধরনের দ্বিধাবোধ করেননি। শুধু তাই নয়, মাস খানেক পরে দেখেছি, সেই সাড়ে ছয় ফুট লম্বা মানুষটি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমি বলি, এটা কী করছেন?

উনি বললেন, কিছু না।

দেখলাম, বেশ কিছু টাকা তিনি আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললাম, এগুলো কেন?

বললেন, গ্রামোফোন কোম্পানির ওসব সম্মানি-টম্মানির কথা বাদ দিন। আপনি যে রোজ কষ্ট করে এখানে আসেন, তার একটা দাম আছে না?

এই রকমের মানুষ ছিলেন পংকজ মল্লিক[১৭]।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে যে অবস্থাটা দেখেছিলাম, এবার সে সম্পর্কে একটু কথা না বললেই নয়।

ঢাকায় গানের চর্চার তেমন কিছু ছিল না। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে একমাত্র লায়লা আর্জুমান্দ বানু[১৮] আর তার বোন মালেকা ছাড়া গান গাওয়ার মতো তৃতীয় আর কেউ ছিল না। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এলেন মোমতাজ আলী, আলী মুর্শিদ এরা। এ সময় আমি ভাবলাম যে, এভাবে তো চলতে পারে না। কিছু শিল্পী তো তৈরি করতেই হবে। শাহজাহান হাফিজকে তৈরি করেছিলাম আমি। খুবই ভালো কণ্ঠ ছিল তার। যদিও ডাক্তার হবার পর অবশ্য সে গান করা ছেড়ে দিয়েছিল। সুলতান বলে আর একটি ছেলেকে তৈরি করেছিলাম। এখন সে বিদেশে। এই দুজন মুসলমান ছেলের খুবই ভালো কণ্ঠ ছিল। আর আফসারী খানমের কণ্ঠ অপূর্ব হলেও গানের ব্যাকরণের কিছুই জানত না। ওকে শেখালাম। বলতে গেলে আফসারী খানম, হুসনা বানু খানম এবং লায়লা—এই তিনজন মুসলমান মেয়েই ছিল ঢাকার প্রথম দিককার মুসলমান নারী শিল্পী। আর কিছু হিন্দু শিল্পী ওপারে না গিয়ে এখানেই থেকে গিয়েছিল। তাদের দুয়েকজন অবশ্য পরে চলে যায়। ইভারাণী বলে একজন ছিল। আরও কে কে যেন ছিল, তাদের নাম মনে পড়ছে না। প্রধান কণ্ঠের অধিকারী ছিল তখন বিমল বলে একটি ছেলে। ওকেই একমাত্র দেখতাম। আর তো বাংলা গান গাইবার মতো তেমন কেউ ছিল না। পরে অবশ্য শাহজাহান হাফিজ ও সুলতানরা এলো। এরা সবাই রবীন্দ্রসংগীতই গাইত। আর সবাই গাইত পল্লীগীতি। পল্লীগীতির মঞ্চটা তারাই দখল করে বসল, যারা মূলত কলকাতা থেকে এসেছিল। যেমন মোমতাজ আলী খান। আলী মুর্শিদ তাঁর পরে আসে। সোহরাবও এসেছিল। বেদারউদ্দীন

গাইত, আবদুল লতিফ[১৯] গাইত। এদের সবাই এসেছিল কলকাতা থেকেই। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জায়গাটা তখন তো ফাঁকাই ছিল। যারা কলকাতা থেকে এসেছিল, তাদেরকে আমি এখানকার শিল্পী বলতে নারাজ। আমিও কলকাতা থেকে এসেছিলাম।

ঢাকা বেতার মূলত ছিল হিন্দু শিল্পীনির্ভর। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে সবাই ওপারে অর্থাৎ এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। কাজেই কলকাতার যেসব মুসলমান শিল্পী কিছুটা গান-বাজনা করতেন, তারা এসেই জাঁকিয়ে বসলেন এখানকার বেতার কেন্দ্রে। তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি ধর্মীয় গানের জোয়ার প্রবল হবে সেটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। ওই সময় পাকিস্তানের ভাবাদর্শ অনুসারী ধর্মীয় গান আমাকেও কিছুটা করতে হয়েছিল। কারণ, রেডিওতে কাজ করতে গেলে সবকিছু একেবারে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ওটা ছিল চাকরিরই অংশ।

প্রথম দিকে অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় তেমন একটা বাধা দেওয়া হয়নি। শামসুল হুদা তখন পিপি ছিলেন। আরও কয়েকজন অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। তারা ছিলেন শান্তিনিকেতনেরই। বেতারে রবীন্দ্রসংগীতচর্চায় যাতে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি না হয়, তারা সেই চেষ্টা করেছেন। বাধাগ্রস্ত করার ব্যাপারে কোনো ধরনের সরকারি নীতি কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত যে করা হতো, তাও নয়।

প্রথম দিকে তো আমিই হাল ধরি। আমার আগে কী হতো, জানি না। তবে আমি যখন এলাম, এসে দেখলাম যে একমাত্র লায়লা আর্জুমান্দ বানুদের পরিবারটাই গান-টানের চর্চা-টর্চা করে থাকে। তো সে তখন গজল খুবই ভালো গাইত। নজরুলের গানও গাইত। কলকাতায় থাকার সময় তাকে দিয়ে একবার রবীন্দ্রসংগীত আমি করিয়েছিলাম। প্রচারিত হয়েছিল অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে। তখন ঢাকা বেতারে প্রভাত মুখার্জি বলে একজন অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। তাদের পিপি বলা হতো। কাউকে কাউকে বলা হতো পিএ অর্থাৎ প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট। সে আমাকে শান্তিনিকেতন থেকে বুক করে নিয়ে এসেছিল। লায়লাকে নিয়ে আমি তখন একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম। সুন্দর একটা প্রোগ্রাম ছিল সেটা।

১৯৪৩ সালে কলকাতা থেকে আমি এখানে চলে এসেছিলাম। এখানে আসার পর আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি একটি সংগীত বিচিত্রা করুন। তখন লায়লাকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর একটা সংগীত বিচিত্রা করেছিলাম। লায়লা এবং আরও কে কে জানি ছিল সেই অনুষ্ঠানে, এখন আর তাদের নামধাম মনে নেই। ঘটনাটা পাকিস্তান হওয়ার বছর চারেক আগেকার।

এই অঞ্চলে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা কেবল বেতারকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল তার বাইরেও। গোড়ার দিকে যাঁরা ছিলেন, সে কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পাকিস্তানের সূচনায় রবীন্দ্রসংগীতচর্চা তেমন ছিল বলে তো আমার মনে হয় না।

চর্চাটা আসলে শুরু হয় আমি ঢাকায় আসার পর থেকেই। বেতারের বাইরে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা দু-একটা পরিবার ছাড়া আর কোথাও ছিল বলে তো আমার মনে হয় না। কারণ, মুসলমান সমাজে তখন গান-বাজনা প্রায় হারামতুল্য ব্যাপার। সবে পাকিস্তান হয়েছে। মুসলমানরা তো এমনিতেই গান গাইত না। এখানে এক লায়লা আর্জুমান্দ বানুদের পরিবারটা ছিল। কলকাতা থেকে এলেন হুসনা বানু খানম। মুসলমান শিল্পীদের আস্তে আস্তে তৈরি করতে হয়েছিল।

আমরা এখানে আসার পর রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাটা কীভাবে শুরু করলাম, এবার সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। আমার কলকাতা থেকে আসার পর বেতারকে কেন্দ্র করেই মূলত গানের চর্চাটা আরম্ভ হয়েছিল। যেমন আফসারী খানমকে প্রথম যেদিন দেখি, তার গান শুনি, মনে হলো, মেয়েটির বেশ সুন্দর গলা তো! আমি নিজেই যেচে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে গান শেখাতে শুরু করলাম। আগে কোনো পরিবারে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা হতো না। আগে লায়লা ও মালেকা দুজনেই রবীন্দ্রসংগীত গাইত। আর সন্‌জীদাদের পরিবারটি তখনো বেতারে আসেনি। তারা এসেছিল একটু পরে। সে সময় তারা কেবল বাড়িতে বসেই চর্চা করত। এই তো একদিকে লায়লা আর্জুমান্দদের পরিবার আর অন্যদিকে মোতাহার হোসেন সাহেবের পরিবার। আর আফসারী খানম তো ছিল একেবারে একা, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর রবীন্দ্রসংগীতের এই চর্চা প্রসার লাভ করতে শুরু করে। অবশ্য ভাষা আন্দোলনের ঠিক একটু আগেভাগে এর প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন তাতে আরও একটু গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, সে কথা আমাকে বলতেই হবে। আমার মনে পড়ে ১৯৬১ সালে যখন সব ধরনের সরকারি বাধা উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হলো, ওটার পর থেকেই তো রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাটা আরও বাড়তে শুরু করল। আর প্রতিষ্ঠান বলতে তখন বুলবুল একাডেমী ছিল। তার কিছুদিন পর ছায়ানট গড়ে উঠল। যেটা গড়ে তুলেছিল সন্‌জীদারা মিলে। এই দুটো প্রতিষ্ঠানেই রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা হতো। অবশ্য ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা সামান্য ধাক্কা খেলেও তার প্রবাহকে রোধ করা যায়নি। বরং এ কথা বলাটাই বোধ হয় যুক্তিসংগত হবে যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা থেকে শেষ পর্যন্ত যে গণআন্দোলনের শুরু হয়, তার পরিণতিতেই রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপকভাবে গাওয়ার ধারাটির সূচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তো গণআন্দোলন হতে পারে না। যেমন নজরুলকে বাদ দিয়ে তা হয় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েও হয় না। তখন মূলত গাওয়া হতো রবীন্দ্র-নজরুলের ওই সব উদ্দীপনামূলক গানই। যেমন নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'শিকল পরা ছল', 'দুর্গমগিরি' আর রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' ইত্যাদি গান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার একেবারে অব্যবহিত পরেই জাতীয় সংগীতের জন্য রবীন্দ্রসংগীত খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা কিন্তু আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল। আমরা রেকর্ড করে তা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭০ সালের একটু আগেভাগেই।।

তথ্যসূত্র

১. **মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা**

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, (১৯০৬-১৯৭৭) সাহিত্যিক। বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। জন্ম পাবনায়, ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর। পিতা খানবাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান ছিলেন একজন বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক এবং মা সৈয়দা রাহাতুননেসা খাতুন ছিলেন সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি অনুরাগী। বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জাগরণে নারীর অবস্থান যাঁরা নিশ্চিত করেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হলেও সৃজনশীল মন ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনন দিয়ে তিনি স্বকালের স্বসমাজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাহমুদা খাতুনের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তিনটি: *পশ্যারিণী* (১৩৩৮), *মন ও মৃত্তিকা* (১৯৬০) এবং *অরণ্যের সুর* (১৯৬৩)। ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার একুশে পদকে ভূষিত করে। ১৯৭৭ সালের ২ মে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২. **কাজী নজরুল ইসলাম**

কাজী নজরুল ইসলাম, (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই 'ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতা'র সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা নিষিদ্ধ করে এবং তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী* (*সওগাত*, মে ১৯১৯) নামক প্রথম গদ্য রচনা, প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই ১৯১৯) এবং অন্যান্য রচনা: গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে'; কবিতা 'আশায়', 'কবিতা সমাধি' প্রভৃতি। ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে কবিকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'একুশে পদকে' ভূষিত করে। ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।

৩. **আব্বাসউদ্দীন আহমদ**

আব্বাসউদ্দীন আহমদ, (১৯০১-১৯৫৯) কণ্ঠশিল্পী। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা জাফর আলী আহমদ ছিলেন তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতের উকিল। বলরামপুর স্কুলে আব্বাসউদ্দীনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। তুফানগঞ্জ স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা (১৯১৯) এবং কোচবিহার কলেজ থেকে আইএ (১৯২১) পাস করেন। তখন থেকেই তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে গানের জগতে নিমগ্ন হন। আব্বাসউদ্দীনের প্রধান পরিচয় একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই। তিনি আধুনিক গান, স্বদেশি গান, ইসলামি গান, পল্লিগীতি, উর্দু গান—সবই গেয়েছেন, কিন্তু পল্লিগীতিতেই তাঁর মৌলিকতা ও সাফল্য সবচেয়ে বেশি। কোনো ওস্তাদের নিকট কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালিম নিয়ে তিনি গান শেখেননি। তিনি প্রথমে ছিলেন পল্লিগাঁয়ের একজন গায়ক। কলকাতায় অল্প সময়ের জন্য তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর নিকট উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেন। রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়া-ক্ষীরোল-চটকা গেয়ে আব্বাসউদ্দীন প্রথমে সুনাম অর্জন করেন। পরে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদী, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালাগান ইত্যাদি পল্লিগানের নানা শাখার গান গেয়ে ও রেকর্ড করে তিনি জনপ্রিয় হন। তাঁর দরদভরা সুরেলা কণ্ঠে পল্লিগানের সুর যেভাবে ফুটে উঠত, অন্য কোনো গায়কের কণ্ঠে তেমনটি হতো না। এ ক্ষেত্রে তিনি আজও অদ্বিতীয়। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের ইসলামি ভাবধারায় রচিত গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন। আব্বাসউদ্দীনের গানের রেকর্ডগুলো এক অমর কীর্তি। *আমার শিল্পীজীবনের কথা* (১৯৬০) তাঁর রচিত একমাত্র গ্রন্থ। তিনি সংগীতে অবদানের জন্য মরণোত্তর প্রাইড অব পারফরম্যান্স (১৯৬০), শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৯) এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (১৯৮১) ভূষিত হন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৪. **গোলাম মোস্তফা**

গোলাম মোস্তফা, (১৮৯৭-১৯৬৪) কবি ও লেখক। যশোর (বর্তমান ঝিনাইদহ) জেলার শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গোলাম রব্বানী এবং পিতামহ কাজী গোলাম সরোয়ার দুজনেই ছিলেন লোককবি। গোলাম মোস্তফা ১৯১৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯২২ সালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি পাস করেন। এর আগে ১৯২০ সালে তিনি ব্যারাকপুর সরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৪৯ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯৫২ সালের

ভাষা আন্দোলনের সময় উর্দুর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ সরকারের ভাষা সংস্কার কমিটির সচিব হিসেবে তিনি কাজ করেন। তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান দক্ষ ছিলেন, তবে কবি হিসেবেই তাঁর মুখ্য পরিচয় ছিল। *রক্তরাগ* (১৯২৪), *খোশরোজ* (১৯২৯), *কাব্য-কাহিনী* (১৯৩২), *সাহারা* (১৯৩৬), *হাস্নাহেনা* (১৯৩৮), *বুলবুলিস্তান* (১৯৪৯), *তারানা-ই-পাকিস্তান* (১৯৫৬), *বনিআদম* (১৯৫৮), *গীতিসঞ্চালন* (১৯৬৮) ইত্যাদি তাঁর মৌলিক কাব্য এবং *মুসাদ্দাস-ই-হালী* (১৯৪১), *কালামে ইকবাল* (১৯৫৭), *শিকওয়া* ও *জওয়াব-ই-শিকওয়া* (১৯৬০) অনুবাদকাব্য। তিনি আল কোরআনও (১৯৫৮) অনুবাদ করেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে *বিশ্বনবী* (১৯৪২), *ইসলাম ও কমিউনিজম* (১৯৪৬), *ইসলাম ও জেহাদ* (১৯৪৭), *আমার চিন্তাধারা* (১৯৫২), তাঁর নিজের সুরারোপিত কয়েকটি গানের রেকর্ডও পাওয়া যায়। তার মধ্যে আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে গাওয়া রেকর্ডও রয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যশোর সংঘ কর্তৃক 'কাব্য সুধাকর' (১৯৫২) এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (১৯৬০) উপাধি লাভ করেন।

৫. জসীমউদ্‌দীন

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) কবি, শিক্ষাবিদ। ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। পিতা আনসারউদ্‌দীন মোল্লা ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। শৈশবে ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলে জসীমউদ্‌দীনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। তারপর ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২১), রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ (১৯২৪) ও বিএ (১৯২৯) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি এমএ (১৯৩১) পাস করেন। জসীমউদ্‌দীনের কর্মজীবন শুরু হয় পল্লিসাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবে। জসীমউদ্‌দীনের কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটে ছাত্রজীবনেই। জসীমউদ্‌দীন সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করেছেন, যেমন গাথাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, স্মৃতিকথা, শিশুসাহিত্য, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাখালী* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো হলো : *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯), *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৩), *রঙ্গিলা নায়ের মাঝি* (১৯৩৫), *মাটির কান্না* (১৯৫১), *সুচয়নী* (১৯৬১), *পদ্মা নদীর দেশে* (১৯৬৯), *ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে* (১৯৭২), *পদ্মাপার* (১৯৫০), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *পল্লীবধূ* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া* (১৯৫৯), *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* (১৯৬১), *জার্মানীর শহরে বন্দরে* (১৯৭৫), *স্মরণের সরণী বাহি* (১৯৭৮), *বাঙ্গালীর হাসির গল্প*, *ডালিম কুমার* ইত্যাদি। তাঁর রচিত *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* (দুই খণ্ড, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) ও *বোবা কাহিনী* (১৯৬৪) উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। বাংলাদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না ও জীবনসংগ্রামের কাহিনিই তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। তাঁর কবিতায় দেশের মাটির সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে। এ জন্য 'পল্লীকবি' হিসেবে তাঁর বিশেষ ও স্বতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে। জসীমউদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যের একজন বিশেষ সম্মানিত ও বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত কবি। তিনি প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরম্যান্স পুরস্কার (১৯৫৮), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি (১৯৬৯), বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (১৯৭৬) ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (মরণোত্তর, ১৯৭৮) ভূষিত হন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ তিনি ঢাকায় মারা যান।

৬. রাইটার্স বিল্ডিং

রাইটার্স বিল্ডিং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয় ভবন এবং বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি দপ্তর। ১৭০২ সালে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘকাল একই নামেই এ ভবনটি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৭৭৬ সালে বাংলায় ব্রিটিশদের প্রকৃত শাসন শুরু হলে কোম্পানির করণিক বা রাইটারদের কাজ বহুবিধ হয়ে যায়। ফলে তাদের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করতে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস একটি নতুন কাঠামো নির্ধারণ করেন। সে সময় থেকেই এ ভবন রাইটার্স বিল্ডিং নামে পরিচিত হয়। তবে, ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ ভবন কোম্পানির করণিকদের আবাসিক ভবনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ভবনের একাংশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যক্রম শুরু হলে রাইটারদের বাসস্থান স্থানান্তর করা হয়। এরপর রাইটার্স বিল্ডিং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সচিবালয়ে পরিণত হয় এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে ভবনও পরিসরে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. কমল দাশগুপ্ত

কমল দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৭৪) কণ্ঠশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। ১৯১২ সালের ২৮ জুলাই নড়াইল জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ছিলেন উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুরাগী। পুরো নাম কমলপ্রসন্ন দাশগুপ্ত হলেও তিনি কমল দাশগুপ্ত নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালে ইসলাম ধর্ম এবং কামালউদ্দীন আহমদ নাম গ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুলসংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কমল দাশগুপ্তের সংগীতে হাতেখড়ি হয় সহোদর বিমল দাশগুপ্তের নিকট। পরে দিলীপকুমার রায়, কানা কেষ্ট, ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ প্রমুখের নিকট তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি আধুনিক বাংলা, উর্দু, হিন্দি, ঠুমরি এবং ছায়াছবির সংগীতে কণ্ঠদান ও সুরারোপ করেন। সুরের রাজ্যে কমল দাশগুপ্ত ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

৮. আশরাফী খানম

খানম, আশরাফী প্রথম বাঙালি মুসলমান গায়িকা, যাঁর গান গ্রামোফোন ডিস্কে ধারণ করা হয়। মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল নওহাদ্দা গ্রামে এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন আলী আহমদ হামিদুল্লাহ খানের (নয়া মিয়া) কন্যা। তাঁর পিতামহ মোয়াজ্জেম হোসেন খান ছিলেন সংগীতানুরাগী। ফলে কৈশোরেই আশরাফী পারিবারিক বলয়ে সংগীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন। বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সংগীতচর্চার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে আশরাফী খানম তাঁর ফুফু বেগম বদরুন্নেসা আহমেদের সঙ্গে কলকাতায় যান এবং সেখানে একান্তভাবেই নজরুলসংগীত অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আশরাফী তাঁর গান রেকর্ড করার সুযোগ পান। কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানি টুইন ব্রাদার্স কর্তৃক ১৯৩৪ সালে 'কুমারী বেবী' ছদ্মনামে তাঁর কণ্ঠে চারটি নজরুলসংগীত গ্রামোফোন ডিস্কে রেকর্ড করা হয়।

৯. শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন ১৮৬৩ সালে আশ্রম হিসেবে এর যাত্রা শুরু। রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিনহার কাছ থেকে ২০ বিঘা জমি কিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিম বাংলার বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুরের কাছে এই আশ্রম অবস্থিত। জাগতিক করণীয়

কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে প্রার্থনায় সময় কাটানোর জন্য গৃহী ব্যক্তিদের নির্জন আশ্রয় দান করা ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট—একটি অতিথিভবন, প্রার্থনাকক্ষ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের জন্য নিবেদিত গ্রন্থাগারের সংস্থান করেছিলেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একটা আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাল্যকালে তাঁকে যেসব স্কুলে পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে তিনি খুশি ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে ইংরেজি স্কুলগুলো ছিল ভারতীয় জীবনধারা, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। শান্তিনিকেতনকে বেছে নেওয়ার পেছনে তাঁর তিনটি স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল: প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা; পরিবর্তনশীল ভারতে শহর ও গ্রামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান; এবং বৃহত্তর বিশ্বকে গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলার জন্য জ্ঞানদান করা। নতুন এক শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় মানসকে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত করাও ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা। তিনি ভেবেছিলেন যে এটি সম্ভব হলে নিছক জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে তা জীবনের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে। শিক্ষার শুরু থেকেই শিশুরা সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের অর্থ উপলব্ধি করুক—এটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু ছিলেন এর চ্যান্সেলর (আচার্য); অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজিনী নাইডু ছিলেন তাঁর উত্তরসূরি।

১০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, (১৯০১-১৯৬০) কবি, প্রাবন্ধিক ও পত্রিকা সম্পাদক। ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে তাঁর জন্ম। পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। প্রসিদ্ধ গায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেব তাঁর স্ত্রী। সুধীন্দ্রনাথ ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাশীর থিয়সফিক্যাল হাইস্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১৮) এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আইএ (১৯২০) ও বিএ (১৯২২) পাস করে তিনি কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩১ সাল থেকে দীর্ঘ ১২ বছর তিনি পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫-৪৯ সময়ে তিনি *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর *সবুজপত্র*-এর সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৫৭-১৯৫৯ সময়ে তিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং পরে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সুধীন্দ্রনাথ কর্মজীবনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। আধুনিক মনন ও বৈশ্বিক চেতনার কারণে তিনি বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো: *কাব্য তন্ত্রী* (১৯৩০), *অর্কেস্ট্রা* (১৯৩৫), *ক্রন্দসী* (১৯৩৭), *উত্তরফাল্গুনী* (১৯৪০), *সংবর্ত* (১৯৫০), *দশমী* (১৯৫৬); গদ্যগ্রন্থ *স্বগত* (১৯৩৮), *কুলায় ও কালপুরুষ* (১৯৫৭)। এ ছাড়া *প্রতিধ্বনি* (১৯৫৪) নামে তাঁর একটি অনুবাদগ্রন্থও আছে। তিনি বাংলা গদ্যের আধুনিক রূপেরও প্রবর্তক। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১১. 'মোহাম্মদী'

মোহাম্মদী একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা। ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি এবং জিন্নাহর

দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং শেষে পাকিস্তানি ভাবধারার প্রসার ঘটানো ছিল *মোহাম্মদী* প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। তবে এতে অন্য মতাদর্শের লেখকের লেখাও প্রকাশিত হতো। এতে যেসব মুসলমান লেখক, কবি-সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ লিখতেন তাঁরা হলেন সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, তালিম হোসেন, আবদুল হাই, আবু জাফর শামসুদ্দীন, হবীবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, আবদুল গনি হাজারী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু রুশদ, জসীমউদ্‌দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, ফেরদৌস খান প্রমুখ। তাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১২. 'দৈনিক আজাদ'

দৈনিক আজাদ একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার এ পত্রিকাটি তখন নিজস্ব রোটারি মেশিনে ছাপা হতো। এ সময় *আজাদ* পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। পত্রিকা প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ। এ সময় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও নজীর আহমদ চৌধুরী। খায়রুল কবির তখন ছিলেন ঢাকার আঞ্চলিক রিপোর্টার। ভাষা আন্দোলনে আজাদ সাহসী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রজনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র ঢাকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। *দৈনিক আজাদ* গুলিবর্ষণের নিন্দা জানিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। *আজাদ*-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভা থেকে পদত্যাগ করেন। আইয়ুব খানের সময়ে বিভিন্ন কালাকানুনের বিরুদ্ধে অন্যান্য পত্রিকার পাশাপাশি *দৈনিক আজাদ* জোরালো প্রতিবাদ জানায়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে এবং উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে *দৈনিক আজাদ* জনগণের পক্ষে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালে মাওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটির মালিকানা ও কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর *দৈনিক আজাদ* সরকারি ব্যবস্থাপনা বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর পুনরায় ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিক্রয় হয়ে যায় *আজাদ* পত্রিকার ভবনটিও।

১৩. ফতেহ লোহানী

ফতেহ লোহানী, (১৯২০-১৯৭৫) অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক ও সাংবাদিক। আবু নজীর মোহাম্মদ ফতেহ আলী খান লোহানী সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। যেমন: বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অগ্রণী অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক, সংবাদপাঠক, আবৃত্তিকার ও অনুবাদক। কলেজে মঞ্চস্থ তাঁর প্রথম নাটক বনফুল রচিত *শ্রী মধুসূদন*-এ তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক উৎপল দত্ত পরিচালিত *হ্যামলেট*। পরে তিনি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হন। তিনি *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকটি পরিচালনা ও তাতে অভিনয় করেন। বাণী থিয়েটারের মঞ্চে তিনি *রামের সুমতি* নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পর তাঁর পরিচালিত প্রথম দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ছিল *আকাশ আর*

মাটি (১৯৫৯) ও *আসিয়া* (১৯৬০)। ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত উর্দু ছবি *সাত রং*। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রথম অভিনয় করেন টেলিভিশন নাটক *নির্ভীক*-এ। ঢাকায় তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র *রাজা এল শহরে* (১৯৬৪)। ফতেহ লোহানী অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে *মুক্তির বন্ধন* (১৯৪৭), *তানহা* (১৯৬৪) *বেহুলা* (১৯৬৬), *ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো* (১৯৬৬), *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৬৭), *দরশন* (১৯৬৭), *জুলেখা* (১৯৬৭), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮) *বাল্যবন্ধু* (১৯৬৮), *মোমের আলো* (১৯৬৮), *মায়ার সংসার* (১৯৬৯), *মিসর কুমারী* (১৯৭০), *তানসেন* (১৯৭০), *আঁকাবাঁকা* (১৯৭০), *অন্তরঙ্গ* (১৯৭০), *ঘূর্ণিঝড়*, (১৯৭০), *স্বরলিপি* (১৯৭০), *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০), *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০), *অপবাদ* (১৯৭০), *ডাকু মনসুর* (১৯৭৪), *দুই রাজকুমার* (১৯৭৫), *এক মুঠো ভাত* (১৯৭৫), *কুয়াশা* (১৯৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। এর মধ্যে: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬১-তে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র *আসিয়া*-র জন্য), পাকিস্তানের নিগার পুরস্কার (১৯৬-তে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা *আসিয়া*), পাকিস্তানের মজিদ আলমাক্কী পুরস্কার (১৯৬৮-তে শ্রেষ্ঠ বেতার নাট্য-অভিনেতা), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কার ১৯৭৫ (অভিনয়—চলচ্চিত্র) এবং এফডিসির রজতজয়ন্তী ট্রফি (১৯৮৩) উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে *কুয়াশা* ছবির শুটিংয়ে নিয়োজিত থাকাকালে ১৯৭৫ সালের ১২ এপ্রিল ফতেহ লোহানীর মৃত্যু হয়।

১৪. জয়নুল আবেদিন

জয়নুল আবেদিন, (১৯১৪-১৯৭৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের তিনিই পুরোধা। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউ) তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে জয়নুল আবেদিন ধারাবাহিকভাবে একাধিক চিত্র স্কেচ করেন। এ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। সস্তা প্যাকিং পেপারে চায়নিজ ইঙ্ক ও তুলির আঁচড়ে 'দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র' নামে পরিচিত জয়নুলের এ চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে শব-সওদাগরদের নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক কলুষতা, সে সঙ্গে নিপীড়িতের অমানবিক দুর্দশা। চিত্রকর্মগুলো জয়নুলকে ভারতব্যাপী খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এগুলো মানুষের দুর্দশা, কষ্ট ও প্রতিবাদকে সামনে এনে বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কনে তাঁর স্বকীয়তাকে বিকশিত করে। 'দ্য রেবেল ক্রো' (জলরং, ১৯৫১) এ ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন। উচ্চ মার্গের নন্দনতত্ত্বের মিশেলে সামাজিক অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিবাদের সম্মিলিত প্রকাশ রিয়ালিজমের এ নির্দিষ্ট ধারা বিভিন্ন সময়ে জয়নুলকে প্রেরণা জুগিয়েছে: যেমন ১৯৬৯ ও ১৯৭১ এ সময় জয়নুল তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ করেছেন এ স্টাইলে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তির পর জয়নুল আবেদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। সে সময়ে ঢাকাতে কোনো আর্ট ইনস্টিটিউট বা অন্য কোনো শিল্পসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। জয়নুল আবেদিন ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী, যাঁরা দেশভাগের পর ঢাকায় অভিবাসী হয়েছিলেন, আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। 'দুই মহিলা' (গোয়াশ, ১৯৫৩), 'পাইন্যার মা' (গোয়াশ, ১৯৫৩) ও 'মহিলা' (জলরং, ১৯৫৩) হলো এ আমলের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের বিজয়কে ভিত্তি করে আঁকা ৬৫ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল পেইন্টিং (চায়নিজ ইঙ্ক, জলরং ও মোম) 'নবান্ন' এবং ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে

প্রাণ হারানো হাজারো মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আঁকা ৩০ ফুট দীর্ঘ 'মনপুরা' পেইন্টিংটির মধ্যে তাঁর কর্মের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। জয়নুল যদিও প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিত্র (পল্লি রমণীর ব্যক্তিগত মুহূর্তও অন্তর্ভুক্ত) এঁকেছেন, তবু ষাটের দশকের শেষ দিক ও সত্তর দশকে আঁকা তাঁর ছবির মধ্যে গতি, মুভমেন্ট পরিস্ফুটিত। ১৯৭৫ সালে জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁওয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর এবং ময়মনসিংহে একটি গ্যালারি (শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫. কামরুল হাসান

কামরুল হাসান, (১৯২১-১৯৮৮) চিত্রশিল্পী। প্রকৃত নাম আবু শরাফ মোহাম্মদ কামরুল হাসান। ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ হাশিম ছিলেন তিলজলা গোরস্থানের সুপারিনটেন্ডেন্ট। কামরুল হাসানের শিক্ষাজীবন কাটে কলকাতায়। তিনি কলকাতার মডেল এম ই স্কুল (১৯৩০-৩৫) এবং কলকাতা মাদ্রাসায় (১৯৩৬-৩৭) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসে ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে চিত্রকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি তিনি বয়েজ-স্কাউট, শরীরচর্চা, ব্রতচারী আন্দোলন, শিশু সংগঠন মণিমেলা, মুকুল ফৌজ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে শরীরচর্চা প্রতিযোগিতায় তিনি বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হন।

দেশ বিভাগের পর কামরুল হাসান ঢাকা চলে আসেন এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৪৮)। ঢাকায় চিত্রকলার চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আর্ট গ্রুপ। ১৯৬০ সালে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের নকশা কেন্দ্রের প্রধান নকশাবিদ নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৮ সালে ওই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কামরুল হাসানের চিত্রকলার প্রধান উপাদান নর-নারী (বিশেষত রমণীর শরীর), পশুপাখি (প্রধানত গরু ও শৃগাল), সাপ ও প্রকৃতি। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজের সামগ্রিক রূপ, বাংলার নিসর্গ, স্বৈরশাসকদের অত্যাচার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার চিত্র চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রকলা ষাটের দশকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে জনসাধারণকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে। কামরুল হাসানের চিত্রকলায় লৌকিক ও আধুনিক রীতির মিশ্রণ ঘটায় তিনি 'পটুয়া কামরুল হাসান' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি মনোগ্রাম তৈরি করার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিত্রকলায় অসাধারণ অবদানের জন্য কামরুল হাসান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন। সেসবের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৫), কুমিল্লা ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৭৯), চারুশিল্পী সংসদ সম্মান (১৯৮৪), বাংলা একাডেমির ফেলো (১৯৮৫) এবং কাজী মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৫) উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'তিনকন্যা' ও 'নাইওর' চিত্রকর্ম অবলম্বনে যথাক্রমে যুগোস্লাভিয়া সরকার (১৯৮৫) ও বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬) দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

১৬. **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, (১৯২২-১৯৮৯) কণ্ঠশিল্পী, সুরকার। ১৯২২ সালের ১৬ জুন বারানসীতে তাঁর জন্ম। তিনি কলকাতায় বড় হয়ে ওঠেন। গায়ক হওয়ার উদ্দেশে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ধ্রুপদি সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের কাছে আর লঘু শেখেন শৈলেশ দাশগুপ্তের কাছে। তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৭ বছর বয়সে, শেষ রেকর্ড ৬৪ বছর বয়সে। তাঁর সংগীতজীবন বিস্তৃত ছিল অর্ধশতাব্দীরও কিছু বেশি সময় ধরে। তাঁর প্রথম হিন্দি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। তিনি হিন্দি গানের একজন প্রধান শিল্পী এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন। কয়েকটি হিন্দি ছায়াছবিও তিনি প্রযোজনা করেন। তবে তিনি বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন আধুনিক গান এবং রবীন্দ্রসংগীতের জন্য। পঙ্কজ মল্লিক ও দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে একদিকে রবীন্দসংগীতকে তিনি শহুরে ভদ্রলোকদের বৈঠকখানা থেকে বের করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, অন্যদিকে ভারী কণ্ঠকে গানের আদর্শ কণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের ডিস্ক (*প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় এবং হে নিরুপমা*, ১৯৪৪) আজও জনপ্রিয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় হেমন্ত বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করেন। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে ঢাকা থেকে একটি পুরস্কারে ভূষিত হয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পরেই ২৬ জুন তিনি মারা যান।

১৭. **পঙ্কজ মল্লিক**

পঙ্কজ মল্লিক, (১৯০৫-১৯৭৮) রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক। ১৯০৫ সালের ১০ মে কলকাতার এক বৈষ্ণব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু এখানেই তাঁর পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটে। জনৈক আত্মীয়ের নিকট শৈশবেই পঙ্কজ কুমারের সংগীতশিক্ষা শুরু হয়। পরে কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পুরোপুরি সংগীতের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতে থাকেন। এমনি এক অনুষ্ঠানে তাঁর পরিচয় হয় তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি পঙ্কজের মধ্যে সংগীতের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখতে পান এবং তাঁকে রাগসংগীতে তালিম দিতে শুরু করেন। এভাবেই তাঁর পদ্ধতিগত সংগীত শিক্ষার শুরু। পঙ্কজ বঙ্গবাসীতে অধ্যয়নকালেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরারোপ করে গাইতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেন। পঙ্কজ শুধু একজন শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীই ছিলেন না, রবীন্দ্রসংগীতে তিনি অনেক নতুন মাত্রাও যোগ করেন, যার ফলে রবীন্দ্রসংগীত ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়। আগে রবীন্দ্রসংগীতে তবলা ব্যবহার করা হতো না, পঙ্কজকুমারই প্রথম এতে তবলা সংগত করেন। তাঁর আগে রবীন্দ্রসংগীত বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পঙ্কজকুমার তাঁর ওজস্বী কণ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত গায়নরীতি এবং হৃদয়ের আবেগ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। পঙ্কজ ১৯২৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে কলকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বেতারে সংগীত শিক্ষার আসর প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর পরিচালক ও শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। এই আসরের মাধ্যমেই তিনি মূলত রবীন্দ্রসংগীতকে জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় করে তোলেন। এই আসরে তিনি নজরুলের গানও শেখাতেন। ১৯৩২ সাল থেকে কলকাতা বেতার থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে যে সংগীতালেখ্য প্রচারিত হতে থাকে, পঙ্কজ ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। এ অনুষ্ঠানে তাঁর সংগীত পরিচালনা এক মহতী কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় সুরারোপ করে পঙ্কজকুমার অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি সুরারোপিত এই কবিতাগুলোও তিনি গান হিসেবে রেকর্ড করেন। তাঁর রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা চার শতাধিক। সংগীতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৩২ সালে সারস্বত মহামণ্ডল কর্তৃক 'সুরসাগর', ১৯৫৬ সালে 'সংগীতরত্নাকর', ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী', ১৯৭৩ সালে 'দাদা সাহেব ফালকে' এবং ১৯৭৪ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮. **লায়লা আর্জুমান্দ বানু**

লায়লা আর্জুমান্দ বানু, (১৯২৯-১৯৯৫) গায়িকা ও সমাজকর্মী। তিনি ১৯২৯ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ও দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৪৯ সালে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। লায়লা আর্জুমান্দ বানু ওস্তাদ গুল মুহম্মদ খানের তত্ত্বাবধানে উচ্চাঙ্গসংগীতে প্রাথমিক তালিম গ্রহণ করেন। নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, গজল, আধুনিক ও লোকসংগীতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অসাধারণ কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। দশ বছর বয়সে প্রথম মুসলিম কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তিনি ঢাকা বেতারে সংগীত পরিবেশন করেন। এমন এক সময় ছিল, যখন পর্দাপ্রথা নারীদের ঘরের বাইরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করত, তখন লায়লা আর্জুমান্দ বানু তাঁর পিতা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ও মা সারা তৈফুরের সক্রিয় সহযোগিতায় সকল বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ইরানের শাহ রেজা পাহলবীর নিকট থেকে 'অভিষেক পদক' এবং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট হতে 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পুরস্কার গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা সংগীত কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ঢাকা জাদুঘরের ট্রাস্টি, 'নজরুল স্বরলিপি শুদ্ধীকরণ বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রকাশিত ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচারের সংগঠনিক কমিটির সদস্য ছিলেন। বিদেশে সাংস্কৃতিক সফরে বহুবার তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫।

১৯. **আবদুল লতিফ**

লতিফ, আবদুল (১৯২৪-২০০৬) সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। তিনি বরিশালের রায়পাশা গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণ তাঁর গ্রামে তাঁকে গায়ক হিসেবে পরিচিত করে তোলে। আবদুল লতিফ আল্লাহ্-রসুলের প্রশংসায় ভরা আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া নজরুলের একটি ইসলামি গান গেয়ে শোনান। আবদুল লতিফ কলকাতা থেকে ১৯৪৮ সালে ঢাকা আসেন। এখানে বিখ্যাত গায়ক ও সংগীত পরিচালক আবদুল হালিম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে হিন্দু শিল্পী-

গীতিকারদের দেশত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলায় বড় রকমের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ সংকটমুক্তির লক্ষ্যে তিনি আবদুল লতিফকে গান লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি প্রথমে আধুনিক গান ও পরে লেখেন পল্লিগীতি। আবদুল লতিফের মেজাজে গণসংগীতের উপাদান ছিল। তাঁর গানগুলোয় পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর সবেচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গান—'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে তাঁর *ভাষার গান, দেশের গান*। এতে আছে বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ২৪টি, দেশের গান ৫১টি, ৯৫টি গণসংগীত, দুটি জারি এবং আটটি মানবাধিকার-সম্পর্কিত গান। তাঁর অন্য দুটি বইয়ের নাম *দুয়ারে আইসাছে পালকি* (মরমি গান) এবং *দিলরবাব*। ২০০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

সীমান্ত ইতিহাস

১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস

আশফাক হোসেন

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮৭৪ সালে একটি নতুন প্রদেশ হিসেবে আসামের সৃষ্টি এবং বাংলা থেকে সিলেটকে আসামে স্থানান্তর ছিল নিছক এক 'তামাশা'। ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সিলেট আসাম প্রদেশের একটি অংশ হয়েই থাকল, যেটি এই অঞ্চলে একটি তাৎপর্যময় পরিণতি ডেকে এনেছিল। এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক সঞ্চালনশীলতার বা গতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে সংরক্ষিত সরকারি উৎস যাচাই ও পুনঃ যাচাই, প্রাসঙ্গিক আত্মজৈবনিক টেক্সট পাঠ করা হয়েছে। উপনিবেশ ও উত্তর-উপনিবেশ সময়কালে বিকশিত ইতিহাসবিদ্যার আলোকে বাংলা ও আসামের মধ্যবর্তী একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলকে 'কাল্পনিক' ইতিহাস থেকে মুক্ত করে 'অভিজ্ঞতাবাদী' ইতিহাসের সাহায্যে জানার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। দেশভাগের মূল পাঠ (বাংলা) থেকে বিভাজনের এই যে উপ-পাঠ (সিলেট) সেটা আরও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক বা ষড়যন্ত্রমূলক ছিল। কারণ, সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো এই বিষয়ের ইতিহাসকে আমাদের ক্ষুদ্র পর্যায়ে পাঠ করতে প্রস্তাব দেয়। কয়েক প্রজন্মের ইতিহাসবিদদের লেখায় সিলেটের আপামর জনগণের মনোজগৎকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিভঙ্গিতে (বাস্তবতা থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে হালকাভাবে) দেখার একটি প্রবণতা বা ঝোঁক লক্ষ করা যায়। যার ফলে, বর্তমান এই প্রবন্ধটি সমন্বিত উৎসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে এই যুক্তি প্রদান করছে যে আসলে পুরো বাংলা এবং আসাম সীমান্তজুড়ে এই নতুন প্রদেশটি বাস্তবায়িত হয়েছিল ইতিহাসকে ডিঙিয়ে। মূলত ১৮৭৪ সাল থেকেই নতুন এই প্রদেশে এলিটদের কণ্ঠস্বর (যার অধিকাংশই হিন্দু এবং আংশিক মুসলিম এলিট) ছিল প্রভাবশালী। ১৯৪৭ সালের গণভোটে বিশেষ করে 'পাকিস্তানপন্থী' দলিত (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু) এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত 'ভারতপন্থী' মৌলভিগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'খেলোয়াড়' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তবে সিলেটের গণভোট, বিশেষ করে ওই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর ওপর আলোকপাত করে পরিচালিত তেমন কোনো গবেষণা পাওয়া যায়নি। ফলে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে

১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আসাম প্রদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সিলেটের গণভোট বিষয়টির ক্ষেত্রে উত্থাপিত বহুমুখী প্রশ্নের সম্ভাব্য জবাব কেবল অনুসন্ধানের মাধ্যমে এক নতুন মাত্রা উন্মোচন করা হবে এবং সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধ এ সীমান্ত জেলার মানুষের মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'ধার্মিক' শক্তির পরস্পর বিরোধিতার চেয়ে অধিক পরিমাণে 'সাম্প্রদায়িক চৈতন্য বা মানস' বিদ্যমান রয়েছে, সেদিকেও এক পলক নজর দেওয়ার চেষ্টা করবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

আসাম প্রদেশ, সিলেট, চা, ব্রিটিশ-সিলেটি, গণভোট, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদী।

ভূমিকা

১৮৭০-এর দশকের সূচনাপর্বে ব্রিটিশ-ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি সীমানা প্রদেশ হিসেবে আসামের জন্ম ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ওই নতুন কাঠামোতে সিলেটের অন্তর্ভুক্তি ছিল 'নাটকীয়' ও কৌতূহলোদ্দীপক এক বিষয়। বৈশ্বিক পণ্য হিসেবে চা-এর আবির্ভাব সিলেটের সীমান্ত স্থানান্তরের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছিল। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে এ অঞ্চলের পৃথক্‌করণ এর হিন্দু এবং অল্পসংখ্যক মুসলিম ধনিক/এলিট শ্রেণিকে আসামে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি, প্রশাসন এবং শিক্ষায় আধিপত্যবাদী অবস্থান দিয়েছিল। এ প্রবন্ধে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাওয়া হবে সেগুলো হলো: ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক জন্ম নেওয়া নতুন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সিলেটিদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? এর ফলাফল বা পরিণতিগুলো কী ছিল?

১৮৭৪ সাল থেকে রাজনৈতিক সঞ্চালনশীলতার দিকে দৃষ্টিপাত করে জাতিরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ নির্মাণের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ এবং পুনঃপরীক্ষা করে দেখা হবে কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় আত্মসত্তার রাজনীতি ও 'পরিচয়সমূহ' আবির্ভাবের সমান্তরালে ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ ও নিম্নবর্গীয় মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিও কাজ করেছিল। অভিজাত হিন্দুদের 'সুবিধাবাদী' রাজনৈতিক অবস্থান বা পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের 'ভোল পাল্টানো'র কর্মটি ছিল খুবই মজার এক বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে তারা ১৯২০ ও ১৯৩০ সালে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল 'বাংলায় ফিরে আসা' আন্দোলনেই, কিন্তু পরে বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের ভাগ্যনির্ধারণী মুহূর্তে ওই একই নেতারাই তাঁদের সেই অবস্থানের সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটেছিলেন এবং বাংলার সঙ্গে সিলেটকে পুনরায় একত্রীকরণের বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে সচল করেছিলেন। এসব 'আত্মস্বীকৃত' বাঙালি জাতীয়তাবাদীরাই ১৯৪৭-পরবর্তী নতুন রাষ্ট্রে ক্ষমতা হারানোর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের ক্ষমতাকাঠামোতে

আবির্ভূত হওয়ার ফলে একটি সংকীর্ণ সামাজিক পরিসর সৃষ্টির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছু সংশয়ের সঙ্গে ওসব ভয় চূড়ান্তভাবে ১৯৪৭ সালে তাঁদের বাধ্য করল এই দাবি জানাতে যে সিলেটকে অবাঙালি অধ্যুষিত আসাম অংশের সঙ্গেই রাখা উচিত হবে। ১৮৭৪ থেকে আসামের রাজনীতি, বাঙালি বনাম অহমীয়া এলিটদের প্রতিযোগিতা ও সিলেটের গণভোটের ওপর আলোকপাত করে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে তৃণমূল পর্যায়ে শ্রেণি, গোত্র ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বহুমুখী 'পরিচয়সমূহ' কাজ করে। এমনকি পূর্ব লন্ডন— যদিও তা পাঁচ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে যেসব সিলেটি বসবাস করছিল, তারাও ১৯৪৭ সালের ঘটনাপ্রবাহে জড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রবন্ধে আসাম কর্তৃক সিলেটকে বর্ধিত অংশ হিসেবে সংযোজন এবং পরে ১৯৪৭ সালে আবার তা পূর্ব বাংলায় ফিরিয়ে দেওয়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস উপস্থাপন করা হবে। ১৮৭৪ থেকে যে পরিবর্তন তা করার ফলে কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি আসামের অধিবাসী—সবার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসবের ফলে সর্বদাই তাদের সাড়াশব্দে পরস্পরবিরোধী একটা পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। এতে মনে হয় মৌলভি এবং দলিতরা নীরব ছিলেন না বরং তাঁদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশকেও গণভোটকালীন সচেতন দেখা গেছে; তা সত্ত্বেও ওই বিষয়ে তাঁদের সাড়া বা মতামত শুধু বিচিত্রই ছিল না, একই সঙ্গে জটিলও ছিল।

বিদ্যমান গবেষণার পুনঃপরিদর্শন এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্র

ব্রিটিশ-ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে আসাম এবং সিলেট বিষয়ে প্রচুর সেকেন্ডারি (দ্বৈতয়িক) উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। ওসব বইপত্র খুব কমই পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে—অমলেন্দু গুহ আসামে শ্রেণি-সংগ্রাম এবং শ্রেণি-গঠনের বিষয়টি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এ ধরনের ইতিহাসবদ্ধ বিবরণে 'পরিচয়' প্রশ্নটির ব্যাপারে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি জয়িতা শর্মা তাঁর গবেষণায় আসাম অধিবাসীদের পরিচয়ের বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণায় সিলেটিদের পরিচয়ের ব্যাপারে তেমন কোনো নজরই দেননি। তা ছাড়া, তাঁর এ গবেষণাটির পরিসর ১৯৩৫ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এতে সিলেটের গণভোটের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[১] দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিস্বত্ব পুঁজিবাদের ওপর ভিত্তি করে ডেভিড লাদেনের একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রধান গবেষণা পাওয়া যায়, যাতে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সম্প্রতি তাঁরই আরও একটি গবেষণা সিলেট এবং আসামের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া যায়, যা একদিকে নৃতত্ত্ব যেমন *খাসিয়া* জনগোষ্ঠীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে,

অন্যদিকে তা আধুনিকতা ও পরিসর (Space) সম্পর্কেও ধারণা দেয়। অনিন্দিতা দাসগুপ্ত বলছেন যে জনপ্রিয় বা গবেষণামূলক লেখা উভয় ক্ষেত্রেই অনুমানের চেয়ে 'সিলেটি-বাঙালি-হিন্দু'দের 'শরণার্থিত্ব' সম্পর্কে অনেক বেশি (বহুত্ববাদী) অভিজ্ঞতা ছিল। যা হোক, ইতিহাস গবেষণায় এই বহুত্ববাদী অভিজ্ঞতার ওপর ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করা উচিত।[২] যদিও এটি খুবই বিস্ময়কর যে প্রায় সবাই আসামের ইতিহাস গবেষণায় সিলেটের গণভোটের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেননি, কারণটি উপলব্ধিযোগ্য। হাজার হাজার বছর ধরে সিলেট বাংলার অবিচ্ছেদ্য বা অখণ্ড অংশ ছিল; এটি শুধু ১৮৭০ সালে আসামের অংশ করে নেওয়া হয়। গবেষকেরা সংরক্ষিত দলিল এবং সরকারি নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করেই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। তাই তাঁরা সিলেটকে একটি ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে দেখতে পেয়েছেন, যার দাপ্তরিক নথিপত্রও বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। সে কারণে খুব সহজেই বিষয়টি বাদও পড়ে যায়। এভাবে প্রথমে ১৮৭৪ সালে এবং পরে ১৯৪৭ সালেও সিলেটের সীমানা পুনরায় রূপ দেওয়া হয়, যা এটিকে উপর্যুক্ত গবেষণার গতানুগতিক আঙ্গিক থেকে ভিন্ন মাত্রায় আলোচনার ইঙ্গিত প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে অনিন্দিতা দাসগুপ্ত একেবারে ভুলে যাওয়া বিভাজনের গল্প থেকে মুসলিম এবং হিন্দুদের কণ্ঠস্বরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের বা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি নিজেকে প্রধানত সিলেটি হিন্দু 'ভদ্রলোক' এই কাজে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৩]

সুতরাং এই প্রবন্ধ সেসব 'পুরোনো' ও 'নতুন' ইতিহাস-বিষয়ক বিবরণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ। এতে খণ্ডিত গবেষণা পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যমান কাল্পনিক ইতিহাস-বিষয়ক বিবরণের বাইরে গিয়ে 'বহুমাত্রিক গবেষণা পদ্ধতি' অবলম্বন করে ঐতিহাসিক তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, যা একই সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতায় অর্থাৎ গৃহীত সাক্ষাৎকারে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে যে ১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আসামের রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। একদিকে এটি ছিল বাঙালি বনাম আসামি, অন্যদিকে কখনো হিন্দু বনাম মুসলিম। সিলেটে স্থানীয় এলিট শ্রেণির লোক সব সময়ই যেকোনো সঞ্চালনশীলতার অগ্রভাগে ছিলেন। তা সত্ত্বেও নিপীড়িত বা হতভাগ্য যেমন: কৃষক, শ্রমিক, *দলিত* এবং *মৌলভিরা* অনেক তাৎপর্যময় অবদান রেখেছেন। এই প্রক্রিয়ায়, অসংখ্য বিভাগ এবং বিরোধ আবির্ভূত হয়েছিল, বিশেষ করে এলিটদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা ও স্ববিরোধিতার কিছু নমুনা আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, আসাম থেকে সিলেটের 'বাংলায় ফিরে আসা' আন্দোলন ছিল হিন্দু এলিট শ্রেণির মস্তিষ্কনিঃসৃত পরিকল্পনা বা উদ্ভাবন, যাঁরা দশকের পর দশক জুড়ে এর অগ্রভাবে ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৭ সালে এসব ব্যক্তি পুরোপুরি বিপরীত

অবস্থান নিয়েছিলেন। এ বিষয়গুলোই আরও বিস্তৃত আকারে ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাঠামোতে ফেলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যমান গবেষণা থেকে নতুন দিকে দৃষ্টি ফেরানো এবং সেগুলোর স্বরূপ অনুসন্ধান বা উদ্‌ঘাটন করা, বহুমুখী সীমান্তের ইতিহাস জানা, যেখানে প্রক্রিয়াগুলো শুধু শক্তিশালী উপনিবেশ শাসক বা তাঁদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত ছিল না বরং শ্রেণি, ধর্ম, গোত্র অথবা *উচ্চ-মধ্য-নিম্ন* বিত্ত বা বর্ণের স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারাও নিরপেক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এখানে যুক্তি দেওয়া হবে যে এলিট শ্রেণির জন্য সিলেটের গণভোট শুধু সন্ধিক্ষণ বা বিভাজনরেখাই ছিল না বরং এটি একই সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়, মৌলভি, সমুদ্রগামী সিলেটি জাহাজি, চা-শ্রমিক এবং *দলিতদের* জন্যও গুরুত্বপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণ ছিল।

আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার অনেক ইতিহাসবিদের এই প্রবণতা রয়েছে যে তাঁরা শুধু বিভাজন বা স্ববিরোধিতা বিশ্লেষণে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে হয় যুগ্মভাবে বা একসঙ্গে আলোচনা করার প্রসঙ্গ টেনে আনেন অথবা তাঁরা বৃহত্তর বাঙালির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। খুব কম গবেষকই অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কীভাবে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় সীমান্ত নিয়ে 'ছেলেখেলা' বা 'ফ্যাশন' করেছিল। কেবল মুষ্টিমেয় উদ্ভাবনমূলক গবেষণায়ই আড়াআড়ি-সীমান্ত ইতিহাসের বিষয়টি উঠে এসেছে, বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে। যেমন: উইলিয়েম ভ্যান শ্যান্ডেল যুক্তি দিচ্ছেন এই বলে যে ১৯৪৭ সালের বিভাজনটি আসলে কিছু 'সীমানাভূমি সমাজ' তৈরি করেছিল।[৪] ব্রিটিশ বাংলার ওপর জয়া চ্যাটার্জির তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণায় দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে একধরনের জটিল সম্পর্কের বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি তাঁর গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন যে কীভাবে *ভদ্রলোকেরা* কংগ্রেসের প্ররোচনায় এবং হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে *বাংলা বিভাজন লীগ* গঠন করেছিলেন। তিনি বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের উত্থান এবং হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার পুনঃ অভ্যুত্থানের যমজ প্রক্রিয়ার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫] অপর দিকে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যুক্তি দিচ্ছেন যে বাংলা ও আসামের বিভাজন 'সম্ভবত অনিবার্য' ছিল।[৬] তিনি তির্যকভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে জনমিতিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে সিলেটের বিভাজনের অনুকূলে গণভোটের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে বাছাইকৃত তথ্য প্রয়োগ করে তিনি সিলেটের বিভাজন ও গণভোটের আংশিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। চক্রবর্তী পরামর্শ দিচ্ছেন যে লীগের দাবিসমূহ জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে মৌলভিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৭] এসব যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয় এ কারণে যে মৌলভিরা কেবল পাকিস্তানের কারণটিকেই সমর্থন

দিয়েছিলেন। ফলে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতির মূল জটিলতা বুঝতে আমাদের খুব বেশি সাহায্য করে না। যেমন: অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় বামপন্থীরা ঝুঁকে পড়েছিল 'হিন্দু এলিট' শ্রেণির দিকেই, যদিও মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠী, যেমন: *'জমিয়েত-ই-উলামা হিন্দ'* (মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের ভারতীয় সংগঠন *অতঃপর উলামা-ই হিন্দ*), বিশেষ করে সিলেটে, ব্রিটিশ-ভারত ভেঙে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'একক রাষ্ট্রের' ধারণাকেই সমর্থন করেছিল। এ প্রবন্ধটি তাই রাজনৈতিক সঞ্চালনশীলতার ওপর ভিত্তি করে সনাতন এবং অন্যান্য উৎস পুনরায় পর্যালোচনা করবে এবং 'কাল্পনিক' ও 'একদেশদর্শী' ইতিহাস রচনার প্রবণতা পরিহার করে অংশগ্রহণকারীদের জীবনে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং বিষয় সরকারি নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এভাবে ঔপনিবেশিক আমলে সংরক্ষিত নথিপত্রেও বিষয়গুলো স্থান পায়নি। ফলে ইতিহাসের এই জটিল পর্বটি অনুধাবন করার জন্য আত্মজীবনী, পারিবারিক দলিল-নথি এবং সাক্ষাৎকার থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্য-উপাত্ত

বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় আর্কাইভসমূহে সংরক্ষিত নথিপত্র, সরকারি দলিল এবং বেসরকারি পত্রপত্রিকা, আইনসভার কর্মপ্রক্রিয়ার বিষয়াবলি, ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠন-সংক্রান্ত নথিপত্র, সিলেটের গণভোট-সংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র, পত্রপত্রিকা, আদমশুমারি এবং সরকারি প্রজ্ঞাপনসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি নথিপত্রের বাইরের উৎস, বিশেষ করে, মৌখিক ইতিহাস এবং আত্মজীবনীকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের সিলেটের গণভোটে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী হাজি মুহাম্মদ ইউনূস, আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং নূরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। হাজি মুহাম্মদ ইউনূস যেমন আমাদের জানাচ্ছেন যে ১৯৪৭ সালে যারা নয় আনা করে কর দিত, তারাই কেবল ভোট দেওয়ার যোগ্য ছিল। ১৯৯৬ সালে গৃহীত দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সাক্ষাৎকারও সিলেটের গণভোটের তথ্য বিশ্লেষণে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।[৮] আজরফ 'আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগ'-এর পক্ষ থেকে কলকাতায় গিয়ে সীমান্ত কমিশনে (বাউন্ডারি কমিশন) যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্তের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়েছে। জেনারেল দত্ত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেট অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৯] উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারের সবগুলো আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছি এবং প্রয়াত ক্যারোলিন অ্যাডামস কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা 'ওরাল হিস্ট্রি আর্কাইভ' থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্যারোলিন ১৯৮০-

এর দশকে প্রথম প্রজন্মের 'ব্রিটিশ-সিলেটি'দের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছু পত্রপত্রিকা এবং টেপ (রেকর্ড) চমৎকারভাবে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো টাওয়ার হেমলেট লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।[১০] দেশে-বিদেশে সিলেটিদের রাজনৈতিক সঞ্চালনশীলতা বোঝার জন্য এসব মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণও ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ছাড়া আত্মজীবনী থেকে প্রাপ্ত বিবরণী ও সরকারি দলিলপত্র ও মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে সরকারি সংরক্ষিত দলিলপত্রে অনেক তথ্য রয়েছে, যা গোপন করা হয়েছে নতুবা উপস্থাপন করা হয়নি। ব্যক্তিক ইতিহাসের উপাদান অর্থাৎ পারিবারিক কাগজপত্র, আত্মজীবনীগুলোতে প্রদত্ত তথ্য ও মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে অনেক বেশি জানার বিষয় রয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ১৯৭০-এর দশকের প্রথম পর্যন্ত হিন্দু, মুসলিম এবং ইউরোপের ধনিক শ্রেণির লোকেরা ঘটনার নানামাত্রিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ ধরনের উৎসসমূহ এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং এসব উৎস ইতিহাসবিদ, যাঁরা সাধারণত গতানুগতিক তথ্য এবং সংরক্ষিত তথ্যই বেশি ব্যবহার করে থাকেন, তাঁদের দ্বারা তথ্যকে অতিরঞ্জিত করারও একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটি বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ঔপনিবেশিক শাসক বা কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা বা সামাজিকভাবে একজন এলিট তাঁদের সময় ও পরিসর সম্পর্কে কী রকম চিন্তা করেন এবং উভয় পক্ষের বর্ণনা-বিবৃতি থেকে অনেক কিছুই জানা যেতে পারে। যা হোক, আত্মজীবনীধর্মী উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার সময় খুবই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কলিন হে-উড বলছেন যে 'আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মজীবনী' থেকে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়েও খুবই সচেতনতা অবলম্বন করা দরকার, যেখানে অন্যান্য প্রাথমিক উৎসের ব্যবহার করার মতোই একজন ঐতিহাসিকের জবাবদিহিরও একটি ব্যাপার রয়েছে এবং সেটাও তথ্যগ্রহীতাকে বিবেচনায় রাখতে হয়, যাতে এ বিষয়ে কোনো রকমের প্রশ্নের মুখোমুখি না হতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত সাহিত্য-বিষয়ক নিয়মকানুনও জানা দরকার। সেই সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট সময়ে লেখকের ব্যক্তিগত আলোচ্যসূচি কী ছিল অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবচেতন মনে ঘটনাপ্রবাহকে বিকৃত করতে চেয়েছেন কি না, সে সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে।[১১] এগুলো মনে রেখেই, স্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মজীবনী, যাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক এলিট—যাঁরা তাঁদের যুক্তি-তর্ক জোড়া লাগানোর মাধ্যমে—আত্মজীবনী গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন, এই গবেষণায় তা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজন্মের তিনজন কংগ্রেস নেতার স্মৃতিচারণামূলক আত্মজীবনীগুলো বাছাই করা হয়েছে। তাঁরা তিনজন হলেন বিপিন চন্দ্র পাল,[১২]

ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী[১৩] এবং সুহাসিনী দাস।[১৪] জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রকমফের; বিশেষ করে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি (অ্যাপ্রোচ) থেকে কংগ্রেস পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক কোথায় তা বোঝার জন্য উপর্যুক্ত তিনজনের বর্ণনাগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সিলেট কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও সিলেট গণভোটকালীন গঠিত কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ভলান্টিয়ার কোর-এর কমান্ডার চঞ্চল কুমার শর্মা[১৫] ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিবরণ দিয়েছেন। মুসলিম লীগের দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ[১৬] (যিনি পরবর্তী সময়ে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে পরিচিত) এবং গণভোটের সময় মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মী সি এম আবদুল ওয়াহেদ[১৭] ওই সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাজনীতি সম্পর্কে মুসলিম মধ্যবিত্তদের চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। সংক্ষেপে তাঁদের এসব বিবরণ মূলত একটি যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট ও দ্বন্দ্ব এবং সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার যে উদ্যোগ, সে ভাবনাকেই সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে।

শুধু তা-ই নয়, এ বিষয়ে স্থানীয় বর্ণনা-বিবরণ ব্যতীত ইউরোপ থেকে আগত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত পর্যাপ্ত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও পাওয়া যায়। স্যার হেনরি কটন[১৮] এবং জি পি স্টিওয়ার্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবেও সে সময় কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁদের নিজ বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে আসামের প্রধান কমিশনার হিসেবে হেনরি কটন ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের যাবতীয় কলকবজার ওপর চা আবাদকারী ইউরোপীয় এলিটদের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩০ সালে জি পি স্টিওয়ার্টকে সিলেটে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ১৯৩৬ সালে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে সিলেটে ডেপুটি কমিশনার করা হয়, যা জেলার প্রধান কর্মকর্তার মর্যাদার সমান দাবিদার। তাঁর আত্মজীবনী এখনো অব্যাখ্যাত, যা বিভিন্ন কারণেই খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এতে আসামের একজন জেলা কর্মকর্তার জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে নিশ্চিয়ই ঐতিহাসিক কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে। তাঁর অতৃপ্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় সেখানে উদ্ভাবিত নতুন এক 'সংকর সংস্কৃতি'র কথা—যা চা উৎপাদন অর্থনীতি থেকে উদ্ভাবিত হয়েছিল—নিঃসন্দেহে এটি ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সহায়ক। তিনি ১৯৩০ সালে আসামি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে সিলেটের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নকশা তৈরি করেছিলেন।[১৯]

আসাম *চা উৎপাদক রাজ* এবং সিলেট : বিদ্রোহী একটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিকরণ

১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে আসাম সৃষ্টির আগে সিলেট বাংলার একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত জেলা ছিল[২০]। প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সুবাদে বিপিন চন্দ্র পালের ব্যক্তিগত কথোপকথনে ও বক্তব্যে উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে সিলেটের এই স্থানান্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনীর কাহিনিমালার সঙ্গে তাঁর সময়ে ইতিহাসের ঘটনা পরিক্রমা একই সুতায় গাঁথার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী, যা ১৯৩২ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় সিলেটের পুনর্গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন :

> আমি কার্তিক মাসের ২২ তারিখ, ১৭৭৯ শকাব্দ (বাংলা ১২৬৫ সাল), ৭ নভেম্বর ১৮৫৮ সালে সিলেট জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি। সিলেট এখন আসাম প্রদেশের প্রশাসনিক একটি অংশ কিন্তু আমার জন্মের সময় এবং পরবর্তী সময়ে অনেক বছর পর্যন্ত যখন আমার শৈশবকাল ছিল তখন সিলেট ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের অধীন একটি জেলা ছিল। আসামও তখন একজন কমিশনারের অধীনে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের একটি অংশ ছিল। যখন ১৮৭৪ সালে একজন প্রধান কমিশনারের অধীনেই আসাম প্রদেশকে একটি প্রদেশ করা হয়েছিল, তখন এসব জেলা যেমন: সিলেট এবং কাছাড়ের জনগোষ্ঠীর যাঁরা মূলত বাঙালি ছিলেন (আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও তা সত্যি ছিল), তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেকটা নতুন প্রশাসনের অধীনে এগুলোকে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং যাঁরা তখনো পুনরায় বাংলার সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি করছিলেন।[২১]

বিপিন পাল জানাচ্ছেন যে সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে সিলেট বাংলার একটি জেলা ছিল। তিনি দেখাচ্ছেন যে ১৮৭০ সালে ব্রিটিশরাজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে আসামের আবির্ভাবের আগে বাংলার অংশ হিসেবে ব্রিটিশরা আসামকে শাসন করেছে। আর এভাবেই সিলেটকে আসামে অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে জেলাটিতে একধরনের আত্মপরিচয় সংকটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সময়ের আবর্তে সিলেটিদের জন্য এই পরিচয়সংকটই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে, যারা বাংলা ও আসামের সীমান্ত এলাকায় বসবাস করছে, তাদের কাছে। আমার সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন নুরুল ইসলাম, যিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে সিলেটের গণভোটের সময় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে কীভাবে নতুন পরিচয় নির্মাণ হয়েছিল এবং পুনরায় ভেঙে ভিন্নভাবে নির্মাণ হয়েছিল। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত প্রসঙ্গ টেনে বলছেন যে :

> নতুন কোনো অঞ্চল এবং রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন আমি ১৯৩০ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ শাসনামলে ছিল। আমরা তখন ব্রিটিশ রাজা-রানির অধীনস্থ ছিলাম। পরিচয়ের দিক থেকে আমরা তখন ভারতীয় ছিলাম। আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় ছিল যে আমরা বাঙালি। ওই সময় আমরা প্রথমে বৃহত্তর বাংলায় এবং পরে আসামে বসবাস করতাম। যদিও আমরা আসামে ছিলাম কিন্তু তারপরও কখনো আমরা নিজেদের আসামি জনগোষ্ঠী বলতে পারতাম না। আসামি জনগোষ্ঠী আমাদের বলত সিলেটিরা হচ্ছে বাঙালি। আর এদিকে বাঙালিরাও আমাদের ডাকত আসামি জনগোষ্ঠী। সুতরাং আমরা একই সঙ্গে বাঙালি, আমরা ভারতীয় এবং আমরা আসামি জনগোষ্ঠী ছিলাম; তারপর আমরা পাকিস্তানি হলাম। ১৯৭১ আবার পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাঙালি বা বাংলাদেশি হলাম।[২২]

সুতরাং, যেকোনো বাঙালি থেকে একজন সিলেটির পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গিটা কমবেশি স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, ভাষাগত বিষয়বস্তু দেখাচ্ছে যে সিলেটিদের পরিচয়ের ভাষাগত অভিব্যক্তি হলো *সিলেটি নাগ্রির*। চৌদ্দ শতকে এই উপমহাদেশে আধ্যাত্মিক পীর শাহজালালের আগমন উত্তর-পূর্ব ভারত এবং সিলেটে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। শাহজালাল এবং তাঁর ৩৬০ জন অনুসারী এক চমৎকার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।[২৩] পণ্ডিতগণ বলছেন যে শাহজালালের সময়েই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো লিখে রাখার জন্য *সিলেটি নাগ্রি* ভাষা হিসেবে আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলা লিখতে এটি বিকল্প হস্তলেখ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং যখন অঞ্চলটিতে 'ইসলাম ধর্ম' একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিল, সে সময় সম্পর্কে তথ্যের নতুন উৎসের ধারণা দেয় ও স্থানীয় ইতিহাসের জটিল সময়কে নথিবদ্ধ করে। এভাবে ফারসি-আরবি ঐতিহ্যের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে *সিলেটি নাগ্রি* সাংস্কৃতিক মূল উপাদানগুলোর মধ্যে একটি বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[২৪] এটি মুসলিম পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে একটি বাহন হিসেবে কাজ করেছিল এবং আঞ্চলিক জনপ্রিয় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হিসেবে উন্নত বা 'উঁচু মানের' ইসলামের যে ঐতিহ্য, সেটা থেকে পৃথক ছিল। আঠারো শতক থেকে *সিলেটি নাগ্রি* ইতিহাসের পাঠ নারীদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, যারা এসব ধর্মীয় গদ্য-পদ্যের প্রাথমিক ভোক্তা ছিল। বি সি অ্যালেন লিখেছেন যে সিলেটি মুসলমানদের নিম্নবর্ণের মানুষগণ *সিলেটি নাগ্রি* ব্যবহার করতেন। এই মতামতের বিপরীতে নগেন্দ্র নাথ বসু বলছেন যে ধর্মান্তরিত *নাগর* ব্রাহ্মণরা (হিন্দু পুরোহিত) মুসলমানদের ধর্মীয় চরিত্রসমূহকে *সিলেটি নাগ্রি* গ্রন্থে লিখেছিলেন।[২৫] এই পরস্পরবিরোধী মতামত দৃষ্টিগোচর করছে যে মানুষের মতামত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে *সিলেটি নাগ্রি* ছিল একটি জনপ্রিয় হস্তলেখ বা লিপি। এমনকি, আজও বহু মানুষ বলছেন যে শাহজালালকে স্মরণীয় করে রাখতে একে *জালালাবাদ নাগ্রি* বলা হয়।[২৬] অধিকন্তু, শাহজালাল ও তাঁর অনুসারীদের বংশের সঙ্গে পারিবারিক ইতিহাস যুক্ত হওয়ার বিষয়টি সিলেটে খুবই সাধারণ একটি বিষয়। এসব তথ্যের আলোকে মনে হচ্ছে যে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি সিলেটের গণমানুষের, যার বৃহদংশ মুসলিম। এদের কল্পনাশক্তিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এই বিশ্বাসগুলোই শাহজালালকে স্মরণ করে রাখার জন্য ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে এবং যা এখনো সিলেটে ও লন্ডনের ব্রিকলেনেও সর্বাধিক প্রচার হিসেবে সেগুলোই ব্যবহার করা হয়। এভাবেই সিলেটি পরিচয়টি দেওয়া-নেওয়া বা লেনদেনপূর্ণ পরিচয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে কিছু নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখানো হবে যে কীভাবে 'ব্রিটিশ-সিলেটিরা' সশরীরে ও মানসিকভাবে ১৯৪৭ সালের গণভোটের পারিপার্শ্বিক

ঘটনাপ্রবাহে জড়িয়ে পড়েছিল। যদিও ১৯৭১ সালের বিষয়টি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে না, তবে যে কেউই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'ব্রিটিশ-সিলেটিদের' অংশগ্রহণ সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ বা নথিপত্র খুঁজে দেখতে পারেন। অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে সিলেটিদের একটি দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসী (ডায়াসপরিক) জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।[২৭] রবার্ট লিন্ডজি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, আঠারো শতকের শেষ দিকে তিনি সিলেটের শাসক ছিলেন এবং তিনি নিয়মিতই সিলেটিদের সাহায্যে সিলেট থেকে কলকাতায়, মাঝে মাঝে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। লিন্ডজি আরও লিখেছেন যে ১৮০৯ সালে তিনি যখন স্কটল্যান্ডে অবসর জীবন যাপন করছিলেন, তখন তিনি সৈয়দ উল্লাহ নামে এক ব্যক্তিকে প্রথম সিলেটি অভিবাসী হিসেবে ব্রিটেনে দেখতে পান।[২৮] যা হোক, উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে, আসাম ও সিলেট প্রদেশের ভেতরে নদীতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং রেল যোগাযোগ শুরু হয়ে যাওয়ায় নদীনির্ভর নৌকা বা জাহাজের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্র অনেক কমে গিয়েছিল। ফলে আসাম থেকে সিলেট হয়ে কলকাতায় পণ্যসামগ্রী খুব সহজে এবং দ্রুতই আনা-নেওয়া করা যেত। এভাবেই শত শত সিলেটি, যাঁরা দেশি নৌকা দিয়ে পরিবহন ব্যবসা করতেন, তাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। এঁরাই আবার খুব শিগগিরই কলকাতায় গিয়ে সমুদ্রে চলমান জাহাজে নিয়োগ পেয়েছিলেন, যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সচ্ছল কৃষকও। এভাবে তাঁরা নদী থেকে সাগরে পাড়ি জমালেন। ব্রিটিশরা শুরু করল জাহাজের ব্যবসা। তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ নাবিকদের প্রয়োজন পড়েছিল তাঁদের পরিচালনা করার। কলকাতাভিত্তিক একজন লেখক শংকর বলছেন যে বাঙালিদের মধ্যে 'সমুদ্র জয়ের' প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন সিলেটের মানুষ। তিনি বলছেন যে সহজাতভাবেই সিলেটিরা ছিলেন 'সাহসী' এবং তাঁরা বিশ্ব পরিমণ্ডলে সমুদ্রপথে যাত্রার গুণাবলিও দেখিয়েছিলেন। তাঁরা সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনার বিদ্যা আয়ত্ত করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন এবং বিশ্ববাণিজ্যে অংশ নিয়েছিলেন।[২৯] পরে, বিশেষ করে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সিলেটিরা ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। এখনো পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশ-বংশোদ্ভূত ৯০ শতাংশই হলো সিলেটি। একজন অভিবাসী কবি এবং অভিনেত্রী শামীম আজাদ বলছেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এসব সমুদ্রযাত্রীর মধ্যে সম্ভবত একটি বিশেষ ভ্রমণপিপাসু বংশের উপাদান ছিল, যা তাদের এই বিশাল বিশাল সমুদ্র এবং নদী পার হতে তাড়না দিয়েছে।'[৩০]

আসামে ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বাঙালি অভিজাত সম্প্রদায় এটাকে বাংলার সম্প্রসারণ বলেই মনে করত। অপর দিকে, চা আবাদকারীরা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় অর্থের পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং তাদের নিজেদের স্বার্থের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য

একটি বিশেষ ও নিবিড় প্রদেশ তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিল। ক্রমবর্ধমান হারে চা আবাদকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ওখানে কাজের পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রশাসনের সব শাখায় চা-শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এসবের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক খরচও বৃদ্ধি পায় এবং এরই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিয়মকানুন বা বিধিবিধানের খসড়া সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বৃহত্তর আসাম, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় এবং অন্যান্য পাহাড়ি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও চার মিলিয়ন জনসংখ্যাসহ এটি একটি বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়েছিল, তথাপি এর স্বল্প পরিমাণে রাজস্ব পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[৩১] প্রাথমিকভাবে সিলেট এই নতুন প্রদেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন বুঝতে পারল যে আসামের মানচিত্র নতুন করে আঁকতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে এটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং পেশাগত গোষ্ঠীর চাপে এ উদ্যোগ আরও বেশি ত্বরান্বিত হয়েছিল। ফলে ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বরেই নতুন প্রদেশে বাংলার জনবহুল জেলা সিলেটের বাংলাভাষীদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং আসাম প্রদেশে ১ দশমিক ৭ মিলিয়ন মানুষসহ সিলেট অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে সিলেট বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। মূলত নতুন এই প্রদেশ সৃষ্টি করাতে দৃশ্যত চারটি অসম বা বন্ধুর অঞ্চলের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এই বৈষম্যগুলো হলো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আসামি-ভাষী পাঁচটি জেলা যা আসাম অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, এটি দেখতে অনেকটা ত্রিভুজসদৃশ; একই উপত্যকার গোয়ালাপাড়া জেলা, যেখানে আসামি-বাঙালি উভয় সংস্কৃতির দ্বারা আবৃত; পাহাড়ি জেলাসমূহ, যেখানে বিভিন্ন উপভাষী বা আঞ্চলিক ভাষার মানুষ বসবাস করে; সবশেষ সিলেট এবং কাছাড়ের মতো জনবহুল এবং বাংলাভাষী দুটো জেলার অন্তর্ভুক্তকরণ। ঠিক এভাবেই নতুন এ প্রদেশটা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এটি ১৮৭৪ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কোনো আইন পরিষদ ব্যতীতই টিকে থাকল। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝিতে প্রাদেশিক আইন পরিষদ বেশ কার্যকর ছিল, যাতে চা-আবাদকারী ইউরোপীয় এলিটগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের একেবারে শেষ পর্যন্ত তাৎপর্যময় প্রভাব বজায় রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৮৭৪ সালে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির আগে গোয়ালাপাড়া, সিলেট এবং কাছাড় তিনটিই অবিভক্ত বাংলার জনবহুল এবং বাংলাভাষী জেলা ছিল, যার মধ্যে কেবল সিলেট (তাও এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ করিমগঞ্জ মহকুমা কেটে রাখা হয়) ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় ফিরে এসেছিল।[৩২]

আসামের সঙ্গে সিলেটের যুক্ত করার কারণে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে মেঘনার একদিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, সুরমা উপত্যকা এবং আসামের

জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতার কারণে আসামে প্রদেশের অখণ্ডতাই হুমকির কবলে পতিত হয়েছিল। ব্রিটিশরাজের পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠন, চা ব্যবসায়ীদের সার্বক্ষণিক স্বার্থ এবং জনগণের পরবর্তী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে গোটা অঞ্চলটির রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা দরকার। দৃশ্যত, সিলেটকে সব সময়ই বাংলার সঙ্গে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি অব্যাহত ছিল। বাংলার সঙ্গে সিলেটের মানুষের এ একাত্মতা ১৮৭৪ সালে যখন নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, তখন থেকেই জোরালো ভিত্তি পেয়েছিল।[৩৩] সিলেটিরা এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে তাদের জেলাটি আসাম প্রদেশের সঙ্গে একত্রীভূত করার লক্ষ্যে বাংলা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল, যা কখনোই এটিকে অর্থনৈতিকভাবে কোনো সুগম পথ করে দিতে পারেনি। এলিট শ্রেণি—যার অধিকাংশই হিন্দু—তারা প্রথমে সিলেটের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে ছিল, যেহেতু তারা এটিকে তাদের অগ্রসরমাণ বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক 'পশ্চাৎপদ অঞ্চলে' বেঁধে দেওয়ার শামিল হিসেবে বিবেচনা করত। হিন্দু এলিট শ্রেণি কলকাতায় এবং সিলেট থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপামর জনগোষ্ঠীর জনমতকে সরকারের বিরুদ্ধে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টাও করেছিল। যেমন কলকাতার প্রভাবশালী পত্রিকা *হিন্দু পেট্রিয়ট* সিলেটকে নিয়ে বাঙালির হৃদয়ানুভূতিতে অনুরণনের ঝড় তুলতে ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধ এবং সম্পাদকীয় ছাপাত। এ শক্তিশালী প্রচারণার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর সম্পাদক স্বয়ং কে দাস পাল, যিনি তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন যে 'বাংলা প্রদেশের স্বর্ণময়ী অঞ্চল সিলেটকে আসাম প্রদেশ নামক নতুন দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য বলি দেওয়া হচ্ছে।'[৩৪]

১৮৭৪ সালের ১০ আগস্ট হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা সিলেটকে স্থানান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে একটি স্মারকলিপি ভারতের শাসক ভাইসরয়কে প্রদান করেছিলেন।[৩৫] যদিও সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সেই প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে সিলেটে এসেছিলেন এবং এলিট/ধনিক শ্রেণি লোকদের ডেকে প্রতিশ্রুতি দেন যে নতুন প্রশাসনিক আয়োজনে তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ প্রশাসন আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শিক্ষা ও বিচারের বিষয়গুলো যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পরিচালনা করা হবে। নতুন এই প্রদেশের প্রশাসন দুটি প্রধান নীতিকে গ্রহণ করেছিল : প্রথমত, বহিরাগত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চা-শ্রমিকদের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মসৃণভাবে করার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার জেলাগুলো থেকে অভিবাসী বাঙালি কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য সিলেট এবং আসামের কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা। 'আরও বেশি খাদ্য উৎপাদন কর'—এই আদর্শ বাক্য

বা স্লোগানের অধীনে এটি করা হয়েছিল। স্পষ্টতই, ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণি যখন আসামকে নতুন প্রশাসনিক প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল, তখন এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক অথবা সাংস্কৃতিক সংলগ্নতা বুঝতে পারেনি।

যদিও প্রাথমিকভাবে সিলেট এবং কলকাতার হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় নতুন এই প্রদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল, তথাপি পরবর্তী সময়ে খুব শিগগিরই তারা তাদের সেই অবস্থান কিছু কারণে বদলাতে শুরু করেছিল। প্রথমত, তারা গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিল যে সিলেটের শিক্ষা এবং বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হবে বাংলার প্রশাসন থেকে। দ্বিতীয়ত, তারা এটিও লক্ষ করেছিল যে চা-শিল্পের বিকাশ তাদের নতুন প্রদেশে বেশ সুযোগ-সুবিধা করে দিতে পারবে এবং এতে তাদের কল্যাণই বয়ে আনবে। যেমন : যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই চা-শিল্পে কেরানি এবং চা-বাগানে 'ডাক্তার বাবু'র চাকরি পাওয়া যাবে। তৃতীয়ত, চা-শ্রমিকদের খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য সিলেটের চালের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। ফলে সিলেটের অধিকাংশ হিন্দু জমিদার আগে যে দামে বাংলায় চাল রপ্তানি করতে বাধ্য ছিলেন, নতুন পরিস্থিতিতে তাঁরা আরও বেশি দামে আসামে চাল বিক্রির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। বিভিন্ন তথ্যের আলোকে মনে হচ্ছে যে আসামের ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে ও চা-শিল্পের বিভিন্ন কাজে সিলেটি-বাঙালিদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে সঞ্জীব বড়ুয়ার লেখায় দেখা যায় যে ২০ শতকের প্রথম দিকে আসামে বাঙালিরা আইন, মেডিকেল এবং শিক্ষকতা পেশায় আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং রেল ও ডাক কার্যালয়ে কেরানি ও মধ্যবর্তী পদমর্যাদাপূর্ণ পদে চাকরি পেতে শুরু করল। ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে সক্রিয় ও অগ্রসরমাণ প্রদেশ বাংলার অংশ হয়ে সিলেটবাসী আসামের অধিবাসীদের চেয়ে ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনে পেশাজীবী হিসেবে কিছুটা বেশি অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিল, যা তাদের তাৎক্ষণিকভাবে নতুন অঞ্চলে চালু হওয়া বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করার সুবিধা করে দিয়েছিল। বড়ুয়া বলছেন যে 'যেহেতু আসামের আমলাতন্ত্রের অধিকাংশ পদ দখল করেছিল বাঙালিরা এবং তাদের আধিপত্যটা—বিশেষ করে বহু অহমিয়াভাষী শিক্ষিত শ্রেণির আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত—অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[৩৬]

১৮৭০-এর দশকে এভাবেই সিলেট বাংলার বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং ওই অবস্থায়ই তা দীর্ঘ ৩০ বছর অব্যাহত ছিল। ১৯০৫ সালে সিলেটকে আবার বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়। কারণ, ওই বছরই ঢাকাকে রাজধানী করে স্বল্পমেয়াদি পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি প্রদেশ (বাংলাকে ভাগ করার মাধ্যমে) সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৩৭] ১৯১২ সালে বাংলাকে যখন পুনরায় একত্র করা হলো, তখন আসামকে আবার প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হলো,

যেখানে আবারও সিলেট অন্তর্ভুক্ত হলো। ফলে, জেলাটির গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম, হাটবাজার এবং শহর প্রতিবাদে প্রবলভাবে আলোড়িত হচ্ছিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনসংবলিত প্রতিবাদ নিয়ে বিভিন্ন জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রতিবাদকারী জমিদার এবং আইনজীবীরা ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে তাঁদের প্রতিবাদসংবলিত স্মারকলিপি প্রেরণ করেন, যদিও তাঁরা কোনো সফলতার মুখ দেখেননি।[৩৮]

১৯২০ সালে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় *সিলেট রি-ইউনিয়ন লীগ* গঠিত হয়েছিল। এটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এর নিয়োজিত প্রতিনিধিদের উচিত ভাইসরয়ের কাছে প্রতিবাদ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা, যা দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ওই আন্দোলন বেশিদূর অগ্রসর হয়নি, কারণ খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিষয় উদ্ভূত হওয়ায় তা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩৯] ১৯২০-এর দশকে আসাম আইনসভায় সিলেট ও কাছাড় জেলার 'বাংলায় ফিরে যাওয়া' নিয়ে প্রচুর বিতর্কের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়; সেখানে দেখা যায়, হিন্দু এবং মুসলমান অভিজাত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা বাঙালি পরিচয়ের বিষয়গুলোর জন্য যৌথভাবে লড়াই করেছিলেন এবং প্রথম দিকে একটি লক্ষ্যই ছিল, যাতে সিলেটের হিন্দু-মুসলিম উভয়েই বাংলায় ফিরে যাওয়া নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তখন হঠাৎ করে একটি সম্ভাবনা তৈরি হলো যে হয়তো সিলেট তার শিক্ষা ও বিচারের বিষয়ে যে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তা হারাতে পারে। আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও প্রশ্ন ছিল। এসব বিষয়ে হিন্দু-মুসলিম এলিট উভয়ের স্পষ্টতই প্রচুর উদ্বেগ ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সিলেটের বিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী সিলেটকে বাংলার সঙ্গে পুনরায় একত্রীকরণের জন্য মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সিলেটি বাঙালিদের নৃতাত্ত্বিক বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রচলিত সমসাময়িক 'কল্পনা' করায়ত্ত করেছিলেন। ১৯২৪ সালের আগস্টে আসামের আইনসভায় তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন যে :

> পরিবর্তিত ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমার এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে এ প্রশাসন থেকে সিলেটকে স্থানান্তর করে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করাটাই সিলেটি জনপ্রতিনিধিত্বের প্রধান উদ্বেগ। মূলত এটিই আমাদের একমাত্র রাজনীতি...আমি সম্মানিত সদস্যদের একটি করে বুকলেটের প্রতিলিপি সরবরাহ করেছি, যাতে রায় বাহাদুর গিরিশ চন্দ্র নাগ আমাদের মিনতি করে বলেছেন 'বাংলায় ফিরে চল'। এই রায় বাহাদুর ছিলেন আসাম সিভিল সার্ভিস-এর একজন অভিজ্ঞ উঁচুপদস্থ ব্যক্তি। শুধু তা-ই নয়, তিনি আসাম আইনসভার প্রথম অধিবেশনে সিলেটের জনপ্রতিনিধিও ছিলেন...চা আবাদের জন্য ছোট্ট পরিসরে শ্রমিক আমদানি ব্যতীত সিলেটের *প্রায় শতভাগ আদিবাসী সবাই বাংলায় কথা বলে, যারা নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি বংশধরের স্বত্ত্বাধীন এবং তাদের চলন-বলনে, আচার-আচরণে, প্রথা-মূল্যবোধ-চিন্তা এবং ঐতিহ্যে—একই রকম চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেহেতু*

বাংলাদেশে তাদের ভ্রাতৃবর্গ বাঙালি এবং অবিচ্ছেদ্যভাবেই সিলেটিরা তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক এবং রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ [গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে]।[৪০]

আসাম আইনসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে চৌধুরী আরও ঘোষণা করেছিলেন :

> যদি কলকাতা উচ্চআদালতের সুরক্ষা থেকে একজন মানুষও সিলেটকে স্থানান্তর করার চিন্তা করে, তাহলে আমরা সিলেটিরা তার বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। ঐতিহ্যের বন্ধন আমাদের বাঙালিদের ঐতিহ্যের সঙ্গে অটুট রেখেছে... আমি কি পারি অথবা সিলেট থেকে এই আইনসভায় আর কোনো সদস্য কি আছেন, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা হাইকোর্ট থেকে যে সুবিধা পাবেন, যদি সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তা সহ্য করতে? আসামের জন্য যে ব্যয় হবে সিলেটিরা কেন সে খরচ বহন করবে? আমাকে কঠিন নির্ভেজাল সত্যটি বলতে দিন : সিলেটিরা কোন শর্তে সিলেটের পরিবর্তে আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সম্মত হবে? *এটি হলো আসামের ললাটে অনিচ্ছাকৃত ও বিদ্রোহীসুলভ অংশীদারের সঙ্গে জোর করে একত্রীকরণের দুঃখজনক উত্তরাধিকার* [শব্দটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে]।[৪১]

আসামি জনগোষ্ঠীও তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিল এবং তারা এও বুঝতে পেরেছিল যে বাংলাভাষী সিলেটই তাদের সে স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং আসাম থেকে সিলেটকে বাদ দেওয়ার জন্য জোরাহাট *সর্বজনীন সভা* (আসামের একটি সামাজিক সংগঠন) একটি প্রস্তাব পাস করেছিল, যেটি আসামি সংবাদপত্রগুলোর সমর্থনও করেছিল।[৪২] ১৯৩৩ সালে আসাম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনসম্মুখে যুক্তি দিয়েছিলেন, যত দিন পর্যন্ত সিলেট আসামের সঙ্গে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত আসাম তার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও নিজস্ব উচ্চ আদালত নাও পেতে পারে। শুধু তা-ই নয়, আসাম তার নিজ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নও করতে পারবে না।[৪৩]

আসাম ও সিলেটের অভিজাতবর্গের রাজনীতিতে নীতি ও বদলের বিষয়টি ছিল কৌতুকপ্রদ। যেহেতু আসাম এবং সিলেটের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মুসলমানেরা প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্রমেই ক্ষমতাশীল হচ্ছিলেন এবং তাঁদের নেতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যেমন খান বাহাদুর আলাউদ্দিন চৌধুরী, মৌলভি দেওয়ান ওয়াসিল চৌধুরী 'বাংলায় ফিরে যাওয়া' নিয়ে পুরোনো অবস্থান বদলে ফেলেন। তাঁরা সিলেটের বাংলার সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণের বিরুদ্ধে নাটকীয়ভাবে জোরালো বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন এবং জেলাগুলোর মুসলমানেরা এটিকে সমর্থন করবে কি না সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন।[৪৪] একসময়ের কংগ্রেসের নেতা সিলেটের আবুল মতিন চৌধুরী তখন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হয়েছেন। তিনি ১৯২৪ সালে আসামের আইনসভার সদস্যদের কাছে চিঠি লিখে এই ঘোষণা করেন যে সিলেটের মুসলমানেরা বাংলার অংশ হতে চায় না এবং যুক্তি দেন যে একমাত্র যারা এটি চায়, তারা হলো সিলেটি হিন্দু।[৪৫] খান বাহাদুর আলাউদ্দিন চৌধুরী তাঁর অবস্থান বদলের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, 'ইতিমধ্যে আমি আমার বক্তব্যে

স্বীকার করেছি যে আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা ১৯১৮ সালে সিলেটকে বাংলার সঙ্গে পুনরায় একত্রীকরণের স্বপক্ষে ছিলাম কিন্তু আমি আমার মতামত ১৯২০ সালে এসে পরিবর্তন করেছি। ...একজন জ্ঞানী মানুষ মতামত পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু একজন বোকা তা পারে না।'[৪৬]

সারণি : ১

১৯২৪ সালের আগস্টে পুনরায় সিলেটের বাংলায় স্থানান্তরের ওপর আসামের আইন পরিষদের 'হ্যাঁ' ভোট

ক্রমিক নম্বর	নাম	পরিচয়
১	রায় বাহাদুর অমরনাথ রয়	হিন্দু
২	রায় বাহাদুর বিপুন চন্দ্র দেব লস্কর	হিন্দু
৩	রায় সাহিব হার কিশোর চক্রবর্তী	হিন্দু
৪	বাবু ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী	হিন্দু
৫	বাবু গোপেন চন্দ্র লাল চৌধুরী	হিন্দু
৬	মাননীয় রায় বাহাদুর প্রমদ চন্দ্র দত্ত	হিন্দু
৭	বাবু কৃষ্ণ সুন্দর দাম	হিন্দু
৮	বাবু কিশোরচন্দ্র দেব	হিন্দু
৯	বাবু বিরাজ মোহন দত্ত	হিন্দু
১০	শ্রীযুক্ত কমোখরাম বড়ুয়া	হিন্দু
১১	শ্রীযুক্ত কমলাকান্দ দাস	হিন্দু
১২	শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্মা	হিন্দু
১৩	শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বরাহ	হিন্দু
১৪	মি. তারাপ্রসাদ চলিহা	হিন্দু
১৫	শ্রীযুক্ত রোহিনীকান্ত বড়ুয়া	হিন্দু
১৬	শ্রীযুক্ত কোলাধর চলিহা	হিন্দু
১৭	শ্রীযুক্ত সদানন্দ দোয়েরা	হিন্দু
১৮	মৌলভি আবদুল হামিদ	মুসলমান
১৯	মৌলভি দেওয়ান আবদুল রহিম চৌধুরী	মুসলমান
২০	মৌলভি আবদুল হান্নান চৌধুরী	মুসলমান
২১	মৌলভি মোহাম্মাদ মোদাব্বির হোসাইন চৌধুরী	মুসলমান
২২	মৌলভি নাজমুল ইসলাম চৌধুরী	মুসলমান

সূত্র : *আসাম আইন পরিষদের কার্যবিবরণী*, আগস্ট, ১৯২৪ *আসাম গেজেট*, পার্ট ৪, শিলং, ১৯২৪, পৃ. ৬১৯-২০।

সারণি : ২

১৯২৪ সালের আগস্টে পুনরায় সিলেটের বাংলায় স্থানান্তরের ওপর আসামের আইন পরিষদের 'না' ভোট

ক্র. নং	নাম	পরিচয়
১	মাননীয় খান বাহাদুর কুতুবুদ্দিন আহমেদ	মুসলিম
২	মাননীয় মি. জে ই ওয়েবস্টার	ইউরোপবাসী
৩	মি. এ ডব্লিউ বোথাম	ইউরোপবাসী
৪	মি. জে ই সোয়েমস	ইউরোপবাসী
৫	মি. ও এস ই ডেসেনি	ইউরোপবাসী
৬	মি. জে আর কানিংগ্যাম	ইউরোপবাসী
৭	মি. ডব্লিউ সি এস ড্যানডাস	ইউরোপবাসী
৮	শ্রীযুক্ত নীলমণি পোখান	আসামবাসী বা অহমিয়া
৯	মৌলভি দেওয়ান মোহাম্মদ ওয়াসিল চৌধুরী	মুসলিম/আবাদকারী
১০	র‍্যাভ. জে সি ইভেন্স	ইউরোপবাসী/ধর্মযাজক
১১	খান বাহাদুর আবুল ফজল আহাম্মেদ	মুসলিম
১২	র‍্যাভ জেমস মোহন নিকোলাস রায়	দেশীয় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী
১৩	মৌলভি রাশিদ আলী লস্কর	মুসলিম
১৪	খান বাহাদুর আলাউদ্দিন আহাম্মেদ চৌধুরী	মুসলিম
১৫	মাননীয় মৌলভি সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ্	মুসলিম
১৬	মি. ই এস রফেই	ইউরোপবাসী
১৭	মি. এম এইচ ক্লার্কে	ইউরোপবাসী
১৮	মি. ই এ এ জোসেফ	ইউরোপবাসী

সূত্র : *আসাম আইন পরিষদের কার্যবিবরণী*, আগস্ট, ১৯২৪ *আসাম গেজেট*, পার্ট ৪, শিলং, ১৯২৪, পৃ. ৬১৯-২০।

সারণি ১ ও ২ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেখা যাচ্ছে যে সিলেটের স্থানান্তরের ওপর আসামের আইন পরিষদে ভোটের ধরন খুবই কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়। এসব সারণিতে বিন্যস্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে ১০ জন ইউরোপবাসী কর্মকর্তা এবং চা আবাদকারী, একজন স্থানীয় খ্রিষ্টান, ছয়জন মুসলিম, একজন অহমিয়া নেতা সিলেটকে পুনরায় বাংলায় স্থানান্তরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, যেখানে সব হিন্দুই এর পক্ষে বা অনুকূলে ভোট দিয়েছিলেন। যা হোক, সিলেটের মুসলিম নেতারা বিষয়গুলোর ওপর বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে পাঁচজন মুসলিম সদস্য বাংলার সঙ্গে সিলেটকে যুক্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, সেখানে ছয়জন এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে মুসলিম সদস্যদের

ভোটেই চৌধুরীর প্রস্তাব পাস হয়। একই রকমের আরেকটি প্রস্তাব ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে সিলেটের চারজন মুসলমান সদস্যের সহায়তায় আসামের আইনসভায় পাস হয়েছিল।[৪৭] যা হোক, খুব শিগগিরই হিন্দু রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে বাংলায় ফিরে আসা আন্দোলনের প্রতি সিলেটের মুসলিম রাজনীতিবিদেরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর কারণ ছিল প্রধানত দুই রকমের—প্রথমত, আসামের রাজনীতিতে মোহাম্মদ সাদুল্লাহ্‌র আবির্ভাব, যিনি আসামের একজন অভিজাত মুসলিম ছিলেন।[৪৮] তিনি ইউরোপবাসী চা উৎপাদনকারী এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায় আসামের আইন পরিষদকেন্দ্রিক রাজনীতিতে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি সরাসরি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সিলেটের উচিত আসামের সঙ্গেই থাকা। তিনি এও বলেছিলেন যে 'যদি আমরা আসাম থেকে সিলেটকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিই তাহলে কিসের ভিত্তি বা নীতিমালায় আমরা কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে [বাংলার সাবেক দুটি জেলা] চলে যাওয়া থেকে বন্ধ করতে পারব?'[৪৯] ১৯২৫ সালের জুলাইয়ে সাদুল্লাহ্ সিলেট পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে দেশটিতে মতামত বিভক্ত। তিনি পরের মাসেই সরকারের কাছে সরেজমিনে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে গেলে যা বলা যায় তা হলো সিলেটের স্থানান্তর দুই দিকেই। অর্থাৎ আসাম ও সিলেটের মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দীর্ঘায়িত করবে।'[৫০] সুতরাং বলা যায়, সাদুল্লাহ্‌র আগ্রহ ছিল নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখা। পরবর্তী দশকগুলোতে তিনি 'ধর্মীয় পরিচয়' নিয়ে অত্যন্ত সুচতুরভাবে খেলা করেছিলেন। অনেক অভিজাত মুসলিমও বিশ্বাস করতেন যে আসামের সঙ্গে সিলেটের অন্তর্ভুক্তকরণই ভবিষ্যতে এটিকে মুসলিম-আধিপত্যবাদী প্রদেশ থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে। যেমন : ১৯২৬ সালে আসাম থেকে সিলেটের পৃথক্‌করণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মৌলভি দেওয়ান ওয়াসিল চৌধুরী আইনসভায় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে নতুন এই প্রদেশ থেকে সিলেটিরা উপকার নিতে পারবে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আসামে সরকারি চাকরির পদগুলো বাঙালিদের দ্বারাই পূর্ণ ছিল কিন্তু এখন সিলেটিরা তাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে সিলেটিদের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো মুছে যায়নি এবং হিন্দু-মুসলিম বিভাজন বৃদ্ধির সঙ্গে সেই দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই আবৃত্ত হয়ে যায়নি। ওয়াসিল চৌধুরী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিকভাবেই সিলেট আসামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওই সময়ই কিছু মুসলিম রাজনীতিক প্রথম সিলেটের মুসলমানদের বোঝাতে 'সিলেটি' শব্দের উদ্ভাবন করেছিলেন। পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর 'পাকিস্তান' পরিকল্পনায় আসামকেও যুক্ত করেছিলেন। তিনি আসামের মুসলিম লীগের সম্পাদক মাহমুদ আলীর কাছে বলেছিলেন, 'যুবক, আমি তোমাকে

বলছি, আসাম ব্যতীত কোনো কিছুই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'[৫১] সুতরাং, মুসলিম রাজনীতিবিদদের সমর্থন হারিয়ে আসামের আইনসভায় সিলেটের 'বাংলায় ফিরে আসো' প্রস্তাব তার ভিত্তি হারিয়েছিল। সিলেটের মুসলিম রাজনীতিবিদ যেমন : ওয়াসিল চৌধুরী, মাহমুদ আলী, আবদুল মতিন চৌধুরী আসামকে তাঁদের 'ভবিষ্যৎ মুক্ত ভূখণ্ড' হিসেবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৪০ সালে শুরুর দিকে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে প্রদেশে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যা হোক, ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রধান উদ্বেগ ছিল আসামকে 'পাকিস্তান পরিকল্পনা'র সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা।[৫২]

১৯৩০-এর দশকে অনেক অহমিয়া রাজনীতিবিদ বিষয়গুলোকে আরও বেশি জটিল করে তোলেন, যখন তাঁরা 'সিলেট থেকে মুক্তি' পেতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়টিকে অতি উচ্চপর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেন। কারণ, নতুন উদ্ভাবিত এই অহমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের 'ভূখণ্ড' নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল, যা ছিল (ক) অহমিয়া জন্য আসাম তৈরি করা এবং (খ) বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি পাওয়া। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনের প্রাক্কালে আসামের সদস্য চন্দ্রধর বড়ুয়া তাঁর দাখিল করা বিবরণে সিলেটকে পৃথক করে ভাষার ওপর ভিত্তি করে আসামের ভূখণ্ড পুনরায় বণ্টন করার জন্য শক্তিশালী যুক্তি দিয়েছিলেন।[৫৩] আসামের সরকারও ১৯৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আসাম থেকে সিলেটকে বাংলায় স্থানান্তরের বিষয়ে পুনঃসংস্কার কার্যালয়ে (রিফর্ম অফিস) একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছিল :

> আসাম থেকে সিলেটকে বাংলায় স্থানান্তরের বিষয়ের ওপর চলমান উত্তেজনা সম্পর্কে আসাম সরকার বিবেচনা করছে একটি প্রশ্ন, যা এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ সরকারের সামনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। আসাম ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন, যাতে আসাম সরকার ভারতের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূল কথা হচ্ছে, এই সরকারের মতে বিষয়টি এ প্রদেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচনাযোগ্য।[৫৪]

লন্ডনে ওই সময় রিচার্ড অস্টিন বাটলার[৫৫] ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিবের অধীনে কাজ করছিলেন। বাংলার সঙ্গে সিলেটের পুনরায় একত্রীকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। অবশ্য তিনি সেসব বিষয় আমলাতন্ত্রের দ্বারাই জানতে পেরেছিলেন। ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বাটলার সাংসদ স্যার ওয়াল্টার স্মাইলসহ চন্দ্রধর বড়ুয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।[৫৬] সাক্ষাৎকারটি মূলত বাংলার সঙ্গে সিলেটের একত্রীকরণের প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেই নেওয়া হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, সাক্ষাৎকারে আসাম থেকে সিলেটকে বাদ দেওয়ার যে দাবি অহমিয়া এলিটরা করেছিল, সে বিষয়কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাটলার উল্লেখ করেছিলেন :

> তিনি (বড়ুয়া) বললেন যে আসামে একটি বিরাট অনুভূতি কাজ করেছে যে সিলেটিদের কারণে আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার আশা পূরণ হচ্ছে না। কারণ, সিলেটিরা এসবের কোনোটিই চায়নি, যেহেতু তারা দেখতে পেয়েছিল যে প্রতিবেশী বাংলা প্রদেশে এসব পর্যাপ্ত সংখ্যায়ই রয়েছে... আমি তাকে সিলেটকে বাংলায় স্থানান্তরের বিষয়ে নতুন কোনো বিল বা আইন প্রণয়ন হতে পারে এমন কোনো আশার বাণীই শোনাতে পারছিলাম না।[৫৭]

ওই বৈঠকে বাটলার এবং স্মাইল বড়ুয়াকে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কেন ব্রিটিশ প্রশাসন বাংলার সঙ্গে সিলেটকে স্থানান্তরের পরিবর্তে আসামের সঙ্গে রাখতে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। বড়ুয়ার উদ্দেশে বাটলারের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল : 'এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। এমনকি সেই মুসলমানেরাও, যাঁরা সিলেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাও সিলেটের স্থানাস্তরের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছে।'[৫৮] মনে হয়েছিল যে আসামের সীমান্ত, বিশেষ করে আসামের সঙ্গে সিলেটের একত্রীকরণ মূলত চা-আবাদকারীদের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক সুবিধাসমূহের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। আসাম সরকারের পক্ষে আর্থার উইলিয়াম বোথাম একটি গোপন চিঠির মাধ্যমে সরকারি অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নিচে তা তুলে ধরা হলো :

> এমনকি বর্তমানে আসামের আংশিক বিভক্তিও প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক জটিলতা তৈরি করতে পারে এবং যদি এর ভূখণ্ড বা জনসংখ্যা বস্তুগতভাবে কাটছাঁট করা হয়, তাহলে এটি অনিশ্চিত যে সিলেট ব্যতীত এ প্রদেশ তার মর্যাদা ধরে রাখতে পারবে কি না।[৫৯]

যদিও বাংলার সঙ্গে সিলেটের স্থানান্তরের বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আসাম, কলকাতা, দিল্লি এবং লন্ডনে বিভিন্ন পক্ষের মতামত শুনেছিল, তারপরও সরকারের মোটামুটি অবস্থান অপরিবর্তিতই ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের অনেকেই চা আবাদকারী হিসেবে একই পরিবারের স্বত্বাধীন ছিল এবং এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেরা চা-ব্যবসায় গুপ্তভাবে বিনিয়োগও করেছিল।[৬০] ১৯ শতকের শেষের দিকে চা আবাদকারীরা ব্রিটিশ ভারতে শক্তিশালী সুবিধাবাদী বা লবিগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ওই শতাব্দীর শেষদিকে আসামের ছোট লাট স্যার হেনরি কটন শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে মোটামুটি সন্তোষজনক একটি সংস্কারের পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যা হোক, চা আবাদকারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে এই ভদ্রবেশী উদ্যোগও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কটনের আত্মজীবনী থেকে আবাদকারীদের প্রভাব ও ক্ষমতা উপলব্ধি করা যেতে পারে :

> একটি ক্ষমতাবানগোষ্ঠী হিসেবে চা আবাদকারী এবং চা-ব্যবসায়ীরা সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের প্রতি এত অসহিষ্ণু হয়েছিল যে তারা আসামের সরকারি কর্মকর্তাদের যেকোনো নির্দেশকে মর্যাদা খর্বকারী বিষয় হিসেবে দেখত এবং চা-শ্রমিক নিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোনো কোনো পদক্ষেপ নিলেও অসম্মানিত বোধ করত। যার ফলে সরকারি কর্মকর্তারা এদের একেবারেই শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ওই সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রশাসনের নিয়ম ও আইনকানুন অমান্য করত।[৬১]

স্যার হেনরি বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গেও চা আবাদকারীরা বিদ্বেষ এবং প্রতারণামূলক আচরণ করত, যদিও তিনি একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন, যে পরিবারটি ভারতে পাঁচ-পাঁচটি প্রজন্ম পর্যন্ত আমলা হিসেবে সেবা দিয়েছিল। স্যার হেনরির বক্তব্য-বিবৃতির চেয়ে ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আসামের শ্রমিকদের কল্যাণ-বিষয়ক বক্তব্য-বিবৃতিগুলো অধিক শক্তিশালী ছিল এবং এভাবেই তাদের মধ্যে দাপ্তরিক যোগাযোগ হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও লর্ড কার্জনকে চা আবাদকারীদের বিরোধিতার মুখে পিছু হটতে হয়েছিল। স্যার হেনরির মতে, 'তিনি (কার্জন) তাঁর গা বাঁচিয়ে চলছিলেন আর আমাকে নেকড়েগুলোর সামনে *ঠেলে* দিয়ে বিপদে ফেলেছিলেন।'[৬২] ফলে স্যার হেনরি বাংলার লে. গর্ভনরের চাকরিতে উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে দ্রুত অবসরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এহেন চা আবাদকারীরা যখন নিজেদের স্বার্থে সিলেটের মতো একটি অগ্রসর অঞ্চলকে আসামে ধরে রাখতে চায়, তখন বাংলার সঙ্গে সিলেটের পুনরেকত্রীকরণ অসম্ভব এক বিষয়ই ছিল।

বিভিন্ন পক্ষের দাবির মুখে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমতের ধারণা পেতে নিজস্ব একটি জরিপও পরিচালনা করেছিল। সরকারের নির্দেশনায় ১৯২৫ সালের জুনে সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ক্রিস্টোফার গিমসন তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে বহু মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সিলেটের জনগণের প্রকৃত ইচ্ছাটা কী সে বিষয়ে বলা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তিনি লিখেছিলেন যে 'মূলত ৭৫ শতাংশ মানুষই কৃষি পেশায় নিয়োজিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি জানাটা অসম্ভব।'[৬৩] তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মানুষ এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল এবং অধিকাংশ মুসলিম চেয়েছিল আসামের সঙ্গেই থাকতে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে এটিও বিস্ময়কর ছিল না যে যাঁরা ব্যবস্থাপক হিসেবে চা-বাগানে কাজ করতেন, তাঁদেরও 'সিলেটের আসামের সঙ্গে থাকাটাই অধিক পছন্দের ছিল।'[৬৪] এভাবে দাপ্তরিক জরিপের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ শাসকেরা অত্যন্ত সচেতনভাবে আসামের ঔপনিবেশিক সীমানাগুলোর নকশা করেছিল, যাতে করে সিলেট একটি মূল উপাদান হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালে *আসাম রিভিউ*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে এ বিষয়ে চা আবাদকারীরা সব সময়ই সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছে।[৬৫] ১৮৭০-এর দশকে প্রধানত হিন্দু এলিটদের নেতৃত্বে পরিচালিত আবেদন-নিবেদন ও অবিশ্রান্ত লবিং সত্ত্বেও সিলেটকে আসামের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯১০, ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে কখনো আসামের আইনসভায় তুমুল বিতর্ক ও প্রস্তাব পাস করে আবার নানা রকম আন্দোলন করেও সিলেটের বহু বাঙালিদের—যার অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এলিট—দৃঢ়সংকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সিলেট বাংলায় ফিরে আসতে পারল না। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে এদের অনেকেই আবার ১৯৪৭ সালে আসামে থাকার জন্য প্রচারণা চালালেন। ইতিহাসের এই কৌতুকপদ অথচ নিদারুণ রসিকতার চিত্র বিভিন্ন মহাদেশের মহাফেজখানাগুলোর হাজার হাজার দলিলপত্রে লুকিয়ে আছে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে তার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হবে।

মনোজগতে সাম্প্রদায়িকতা (কমিউনালিজম) এবং সিলেটের গণভোটে 'স্ববিরোধিতার মুখোশ'

স্পষ্টত, ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত সিলেটে আন্তসাম্প্রদায়িক সম্পর্কটি অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। কারণ, শাহজালাল এবং শ্রী চৈতন্যের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ওই অঞ্চলের মানুষের সমন্বিত মনস্তত্ত্বের ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করেছিল, যা তাদের উদার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। অঞ্চলটির আধ্যাত্মিক বা মরমি গানে সেসব উদারতা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে, যা এই সীমান্ত সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া থেকেই সৃষ্ট।[৬৬] এই শক্তিশালী প্রীতিকর সংস্কৃতিটা ধীরে ধীরে মলিন হতে শুরু করে, যখন ১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে সিলেটের এলিট শ্রেণি ক্রমেই বিরোধমূলক অবস্থান গ্রহণ করে। এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে, সাম্প্রদায়িক অনুভূতিগুলো হিন্দু ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের দ্বারাও প্রভাবিত হচ্ছিল, যারা তাদের কোম্পানির নাম সাম্প্রদায়িকভাবে নামকরণ করতে শুরু করেছিল—যদিও শুরুতে প্রবণতাটা ছিল অসাম্প্রদায়িকই। যেমন : ১৯১৯ সালে কিছু উদ্যোক্তা তাঁদের কোম্পানির নামকরণ করেছিলেন 'হিন্দু-মুসলিম চা কোম্পানি'। পরে, অর্থাৎ ১৯২০-এর দশকে হিন্দু ও মুসলিম ধনিক শ্রেণি তাদের কোম্পানিগুলোকে 'ধর্মীয়' নামে নিবন্ধিত করেছিল। যেমন 'বীণাপাণি', 'জয়-তারা' এবং 'দারু-সালাম' ইত্যাদি।[৬৭]

সিলেটের গণভোটের ফলে আসাম এবং পূর্ব বাংলার সীমান্তের ওপর একটি নতুন মানচিত্র আঁকাটা ছিল অঞ্চলটির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। সিলেটের জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল মুসলিম এবং মুসলিম লীগ সক্রিয়ভাবেই সিলেটকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রচারাভিযান চালিয়েছিল। একই সঙ্গে কংগ্রেসের সিলেট শাখা সক্রিয়ভাবে প্রচারাভিযান চালিয়েছিল, যাতে সিলেট আসামের সঙ্গে থাকে। সিলেটের গণভোট ছিল এমন এক 'মহা-ঘটনা', যেখানে সবাই কমবেশি জড়িয়ে পড়েছিল—তা কংগ্রেসই হোক আর মুসলিম লীগই হোক, কমিউনিস্ট হোক, অথবা ভারতীয় পন্থী *মৌলভিই* হোক, কিংবা 'পাকিস্তানপন্থী' *দলিত*, সবাই এবং অবশেষে ব্রিটিশরাও সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে সিলেটের

জনসংখ্যাকে নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হয়েছিল : মুসলিম ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ, বর্ণ হিন্দু ২৫ দশমিক ১ শতাংশ, নিম্নবর্ণ হিন্দু বা *দলিত* ১১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র জাতি ২ দশমিক ২ শতাংশ। যা হোক, সিলেট জেলার জন্য আসাম আইনসভায় ভোটারদের নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা হয়েছিল : মুসলিম ৩ লাখ ১১ হাজার ৭০৭ জন এবং সাধারণ ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮০৮ জন।[৬৮] যদিও সিলেটের মোট জনসংখ্যার ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল মুসলিম, তথাপি জেলাটির মোট ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মাত্র ৫৪ দশমিক ২৭ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব ছিল। সুতরাং, ১৯৪৭ সালের জুনে লিয়াকত আলী খান তাঁর এক চিঠিতে মাউন্টব্যাটেনকে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের ভোট তাঁদের প্রকৃত শক্তিকে প্রতিফলিত করেনি। এর প্রতিকার করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বাদ পড়া মুসলমানদের নতুন করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। চা-শ্রমিকদের প্রশ্নে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, আমি অনুমান করছি যে বিশেষ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমণ্ডলী যেমন চা-শ্রমিক (ভূমিপুত্র না হওয়ায়), চা আবাদকারী, বণিক সংঘ ইত্যাদি গণভোটে অংশ নিতে পারছেন না। ১৯৪৭ সালের ২৫ জুন মাউন্টব্যাটেন তাঁকে ফিরতি চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'তার প্রথম পরামর্শ গ্রহণ করা যাচ্ছে না (বাদ পড়া মুসলমানদের নতুন করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা)। কারণ, এত সময় তাঁর হাতে নেই। ফলে, বিদ্যমান নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতেই সিলেটের গণভোট অনুষ্ঠিত হবে'।[৬৯] তবে মাউন্টব্যাটেন লিয়াকত আলীর দ্বিতীয় পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, যাতে করে বিশেষ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীরা—চা-শ্রমিক এবং চা আবাদকারীরা (ভূমিপুত্র না হওয়ায়) সিলেটের গণভোটে অংশ নিতে পারবেন না।

চা-শ্রমিকের বিষয়টি হঠাৎ করেই আলোচনার টেবিলে আনা হয়েছিল। মজার বিষয় হলো, তাঁরা স্থানীয় শ্রমিক ছিলেন না; তাঁদের প্রায় সবাই ছোট নাগপুর উপত্যকা এবং সাঁওতাল পরগনা থেকে নতুন সৃষ্ট আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই আন্তভূমি শ্রমিক অভিবাসন সিলেট ও আসাম প্রদেশের অর্থনৈতিক আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং তা ১৯৪০-এর দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান ছিল।[৭০] ১৮৭৬ সালে অভিবাসন-বিষয়ক অধ্যক্ষ (সুপারিনটেনডেন্ট) জে জি গ্র্যান্ট লিখেছিলেন যে পশ্চিম বাংলা এবং ছোট নাগপুর থেকে চা আবাদকারী জেলাগুলোর জন্য শ্রমিক সরবরাহ করা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে ওসব অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল এবং কয়েকবারই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ১৮৭০, ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে চুক্তিকারী ও তাদের উপপ্রতিনিধিদের যেমন *আরকাটি* (দেশীয় নিয়োগকারী) মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

যদিও বাগানের সর্দারদের (শ্রমিকনেতারা) দ্বারা নিয়োগপ্রক্রিয়া স্বাধীনভাবে হয়েছিল কিন্তু বিশালসংখ্যক শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছিল তাড়াহুড়ো করে। চা আবাদের সবচেয়ে ভালো বছরগুলোতে, বিশেষ করে ১৮৯০-এর দশকে বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেমন : জেমস ফিনলে, অ্যান্দ্রে ইয়েলে, অক্টাভিয়াস স্টিল এবং ডানকান ব্রাদার্স তাদের নিজস্ব নিয়োগ সংস্থা খুলেছিল। প্রধান কর্মচারী হিসেবে বাগানের সর্দারদেরও অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল, যার অর্ধেক অনুমতিপত্র উপচুক্তিকারী যেমন *আরকাটি* এবং *সর্দার* নিয়োগ অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। বাংলার অভিবাসন বিভাগের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে জেমস ফিনলে সিলেটের সবচেয়ে বড় চা কোম্পানি হিসেবে অনেক চা-বাগান পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা ১৮৯০ সালে শ্রমিক নিয়োগের জন্য সবচেয়ে বেশি অনুমতিপত্র পেয়েছিলেন।[৭১] যেমন সে সময় জেমস ফিনলে কোম্পানির ১৬টি অনুমতিপত্র ছিল, যেগুলো নিম্নোক্ত অঞ্চলে শ্রমিক নিয়োগের জন্য দেওয়া হয়েছিল : সিংভুম, মানভুম, দুমকো, হাজারীবাগ, গিরিদা, গেই, পাটনা, রাজমহল, সাহেবগংগ, গোবিন্দ্রপুর, অ্যারেই, রানিগঞ্জ, মেহিজাম, বর্ধমান, বীরভূম, লোহারডুগা, বাকুরা, নদীয়া, পঞ্চমবু, চব্বিশ পরগনা, মুংগের, ভাগলপুর ও মোজাফফরপুর। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক সভায় বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন যে গত কয়েক বছর যাবৎ সাঁওতাল পরগনা জেলাটি 'চা-শ্রমিক' সংগ্রহের এক উর্বর ভূমি হিসেবে পরিণত হয়েছে।[৭২] অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসামে শ্রমিক অভিবাসনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী একটি বিষয় হিসেবে সংঘটিত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত রেল যোগাযোগ চা-বাগানগুলোতে চা-শ্রমিকদের পরিবারসহ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি বিশাল ভূমিকা রেখেছিল।

এই ঐতিহাসিক বক্ররেখা ঔপনিবেশিক-উত্তর অনেক 'হিন্দু' তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহকে ভুলভাবে চিত্রিত করছেন। অর্থাৎ এঁরা বাস্তবে যা ঘটেছিল, তার বিকৃত বিবরণ বা বক্তব্য 'অতি-জাতীয়তাবাদী' মোড়কে বর্তমানে উপস্থাপন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীতে, ১৯৯৮ সালের ২১ আগস্ট, সিলেটের গণভোটের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসন্ধানের উদ্দেশে দক্ষিণ আসামের *ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির* পক্ষ থেকে শিলচরে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এতে একজন অংশগ্রহণকারী, জন্মজিৎ রায় সিলেটের চা-শ্রমিকের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। কারণ, রায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে :

> ভূমিপুত্র না হওয়ার অজুহাতে ১৯৪৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনে চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দেড় লাখ হিন্দু ভোটারের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল বা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। যদি তাদের ভোটাধিকারের অনুমতি দেওয়া হতো এবং শুধু যদি ৪০

শতাংশকে এ সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে ভোটের ফলাফলের মোড় ঘুরে যেত। তারা নির্বাচনের মাত্রাটাই পরিবর্তন করে ফেলতে পারত। সুতরাং তথাকথিত সিলেটের গণভোট চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[৭৩]

জন্মজিৎ রায়ের এই কথা সঠিক নয়। কারণ, প্রথমত, সব চা-শ্রমিক 'হিন্দু' ছিলেন না। অনেকেই ছিলেন সর্বপ্রাণবাদ এবং আদিবাসী ধর্মীয় প্রথার অনুসারী, যাঁদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের ধর্মের খুব কমই সংযোগ ছিল। সরকারি নথিপত্র থেকে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ভোটার তালিকায় ১১ হাজার ৪৪৯ জন চা-শ্রমিক ভোটার ছিলেন। ওই বছর সিলেটে একটি শ্রমিক নির্বাচনী এলাকা অর্থাৎ শ্রীমঙ্গল থেকে সর্দার জীবন সাঁওতাল আসামের আইন পরিষদের নির্বাচনে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৭৪] স্পষ্টতই, শ্রমিকদের মধ্যে চা-শ্রমিকদেরই বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ভূমিপুত্র না হওয়ায় চা-শ্রমিক ভোটাররা সিলেটের গণভোটে অংশ নিতে পারেননি, তবে গণভোটে সিলেট পূর্ব বাংলায় যুক্ত হবে; সে জন্য ভোট পড়েছিল পাঁচ গুণ বেশি অর্থাৎ ৫৫ হাজার। যার অর্থ দাঁড়ায়, চা-শ্রমিক ভোটাররা সবাই সুযোগ পেলেও ফলাফলের কোনো হেরফের হতো না। যা হোক, সরকারি একটি প্রতিবেদনে সমসাময়িক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়েছে এভাবে :

> এ ক্ষেত্রে শ্রীমঙ্গল চা-বাগান শ্রমিক নির্বাচনী এলাকার অবস্থানটি কোনো না কোনোভাবে ভিন্ন। পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত শর্ত ছিল এই যে স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে ভোটারদের যোগ্যতাসম্পন্ন চা-বাগানে কমপক্ষে ১৮০ দিনের বেশি কাজ করতে হবে। এভাবে তারা জেলাটিতে চলমান জনসংখ্যায় তেমন কোনো ঝুঁকি ছাড়া প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। *এ ছাড়া এ বিষয়ে তেমন জোরালো কোনো কারণ নেই, যাতে চা-শ্রমিকদের সিলেটের গণভোটে বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত বলে মনে করেছে, যেখানে অন্য শ্রমিকদের যেমন শিল্প শ্রমিকদের বা কৃষি শ্রমিকেরাও সে সুবিধা পায়নি। আমরা এখানে সাধারণ কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছি যে গণভোটের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না* [শব্দটিতে জোর দেওয়া হলো]।[৭৫]

আইন অনুযায়ী, কৃষকদের মধ্যে একমাত্র তারাই ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য, যারা সরকারকে ৯ আনা করে খাজনা দিতে পারত।[৭৬] দরিদ্র কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক যেমন *নানকার*[৭৭] অথবা ছাতক সিমেন্ট কারখানার শিল্প-শ্রমিকেরা এই মানদণ্ড পূর্ণ করতে পারেনি এবং ভোটের অধিকারও পায়নি। অন্যদিকে, চা-শ্রমিকদের ভোটার হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যও ছিল। কারণ, তারা ছিল চা-বাগানে স্থায়ী কর্মচারী। সে মোতাবেক ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে স্থায়ীভাবে কর্মরত সব চা-শ্রমিক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিল। সুতরাং চা-শ্রমিকদের ভোট দেওয়ার বিষয়ে যেসব বিতর্ক তা নিঃসন্দেহে বর্তমানের 'অতি-জাতীয়তাবাদী' কল্পনা থেকে উৎপাদিত। এমনকি কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরাও এসব ফাঁকা গল্প তাঁদের আত্মজীবনীতে লিখে যাচ্ছেন।[৭৮]

বিভাজনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিলেটে গণভোটের আহ্বান করেছিল এ কারণে যে জেলাটি পূর্ব বাংলায় (১৯৫৫ পর্যন্ত নাম পূর্ব বাংলাই ছিল, এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান) নাকি আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ১৯৪৭ সালের জুনের ৩ তারিখে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল, যা নিম্নরূপ :

> একটি দাবি রয়েছে যে বাংলা বিভাজনের ঘটনায় সিলেটের উচিত বাংলার মুসলিম অংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা... সিলেটে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে... যদি এই গণেভোটের ফলাফল পূর্ব বাংলার সংযুক্ত থাকার বিষয়ে অনুকূলে পাওয়া যায়, তাহলে পাঞ্জাব ও বাংলার ন্যায় অনুরূপ একটি সীমান্ত কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন যাতে সিলেট ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো চিহ্নিত করবে এবং সেগুলো পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর করা হবে।[৭৯]

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের আসামভাষী নেতাদের বাংলাভাষী সিলেটের প্রতি খুব কমই আগ্রহ ছিল। অমলেন্দু গুহ যুক্তি দিচ্ছেন যে, গণভোটের অন্য আরেকটি কারণ ছিল আসামভাষী নেতৃত্ব 'সিলেট থেকে মুক্তি পাওয়া'র বিষয়ে বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং ভাষার দিক থেকে 'সমজাতীয়' প্রদেশ তৈরি করতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে যখন গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একধরনের স্বস্তির অনুভূতি লক্ষ করা গিয়েছিল।[৮০] অন্যদিকে, প্রকাশ্যে সিলেট জেলা কংগ্রেস প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সিলেট জেলাকে আসামের সঙ্গে রাখার জন্য। গণভোটে হেরে যাওয়ার পর তারা সীমান্ত কমিশনের কাছে কার্যকর প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলাটির কিছু অংশ রক্ষা বা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য, নেতৃত্বের প্রশ্নে মুসলিম লীগও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক পক্ষে ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্, অন্যদিকে ছিলেন মাওলানা ভাসানী। দুজন প্রভাবশালী সিলেটি রাজনীতিবিদ, মাহমুদ আলী ও মতিন চৌধুরী ভাসানীকে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং গণভোটের সময় দেখা গিয়েছিল যে তাঁরা মুসলিম সমর্থন অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন। প্রশিক্ষিত লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে 'হিন্দুত্ববাদী' অনলবর্ষী রাজনীতিবিদ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি হিন্দু মহাসভা থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠিয়েছিলেন সিলেটকে আসামের সঙ্গে একত্রীকরণের সমর্থনে হিন্দুদের সমবেত করার জন্য। 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গাফফার খান পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকে বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এবং তিনি 'লাল শার্ট' হিসেবে পরিচিত অনেক স্বেচ্ছাসেবককে সিলেটে পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার জন্য।[৮১] এভাবে সব ধরনের দ্বন্দ্বমূলক কর্মতৎপরতা ও পরস্পরবিরোধী পক্ষগুলোর চলা তর্ক-বিতর্ক গণভোটকে বাদ-প্রতিবাদের একটি উত্তপ্ত বিষয় করে তুলেছিল। কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদী নেতা চঞ্চল শর্মার আকর্ষণীয় আত্মজীবনীতে হিন্দু-মুসলিমদের বিভাজনের একটি চিত্র

পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, কোনো মধ্যবিত্ত বা উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউই সিলেটকে পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রীকরণের পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়নি বা সমর্থন করেনি। এমনকি কমিউনিস্ট নেতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও মুসলিম নানকারসহ অন্যান্য মানুষকে পাকিস্তানের সঙ্গে সিলেটের সংযুক্তির বিরুদ্ধে সমবেত করার চেষ্টা করেছিল। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছিলেন যে স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতারাও মুসলিম লীগের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু গণভোটের সময় সে বন্ধন ভেঙে গিয়েছিল।[৮২] এই যুক্তিতে কেউ সন্দেহ করতেই পারে, যেহেতু প্রায় সব কমিউনিস্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং অনেকেই হবিগঞ্জের ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত প্রভাবশালী বেজুরা[৮৩] গ্রাম থেকে এসেছিল, ফলে তাদের মনের গহিন কোণে 'হিন্দুত্ববাদী' প্রচারণার প্রতি একধরনের সহানুভূতি ছিল। একসময় সিলেটের কংগ্রেস নেতারা সিলেটকে বাংলায় ফেরত নিয়ে আসতে অনেক আন্দোলন করেছেন, কিন্তু এখন তাঁরা অবস্থান বদল করে আসামে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে একটি 'যৌথ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা চঞ্চল শর্মাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল। শর্মা তাঁদের কৌশল ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

> আমাদের 'যৌথ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' সিলেটে একটি মিছিলের আয়োজন করেছিল যেটি শহরের বাইরেও কুচকাওয়াজ করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু জনগোষ্ঠীও ব্যাপক হারে এ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তেমন কেউই ছিল না। আমরা গুণকীর্তন করছিলাম, 'ভেঙে দিও না সোনালী সিলেট এবং আসাম ছেড়ে ভঙ্গুর বাংলায় যেও না'। আমাদের কৌশলটা কিছু মুসলমানকে ভারতের পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করা, কিন্তু তারপরও আমরা ব্যর্থ হয়েছি...হিন্দুরা ভোট দিয়েছিল ভারতের পক্ষে এবং মুসলমানরা ভোট দিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে।[৮৪]

শর্মার কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়, অনেক মুসলিম—যাদের মধ্যে অভিজাত ও মাওলানারাও ছিলেন—সেই সময় ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। পক্ষান্তরে উচ্চ বর্ণ থেকে উঠে আসা কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের পেছনে সারি বেঁধে দলবদ্ধ হলেও নিম্নবর্ণের হিন্দু বা দলিতদের একটি বিশাল অংশই মুসলিম লীগের অনুকূলে ছিল। বিশেষ করে, পূর্ব বাংলার দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সিলেটের দলিতদের ওপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে জিন্নাহ তাঁর বক্তব্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে লীগই দলিতদের অধিকারের সুরক্ষা দেবে।[৮৫] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৪৭ সালের ২ জুলাই মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন আইনমন্ত্রী হিসেবে সিলেট পরিদর্শন করে চা শ্রমিকদের এবং কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ড-সম্পর্কিত একটি টেলিগ্রাম মাউন্টব্যাটেনকে পাঠিয়েছিলেন :

> গতকাল সিলেটে পৌঁছেছিলাম। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে চা-বাগান শ্রমিকেরা আমাকে উত্তেজিত করেছিল। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা কুলাউড়া ও সিলেটের মধ্যে ভ্রমণ করার সময় দক্ষিণবাগ চা-বাগানের শ্রমিকদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল এবং অনেকেই লাঠি-তিরের আঘাতে আহত হয়েছিল। সিলেট ও কুলাউড়ার ৩৮ মাইল দূরত্বের মাঝেই ওইসব শ্রমিক ২১ বার ট্রেনটি থামিয়ে দিয়েছিল। চা-শ্রমিক ও কংগ্রেস কর্তৃক সৃষ্ট সহিংসতায় মুসলিমরা আতঙ্কিত। তারা সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে ইউরোপীয়দের অথবা সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলিমকে মোতায়েনের অনুরোধ করছিল। এ বিষয়ে আমি আপনার দ্রুত মনোযোগ প্রত্যাশা করছি।[৮৬]

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতোই যে-কেউ সিলেটের গণভোটকালীন কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। যা হোক, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সাম্প্রদায়িক বিষয় ছিল না, যেহেতু তাঁরা অনুভব করতেন যে সিলেট আসামের সঙ্গে থাকলে শ্রেণি রাজনীতি করার অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবে এবং চঞ্চল শর্মা স্পষ্টভাবে বলছেন যে এটি ছিল দলীয় সিদ্ধান্ত।[৮৭] সিলেটে জন্ম নেওয়া হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরী দুজনই আসামের নেতৃত্বস্থানীয় কমিউনিস্ট ও তাদের সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘের সদস্য ছিলেন এবং দুজনই লোকসংগীত গায়ক হিসেবে সিলেটের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছিলেন। গণভোটকালে তাঁরা যেসব গান ও স্লোগান রচনা করতেন তা হলো : 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' 'চলো সবাই মিলে আসাম যাই' এবং 'ও প্রিয়, কেন সোনালী সিলেটকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছ?'[৮৮] প্রত্যুত্তরে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড জবাব দিয়েছিল, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, চলো দুয়ে মিলে গরু খাই'। কিছু দলিত নেতাও কংগ্রেসের অনুকূলে ছিলেন। যেমন বাংলার আইনসভার সদস্য বিরাট মণ্ডল সিলেট পরিদর্শন করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি সভায় ভাষণও দিয়েছিলেন। ভাষণ প্রদানকালে তিনি দলিতদের কাছে আবেদনও করেছিলেন যে তারা যাতে সিলেটকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার জন্য ভোট দেয়। তবে এই পরিদর্শন তাদের ওপর খুব কম প্রভাব ফেলেছিল। বর্ণভিত্তিক বিভাজনের উৎসগুলো স্থানীয় সামাজিক কাঠামোয় বিদ্যমান ছিল। গান্ধীবাদী সমাজকর্মী সুহাসিনী দাস যেমন উল্লেখ করেছিলেন :

> আমরা বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সঙ্গে তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য তালিকানুযায়ী দলিতদের মধ্যে কাজ করেছিলাম। কিন্তু আমরা সেদিন তাদের তেমন কোনো সাড়া পাইনি...উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিচু বর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল সুতরাং এই উচ্চ বর্ণের নেতাদের আহ্বানে সিলেটের গণভোটের সময় নিচু বর্ণের মানুষজন তেমন কোনো সাড়া দেয়নি।[৮৯]

গণভোটে সমর্থন অর্জনের জন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দু নেতারা সুনামগঞ্জে অস্পৃশ্য বা অচ্ছুতদেরসহ একটি উৎসবের আয়োজন করেন, যেখানে রান্না করা একই

খাবার সব বর্ণের মানুষের একসঙ্গে বসে গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। সংকটকালে ভোটের রাজনীতি কত শক্তিশালী হতে পারে, তার একটি নমুনা ছিল এটি। সেদিন বর্ণ হিন্দুরা বাধ্য হয়েছিলেন এই অচ্ছুতদের সঙ্গে একই থালায় ভাত খাওয়ার আহ্বান জানাতে, কিন্তু অচ্ছুতেরা অস্বীকৃতি জানায়। তখন একজন দলিত বা নিম্নবর্ণের নেতা দারিকনাথ বাড়ৈ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন এবং অচ্ছুতদের আহ্বান করলেন, 'এটা খাবার নয়, এটি বিষ, দয়া করে এই খাবার খেয়ো না।'[৯০]

সিলেটের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ ছিল মুসলিম এবং বর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দু যৌথভাবে ছিল ৩৮ শতাংশ। সুতরাং কংগ্রেসের কাছে তখন মুসলিমদের ভোটগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মাওলানা হোসেইন আহমেদ মাদানি এবং তাঁর দল উলামা-ই হিন্দ কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অনুসারীরা অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মৌলভি ছিলেন, যাঁরা আসামের মুসলমানদের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা সিলেটকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে একত্রীকরণের পরিবর্তে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রচারণা চালান।[৯১] মাওলানা মাদানি এক শক্তিশালী যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন যে 'আধুনিক জাতিসত্তা নির্ধারিত হয় এর ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে এবং তা কোনোভাবেই ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নয়'। তিনি 'মোত্তাহিদা কিয়ামত আওয়ার ইসলাম' (কম্পোজিট ন্যাশনালিজম অ্যান্ড ইসলাম) শিরোনামে ব্যাপক আলোচিত একটি লেখা লিখেছিলেন, যাতে বিশেষ করে ড. মোহাম্মদ ইকবালের পৃথক মুসলিম ভূখণ্ডের যে মতাদর্শ, তার বিরুদ্ধে জবাব দিয়েছিলেন। মাদানি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ধর্ম হিসেবে ইসলাম সাধারণ মাতৃভূমির ওপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ গঠনে বিরোধিতা করে না। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা যার মাধ্যমে কতগুলো বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কে তা আদান-প্রদান করতে পারে ও একই জাতীয়তাবাদ গঠন করতে পারে। আবদুল মজিদ কোরেশী প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে মাদানি সিলেটে এসে আহ্বান করেছিলেন 'ভারতকে সমর্থন করো এবং আমাদের সঙ্গে যোগদান করো'।[৯২] ১৯৪৬ সালের আসাম আইন পরিষদের নির্বাচনে (পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল) উলামা-ই হিন্দ সিলেটে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দুটি আসন পেয়েছিল এবং মুসলিম ভোটারদের ৪৬ শতাংশ নিশ্চিত করতে পেরেছিল। উলামা-ই হিন্দের ওপর নির্ভর করে কংগ্রেস দেখতে পেল যে গণভোটে তাদের পক্ষেই রায় যাওয়ার সম্ভবনা আছে। মাওলানা মাদানিও সিলেটে তাঁর অনুসারী কর্তৃক আয়োজিত বেশ কয়েকটি সভাতেই ভাষণ দিয়েছিলেন এবং আহ্বান জানিয়েছিলেন যে সিলেটকে যেন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত

রাখতে সবাই ভোট দেন।[৯৩] অবশ্য মাওলানা শাব্বির ওসমানী মাওলানা মাদানিকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি এই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে যদি সিলেটের মানুষ একটি মুসলিম দেশ চায়, তাহলে তাদের উচিত পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া।[৯৪]

মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয়ভাবে ব্রিটিশ-ভারত ভাগ করে একটি পৃথক আবাসভূমি চেয়েছিল, যার মধ্যে আসামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন আসাম পাওয়া গেল না, সিলেটকে পুনরায় পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক সমিতি গঠন করেছিল।[৯৫] তাদের কর্মীরা সিলেটের গ্রাম, শহর, বাজার ও রাস্তায় রাস্তায় জনমত গঠনে সময় ব্যয় করে এবং কঠোর পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছিল। মূলত মুসলিম ভোটারদের সংগঠিত করার জন্য সভার পর সভার আয়োজন করেছিল, যাতে গণভোটে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল পুলিশ মুসলিম লীগের সভার ওপর গুলি ছুড়েছিল এবং আকলাস নামের এক লোক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই বিয়োগান্ত ঘটনা তাদের স্লোগানকে আরও বেশি বেগ ও শক্তি দিয়েছিল এবং পরবর্তী সভাগুলোয় তারা উচ্চ স্বরে বলতে লাগল, 'আসামে আর থাকব না, গুলি খেয়েও মরব না'। আসাম মুসলিম লীগের সম্পাদক মাহমুদ আলীর মতে, 'এই স্লোগানই পূর্ব বাংলার সঙ্গে সিলেটকে সংযুক্ত হওয়ার সমর্থনে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিল'।[৯৬] এমনকি যুক্তরাজ্যে প্রবাসী সিলেটিরা গণভোটকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার জন্য সিলেটে ফিরে এসেছিলেন। কেউ কেউ এতে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন যে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তাঁরা তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতিও খেয়াল রাখতে পারেননি। এমন একটি বর্ণনা আমরা পাই ক্যারোলিন অ্যাডামসকে দেওয়া ১৯৮০ দশকে সৈয়দ আবদুল মজিদ কোরেশীর সাক্ষাৎকারে। কোরেশী বর্ণনা দিচ্ছেন :

> আমি ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে এ দেশ (ইংল্যান্ড) ত্যাগ করে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়টাতে বাড়িতেই ছিলাম। তখন অর্থাৎ সিলেটের গণভোটকালে আমি দিনে ও রাতেও প্রচারণার কাজ করছিলাম। আমি খাওয়ার জন্য কোনো সময়ও পাইনি। আমাকে তখন এখানে-সেখানে কথা বলতে হতো এবং মানুষকে বোঝাতে হতো কেন আমরা পাকিস্তান চাই। যেহেতু পাকিস্তান ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেহেতু এই প্রশ্নটি একমাত্র সিলেটিদের কাছেই ছিল যে আমরা কি ভারতের সঙ্গে যোগ দেব নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেব। আমি একমাত্র সে প্রশ্নের ভিত্তিতেই কথা বলছিলাম। পাকিস্তানের পক্ষে সিলেটের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এসব কাজে কঠোর পরিশ্রমের কারণে আমি কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিটি গ্রাম, শহর এবং বাজারে ভোট নেওয়া হয়েছিল। আমি পকেটের টাকা দিয়ে মাইক এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম।[৯৭]

কোরেশীর বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সিলেটিদের

জন্য গণভোটের এই মুহূর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল—তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সিলেটে মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত 'গণভোট সমিতি'র সভাপতি ছিলেন আবদুল মতিন চৌধুরী, যিনি কয়েকবারই আসামের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, মাওলানা আকরম খান এবং শিল্পপতি আবুল ইস্পাহানি প্রমুখ নেতাকে দাওয়াত করে সিলেটে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের বলেছিলেন পাকিস্তানের অনুকূলে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য। আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর নেতৃত্বের শিকড় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মাওবাদীদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তাঁকে 'লাল মাওলানা' উপনামেও ডাকা হতো। কলকাতায় দৃঢ়চেতা তরুণ-মুখ ও উদীয়মান রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত—পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা—শেখ মুজিবুর রহমানও সিলেটের গণভোটে প্রচারাভিযানে এসেছিলেন। হাজার হাজার স্থানীয় কর্মী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেছিলেন।[৯৮] ১৯৪০ সালের মাঝামাঝিতে, মুসলিম আশরাফের (অভিজাত সম্প্রদায়) ও উদীয়মান মধ্যবিত্তের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার অনেক জেলার মতো সিলেটেও জনপ্রিয় ছিল। বাংলা ও আসামের বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও গণভোটের কাজের জন্য সিলেটে এসে সমবেত হয়েছিল। তারা সিলেটের সর্বত্রই প্রচারপত্র বিলি করেছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু বা দলিতদের সঙ্গে তারা যৌথভাবে কাজ করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে পাকিস্তান হবে 'সর্বহারা বা মজলুম'দের রাষ্ট্র।[৯৯]

যদিও মিডিয়া হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রেখায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি এটি সরকার এবং এর বিরোধী পক্ষের মতামতগুলোর সমালোচনা বেশ গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ করেছিল। যেমন দিল্লি থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র *ডন* মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রচারাভিযান বা 'ষড়যন্ত্র' নিয়ে সোচ্চার ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক আলতাফ হোসেন ছিলেন একজন সিলেটি এবং সে সময়ের এক বিখ্যাত সাংবাদিক, যিনি পাঠকমহলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার সম্পাদকীয় অক্লান্তভাবে মুসলিম লীগের নীতিমালা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ব্রিটিশ সরকার ও সচেতন মহলের সামনে হাজির করত। ১৯৪৭ সালের ২৮ জুন *ডন* পত্রিকায় 'সিলেট গণভোট' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে 'পুরো বিষয়টিই আসামে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদের হাতে রাখা হয়েছে। তদুপরি মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গিবিরোধী এক কুখ্যাত ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে গণভোট পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, যিনি কংগ্রেসের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছেন।' এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে :

> ব্রিটিশ সরকার গণভোট কমিশনার হিসেবে একজন ইউরোপবাসী আইসিএস (মি. স্টুয়ার্ট) কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেছেন। এই পদের জন্য ওই কর্মকর্তা অনুপযুক্ত কারণ : প্রথমত, তিনি সিলেটের একজন হিন্দু মন্ত্রীর সরাসরি অধীন। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তুরস্কের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুর্কি জেলে কয়েদি হিসেবে বন্দী ছিলেন, যার ফলে 'তুরস্কের পদমর্যাদার প্রতীক টুপি'-এর প্রতি তাঁর মনে বিদ্বেষ জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষ করে মুসলিম লীগের সদস্যরা 'তুর্কি টুপি' পরিধান করে থাকেন। সুতরাং আসামের মুসলিমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে না।[১০০]

ডন সমালোচনা করে আরও লিখেছিল যে মুসলিম লীগের কারও সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই ব্যালট বাক্সের প্রতীকের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। পত্রিকাটি যুক্তি দিয়েছিল যে 'কুঁড়েঘর বা ছাউনি' ব্যালট বাক্সের প্রতীক হিসেবে সিলেটের আসামে থেকে যাওয়ার পক্ষে বা হ্যাঁ ভোটের জন্য পছন্দ করা হয়েছে, যা সিলেটকে পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে, 'কুড়াল'কে বাছাই করা হয়েছে 'না' প্রতীক হিসেবে, যাঁরা আসামে থাকতে ইচ্ছুক নয় অর্থাৎ পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের সংযুক্তকরণের পক্ষে ভোট দিতে চান, তাঁদের জন্য। এ প্রতীকগুলো নিয়ে জনমানসে কুসংস্কার বা আবেগনির্ভর পটভূমি রয়েছে। একটি হলো সৃষ্টির, অন্যটি ধ্বংসের। *ডন* নিম্নোক্তভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করছিল :

> কংগ্রেস প্রচারকারীরা ইতিমধ্যে একটি জনপ্রিয় কুসংস্কার নিয়ে খেলা করা শুরু করে দিয়েছে। জনগণের কাছে আহ্বান করছে যে যদি তারা তাদের নিজেদের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে চায়, তাহলে তাদের উচিত 'কুঁড়েঘর' প্রতীক চিহ্নিত ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়া। অবশ্য যদি তারা তাদের অঙ্গচ্ছেদ করতে চায় বা নিজেদের আহত করতে চায়, তাহলে তাদের উচিত 'কুড়াল' প্রতীকে ভোট দেওয়া।[১০১]

আরও একটি নিবন্ধে *ডন* অভিযোগ করেছিল যে গণভোটের জন্য তারিখ নির্ধারণটাও খুব দ্রুত হয়ে গিয়েছিল এবং যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তাই পাঠানো হয়নি, যাতে শান্তি বজায় রাখতে অথবা নির্বাচন তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া ঠিক রাখতে পারে। শিখ সামরিক কর্মকর্তা সরদার বলদেভ সিংয়ের নেতৃত্বে জেলাটিতে সামরিক বাহিনীর ব্যাপক সংখ্যক অমুসলিম সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।[১০২] *ডন* আরও একটি অভিযোগ করেছিল যে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন আসাম সরকার মুসলিম লীগকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা দিতেও দেরি করছিল, যেখানে কংগ্রেস কর্মীরা এসব কিছুই গোপনে গোপনে অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিল। *ডন* উল্লেখ করেছিল যে :

> মুসলিমদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি জেলার বাইরে বসবাসকারী সিলেটিদের কাছে বা ভারতের বিভিন্ন অংশে

লীগের কর্মী এবং সদস্যদের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম পাঠানোও স্থগিত করা হয়েছে এবং আসাম প্রদেশ সরকার এগুলো আটকে দিয়েছে। অনেক মুসলিম লীগের কর্মীদের অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা হয়েছে।[১০৩]

দিল্লিতে সরকারি গোয়েন্দারা এসব নিবন্ধ সংগ্রহ করেছিল এবং মাউন্টব্যাটেনের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। মাউন্টব্যাটেন তখনই আসামের সরকারের কাছে দ্রুত উত্তর চেয়ে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৭ জুলাই মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রামের জবাবে আসামের গভর্নর লেখেন :

আপনার টেলিগ্রামে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে মুসলিম লীগের মতিন চৌধুরী প্রস্তাব করেছিলেন পূর্ব বাংলার সঙ্গে রাখার পক্ষে ব্যালট বাক্সের প্রতীক যেন হয় 'অর্ধচন্দ্র' যা সিলেটের জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের (কংগ্রেস-সমর্থিত) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে পারত এবং সাম্প্রদায়িক অনুভূতিও লালন করতে পারত। আমার পক্ষে কুড়াল নিয়ে স্থানীয় কুসংস্কার কিংবা মি. স্টুয়ার্ট, আইসিএস সম্পর্কে মুসলিমদের নেতিবাচক মনোভাব জানা সম্ভব নয়।[১০৪]

সিলেটের ভোট পর্যবেক্ষণের সময়, নিম্নবর্ণের হিন্দু বা দলিতদের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং এসবের ওপর ভিত্তি করে তিনি মাউন্টব্যাটেনকে একটি টেলিগ্রামও পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছিলেন :

সিলেটের হবিগঞ্জের মুসলিম লীগের সচিব আমার কাছে লিখিত একটি বক্তব্য পাঠিয়েছেন যে সরকার তাদের নৌকা জব্দ করে নিয়েছেন। শিডিউল কাস্ট (নিম্নবর্ণের হিন্দু) এবং মুসলিম ভোটার যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন তাদের অধিকাংশই জটিলতায় পড়েছেন। এটি তাদের ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করবে। কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে কিন্তু প্রার্থনাটি বাতিল হয়ে গেছে। সরকার কর্তৃক নৌকা জব্দ সম্পর্কে আমার মতামত হলো এই যে বিষয়টি অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দেবে, দ্রুতই বিষয়টি আপনার বিবেচনায় নেওয়া উচিত।[১০৫]

সিলেটের গণভোট ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার অনুকূলেই ফলাফল গিয়েছিল। নানা রকম তথ্যপ্রমাণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গণভোট প্রায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে ভোটের পরে একটি সহিংস ঘটনা ঘটেছিল। যেমন ৭ জুলাই দক্ষিণ সিলেটের আমতৈলে মুসলিমদের জনাকীর্ণ সমাবেশে পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছিল। সিলেট শহরের কাছে লীগের কর্মীরা কংগ্রেসের কর্মীদের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। এতে ১২ জন আহত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে আটজনকেই চিকিৎসাকেন্দ্রে নিতে হয়েছিল।[১০৬] সিলেটের গণভোটের ফলাফল ছিল নিম্নোক্ত : পূর্ব বাংলায় যোগদানের পক্ষে বৈধ ভোট ছিল ২৩৯,৬১৯ এবং আসামে থাকার জন্য ছিল ১৮৪,০৪১। পূর্ব বাংলায় যোগদানের জন্যই অধিকাংশ ভোট পড়েছিল এবং ভোটের পার্থক্য ছিল ৫৫,৫৭৮।[১০৭]

সিলেট 'টুকরো টুকরো হয়ে গেল'

দেওয়ান আজরফ যেমন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সেই একই কথা তিনি সাক্ষাৎকারেও বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে গণভোটের পর সিলেটকে কেটে টুকরো টুকরো করার পেছনে কোনো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কাছাড় জেলাটি, বিশেষ করে হাইলাকান্দি অঞ্চলটির নিশ্চিতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করা উচিত ছিল। কিন্তু 'শেষ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে'। আসামের আইনসভায় কাছাড় জেলার দুটো মুসলিম আসন ছিল এবং এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে উলামা-ই হিন্দ একটি পেয়েছিল—সংগঠনটি পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল—এবং গণভোটে হেরে গিয়ে করিমগঞ্জ আসামে রাখার জন্য দাবি করেছিল।[১০৮] গণভোটের পর সিলেটের নতুন সীমানা তৈরির ওই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উচ্চ পর্যায়ের 'লবি' বা প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠী কাজ করছিল যারা সিলেটের চা-বাগানগুলোকে আসামের সঙ্গে একত্রে রাখতে চেয়েছিল এবং রেডক্লিফের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তাদের পরিকল্পিত কর্ম শুরু হয় ঠিক গণভোটের ফলাফল প্রকাশের কিছু পরেই। গণভোটের ফলাফলের ওপর অভিযোগ উত্থাপন করে নেহরু মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন :

আজ আমার কাছে সিলেট থেকে হিন্দু-মুসলিমদের মিলিত একটি প্রতিনিধি দেখা করতে এসেছিলেন। তারা আমার সামনে অনেকগুলো অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং যেসব তথ্য-উপাত্ত তারা আমার সামনে রেখেছেন, সেগুলো উল্লেখযোগ্য...আমি মনে করি আমার অবশ্যই এসব অভিযোগ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত এবং যেহেতু এসব অভিযোগ গুরুতর এবং যদি এসব বিষয় সত্য হয়, তাহলে সিলেটের গণভোট সন্দেহপূর্ণ হবে। সংক্ষেপে আমি কি আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি, সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলো অনুসন্ধান বা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা উচিত। সিলেটের গণভোটের ফলাফল প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন দেওয়া উচিত।[১০৯]

নেহরু যখন মাউন্টব্যাটেনকে এই অভিযোগ করেন একই দিনে জিন্নাহও একটি চিঠি লিখেছিলেন মাউন্টব্যাটেনকে। এতে জিন্নাহ গণভোটের সময় আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার দুজন সিলেটি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি তদন্তও দাবি করেছিলেন। জিন্নাহর এসব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেহরুর প্রতি মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ ছিল নিম্নরূপ :

আমার কোনো সন্দেহ নেই যে যদি কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে এ পর্যায়ে এটি হবে দীর্ঘ এবং লজ্জাজনক প্রতিযোগিতা। আমার মতে এটি ভালো হবে না। তার চেয়ে বড় কথা, আমি ইতিমধ্যে ফলাফলগুলো লন্ডনে টেলিগ্রাম করে দিয়ে দিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ আগামীকাল সেগুলো প্রকাশ করবে, যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে সেসব তথ্য সম্ভবত অনেক সংবাদপত্র কার্যালয়ে

পৌঁছেও গেছে এবং এখন ওইগুলো সংবাদপত্র কার্যালয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে একধরনের নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।...আমি মনে করি যেকোনো নির্বাচন অথবা গণভোট পরিচালনার সময়ই সর্বদা কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে। এ ক্ষেত্রে আসামের লে. গভর্নর, যিনি সরাসরি আমার অধীনে, তিনি দ্রুত ফলাফল ঘোষণার অনুরোধ করেছেন, যার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে তিনি এতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।[১১০]

কৌতুকের বিষয় হচ্ছে যে আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দারি ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক ও নেহরুর ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু যে কয়েকটি 'বিতর্কিত' নিয়োগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দারির নিয়োগটি ছিল অন্যতম। মাউন্টব্যাটেন নেহরুর উপরিউক্ত অভিযোগটি তৎক্ষণাৎ আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দারির কাছে প্রেরণ করে গণভোটের সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তৈরি করে নেহরু ও তার কাছে প্রেরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক, হায়দারি মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এসব অভিযোগের বহু অংশই সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে উত্থাপন করা হয়নি। সামরিক বাহিনী ও পুলিশ কর্মকর্তা যাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন, তাঁদের মতে এগুলো আসলে 'মিথ্যা' অভিযোগ ছিল। হায়দারি লিখেছেন যে 'সিলেট থেকে আসাম সরকারের একজন হিন্দু মন্ত্রী যিনি এসব অভিযোগের বেশির ভাগই করেছিলেন, তিনি এখন বলছেন এগুলো তাৎক্ষণিক হতাশা থেকে সৃষ্ট যা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।'[১১১] ফলে নেহরু গণভোটের ফলাফল বা রায় গ্রহণ করেন এবং ফলাফল নিরপেক্ষ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। এরপর সীমান্ত বিষয়ে দর-কষাকষির জন্য নেহরু পরবর্তী উদ্যোগ নেন, যাতে তিনি সিলেটের কিছু কিছু অঞ্চল পাওয়ার আশা করেছিলেন। সুতরাং ১৫ জুলাই মাউন্টব্যাটেনকে লেখা একটি পত্রে তিনি সিলেটের বিভাজনের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছিলেন :

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যাতে আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপিনাথ বরদোলাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি হচ্ছে যে সীমান্ত কমিশনের প্রতিবেদনের পরে সিলেট জেলার বিশেষ বিশেষ অংশ আসামের সঙ্গে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে...চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণের পরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি অবশ্য সমাধা হওয়া উচিত। তবে, এটির আয়োজন করার সহজ উপায় হলো ১৫ আগস্টের পূর্বে সীমান্ত কমিশনের প্রতিবেদন হাতে পাওয়া।[১১২]

অবশ্য সিলেটের হাজার বছরের পুরোনো সীমানা ব্যবচ্ছেদের এই প্রক্রিয়ায় নেহরু একা ছিলেন না। চা আবাদকারী দেশীয় পুঁজিপতিদের (কংগ্রেস সমর্থক) একাংশ, কমিউনিস্টদের প্রায় সবাই এবং চা-শ্রমিক সংঘও জড়িত ছিল। দেশীয় চা আবাদকারী হিসেবে আসাম আইনসভায় সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধি এবং আসাম মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখার্জি। ভোটে হেরে গিয়ে তিনি দক্ষিণ সিলেটের সমগ্র এলাকাটিকে আসামে সংযুক্ত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন।

গণভোটের সময় জিন্নাহ মুখার্জিকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' হিসেবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতারা যেমন ব্যারিস্টার এম সেন, বিরেশ মিশ্র ও অচিন্ত্য ভট্টাচার্যও একই রকম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা আসামের সঙ্গে পুরো চা-বাগানগুলো রাখার দাবি জানিয়ে *শ্রীহট্ট-কাছাড় চা মজদুর ইউনিয়ন*-এর পক্ষে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন।[১১৩] এভাবে গভর্নর স্যার আকবর হায়দারির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে তিনি দাপ্তরিকভাবে সিলেটকে কেটে টুকরো টুকরো করতে বাধ্য হন। তদুপরি আকবর হায়দারি ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক এবং নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে এসব উদ্যোগের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল। সরকারি দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে যে গভর্নর স্যার আকবর হায়দারিও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। একপর্যায়ে আকবর হায়দারি মাউন্টব্যাটেনের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন :

আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যে এই রাস্তা (খাসি পাহাড় থেকে কাছাড় ও লুসাই পাহাড় পর্যন্ত) আসামের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে সীমান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান যেন আসাম সরকারের অনুরোধ মঞ্জুর করেন। আমি আমার মন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হব যে সিলেট জেলার উক্ত অংশের (করিমগঞ্জ) বিনিময়ে অন্যান্য অংশ থেকে তারা যাতে দাবি প্রত্যাহার করে। আমি মনে করি এই সুবিধা আসাম এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে ভালো অনুভূতি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে যাতে উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থও লালিত রয়েছে।[১১৪]

আকবর হায়দারির এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট তিনি হায়দারিকে লিখেছিলেন, 'র‍্যাডক্লিফ সচিবালয় তোমার টেলিগ্রাফ দেখেছে এবং এটি যাচাই-বাছাই হয়েছে এবং সরকারের পক্ষে তোমার দেওয়া মতামতই সীমান্ত কমিশন গ্রহণ করেছে।'[১১৫] এর ফলাফল ছিল এই যে জেলাটির বড় অংশটি পূর্ব বাংলায় সংযুক্ত করা হয়েছিল। শুধু করিমগঞ্জ মহকুমার থানাগুলো যেমন : পাথরকান্দি, রাতবাড়ি, করিমগঞ্জ ও বদরপুর কেটে নেওয়া হয়। এই চারটি থানা আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগস্থল হিসেবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই চারটি থানা দিয়ে প্রবাহিত রাস্তাটি ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য খাসি পাহাড় থেকে কাছাড় ও লুসাই পাহাড়ের রাস্তায় প্রবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিলেটের এই বিভাজনের ফলে ৫৫টি চা-বাগান ভারতে চলে গিয়েছিল। এমনকি একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তাও 'সিলেটের সীমানা ব্যবচ্ছেদের' ধারণা পছন্দ করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর সন্দেহের কথা জানিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে বিবাদ পরিহারের জন্য যৌথ জরিপ করার বিষয়েও যুক্তি দিয়েছিলেন।[১১৬]

'কলকাতা চলে গিয়েছিল'

এভাবে উপমহাদেশের বিভাজন সিলেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল, যাতে কলকাতায় সিলেটি সমুদ্রযাত্রী জাহাজিদের জন্যও কিছু ভয়াবহ পরিণতি ডেকে

এনেছিল। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে সিলেটে মানুষদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ছিল, যা ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওই সময় লক্ষাধিক সিলেটি কলকাতায় স্থায়ী হয়েছিল যার মধ্যে একটা অংশ গভীর সমুদ্রে জাহাজি হিসেবে কাজ করতেন এবং আরেকটি অংশ পরবর্তী জাহাজে চাকরি পাওয়ার আশায় কলকাতায় সিলেটি বাড়িওয়ালাদের বোর্ডিংয়ে থাকতেন। কলকাতায় তখন কয়েক হাজার সিলেটির ছিল ছোট ও মাঝারি ব্যবসা। কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় একটি 'ছোট সিলেট' ছিল যেমন এখন লন্ডনের ব্রিকলেনে হয়েছে। ১৯৪৭ সালের গণভোট অব্যবহিত পরের প্রভাব সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন :

> ব্রিটিশ ভারতের ভাগ সিলেটের জনগণের ওপর একটি প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাবটি ছিল বিশাল ও ব্যাপক। কলকাতায় সিলেটি ব্যবসায়ীরা বিভাজনের কারণে তাদের ব্যবসায় আকর্ষণ হারিয়েছিল। কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছিল। সিলেটিরা তখন ভাবতে শুরু করেছিল যে 'এটি আর আমাদের দেশ না, আমরা আর এখানে বসবাস করতে পারব না।' বাড়ির মালিকেরা তাঁদের জিনিসপত্র প্যাকেট করা শুরু করেছিলেন। এরপর পাসপোর্ট ও ভিসা হলো, ট্রেনে চড়াও খুব সহজ ছিল না এবং কলকাতায় যাওয়া অনেকটা অসম্ভব হয়। আগের মতো কলকাতায় গিয়ে জাহাজের চাকরির জন্য অপেক্ষা করার বিষয়টি অতীতের সুখস্মৃতিতে পরিণত হলো।[১১৭]

সমুদ্রগামী সিলেটিদের জন্য কলকাতা যেন হঠাৎ করে একটি ভিন্ন পৃথিবী হয়ে গেল। পুরো নেটওয়ার্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল এবং সমুদ্রে চাকরিজীবীদের জন্য যা ছিল বড়ই দুঃখের। এ ছাড়া যেসব চা-শ্রমিক এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসেছিল তারাও উপমহাদেশের বিভাজনের কারণে তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

'হিন্দ, এলিটরা কি দ্বিগুণ শাস্তি পেয়েছিল?'

গণভোটের পর পরই সিলেটের পরিস্থিতিটা খুব বেশি দ্রুত পরিবর্তন হয়নি, যদিও সেখানে তখন একধরনের অস্থিরতা ছিল। মুসলমানদের জন্য সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণা ছিল যে সেখানে ভোট চলার সময়ে বিক্ষিপ্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল, যাতে পুলিশের গুলিতে দুজন মুসলমান নিহত হয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝেও একধরনের নিরাপত্তাহীনতা অনুভূত হচ্ছিল। সুতরাং কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগের নেতারা খুব শিগগির মিলিত হলেন এবং সিলেট শহরে সব দলের পক্ষ থেকে আয়োজিত শান্তি মিছিলে যোগদান করলেন। মিছিলের পরে তারা একে অন্যকে চা ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল।[১১৮] দু-তিন বছর শান্ত পরিবেশ বিরাজ করলেও সিলেটের পরিস্থিতির পরে কিছুটা অবনতি হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জেলা প্রশাসক হিসেবে নোমানি সিলেটে এসে 'সাম্প্রদায়িকতা' উসকে দিতে কৌশলি ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে ১৯৫০ সালে সৃষ্ট দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানদের

মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে অসংখ্য শিক্ষিত হিন্দু একদিকে যেমন চিরতরে সিলেট ত্যাগ করেছিলেন, অন্যদিকে এলিট মুসলমানরা আসামের করিমগঞ্জ ছেড়ে সিলেটে চলে এসেছিলেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অনেকেই চলে যাচ্ছিলেন কারণ তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িকতা'র শিকার হচ্ছিলেন। যেন এই প্রথমবারের মতো কিছু প্রতিবেশী একে অপরের প্রতি হঠাৎ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল, যা ১৯৪৭ পরবর্তীকালে সর্বত্রই সীমান্ত এলাকাজুড়ে লক্ষ করা যায়।[১১৯] বিখ্যাত রাজনৈতিক মাহমুদ আলী ৫০০ কলেজ শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিলেন এবং সিলেটে একটি দাঙ্গা দ্রুত বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গা প্রতিরোধে আলীকে প্রশংসা না করে বরং নোমানি তাঁকে আটক করেন। এই ঝড় থামাতে লিয়াকত আলী খান সিলেটে এসেছিলেন এবং নোমানিকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি হয়।[১২০] ১৯৫০ দশকের শুরুর দিকে সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কিন্তু ১৯৬২ সালের দিকে সিলেট ছেড়ে চিরদিনের জন্য তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোস একসময় চৌধুরীকে 'সুরমা উপত্যকার মুকুটহীন রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন কিন্তু বৈরী পরিবেশে ক্ষমতা হারিয়ে এই 'প্রান্তিক রাজা' তাঁর আত্মজীবনীতে কবিতায় ঢঙে দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন :

> তখন হৃদয়ে মৃত্যুতুল্য অনুভূতিশূন্যতা বা অসারতা
> নিঃশব্দ ঘৃণা হামাগুড়ি দিয়ে চলছে,
> এটি কাউকে পরোয়া বা তত্ত্বাবধান করছে না,
> কারও জন্য দুঃখও করছে না
> কারও নিজস্ব কোনো অনুভূতি দেখানোর সাহসও পাচ্ছে না।[১২১]

কলকাতায় বসে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী যখন আত্মজীবনীটি লিখেছেন তখন তাঁর বয়ষ ৮০ পেরিয়ে গেছে। ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধের মনে তখন কি কোনো অনুশোচনার জন্ম হয়েছিল? সম্ভবত তার মনের গহিনে রক্তক্ষরণের চোরা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, যা তিনি কবিতার আকারে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কারণ, এই সেই ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী যিনি ১৯১০, ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে আসামে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, গঠন করেছিলেন রি-ইউনিয়ন লীগ এবং সিলেটকে বাংলার সঙ্গে পুনরায় একত্রীকরণের জন্য মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯২০ দশকে আসাম প্রাদেশিক আইনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে একত্রীকরণের পক্ষে একাধিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং তাঁর একটি প্রস্তাব সিলেটি অভিজাত মুসলিম সদস্যদের সহায়তায় আইন পরিষদে পাসও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিজাত মুসলিম সদস্যরা

সমর্থন তুলে নিলে চৌধুরীর আর কোনো প্রস্তাব পাস হতে পারেনি। সেই ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী যখন ১৯৪৭ সালে নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সিলেটকে বাংলার পরিবর্তে আসামে রাখার জন্য লড়লেন তখন ইতিহাসের এক নির্মম 'প্রতিশোধের' শিকার হলেন তিনি। তিনি তাঁর সম্পত্তির একাংশ সিলেট মহিলা কলেজকে, বাকি অংশ বিক্রি করে বা অবৈধ দখলদারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ১৯৬২ সালে চিরতরে মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। তারপরও হিন্দু এলিটদের অনেকেই কোনো অসুবিধা বা অস্বস্তি বোধ করেননি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ১৯৭১ সালে সি আর দত্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তিনি হবিগঞ্জে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং ওই অবস্থায় বিদ্রোহ করে সিলেট অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। জেনারেল দত্তের তথ্য অনুযায়ী সিলেটে তাঁর অধীনে কর্মকর্তা ও নিয়মিত সেনা সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৯,০০০ ও ৪,০০০।[১২২] মাসিমা হিসেবে অধিক পরিচিত গান্ধীবাদী সমাজকর্মী সুহাসিনী দাস ১৯৪৭ সালের পরে স্বেচ্ছায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সিলেটে একটি দাতব্য সংস্থা গঠন করেছিলেন, সমাজ উন্নয়নের কাজ করেন এবং সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন, যা ২০০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিমদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতা ঠেলে অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত রচনা করতে সাহায্য করেছিলেন।[১২৩]

উপসংহার

১৮৭৪ সালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চা-এ বিনিয়োগ ছিল আসাম প্রদেশ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ এবং এটি চা-আবাদকারীদের 'রাজ্য হিসেবে পরিচিত' পেয়েছিল, যার প্রভাব সমাজের সব ক্ষেত্রেই পড়েছিল। মানচিত্রের এই নতুন বিন্যাসে সিলেটসহ বাংলার আরো দুটি সীমান্তবর্তী জেলা (কাছাড় ও গোয়ালপাড়া) নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সিলেটের বৃহদংশ বাংলায় ফিরে এলেও কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামেই থেকে গেছে। সংগত কারণে, বর্তমান প্রবন্ধে সীমানার এই অদল-বদলের ওপর একটি মহুমাত্রিক বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের ওপর। ঐতিহাসিকভাবে, প্রাচীনকাল থেকে আসামের সঙ্গে সিলেটের অর্থনৈতিক সুবিধা বিনিময় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের একটি কার্যকর সংযোগ ছিল। যা হোক, সিলেটের অভিজাত বাঙালি, বিশেষ করে, অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় তাদের সীমানার এই নব-

আকৃতি প্রদানের চরম বিরোধিতা করেছিল। তবে ব্রিটিশ শাসকেরা নতুন প্রদেশে 'সিলেটকে বিশেষ মর্যাদা' প্রদান করলে তাদের বিক্ষোভ থেমে গিয়ে অতি দ্রুত সহযোগিতায় রূপ নিয়েছিল। বাংলা থেকে শিক্ষা এবং আদালতের সুবিধা তাদের কিছু বস্তুগত সুবিধা দিয়েছিল। যা হোক, ১৯১০ দশক থেকে পেশাগত চাকরিগুলো চরম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শিক্ষিত মুসলিম এবং মধ্যবিত্ত আসামভাষীদের দখলে চলে যাচ্ছিল। ফলে আবার বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় 'বাঙালি সিলেট'-এর আসামের সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। লন্ডনে ব্রিটিশ সরকার, ভারতে তার ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র, ইউরোপীয় চা-আবাদকারী এবং আসামের মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক অভিজাত মানুষই 'চা-পুঁজিবাদের নতুন স্বর্গ' আসাম প্রদেশ থেকে সিলেটকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৪০ দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আসামে সিলেটি/বাঙালি পরিচয় খুবই শক্তিশালী ছিল এবং কখনো কখনো হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ছাপিয়ে সেই পরিচয়টাও অনেক বড় হয়ে উঠত।

১৯১০ থেকে ১৯৩০ দশকে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত রি-ইউনিয়ন লীগ-এর আন্দোলন চলে, যা প্রথমদিকে গতি পেলেও পরে তা ব্যর্থ হয়েছিল। সিলেটকে বাংলার সঙ্গে পুনরায় একত্রীকরণের জন্য মি. চৌধুরী ১৯২০-এর দশকে আসাম প্রাদেশিক আইনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে একত্রীকরণের পক্ষে একাধিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং তার একটি প্রস্তাব মুসলিম সদস্যদের সহায়তায় আইন পরিষদে পাস হয়েছিল। পরবর্তীকালে অভিজাত মুসলিম সদস্যরা সমর্থন তুলে নিলে আর কোনো প্রস্তাব পাস হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে যখন সিলেট বাংলায় পুনরায় সংযুক্ত হবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীসহ সব হিন্দু এলিট সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বাংলার পরিবর্তে আসাম রাখার জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন। ইতিহাসে এর চেয়ে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে।

এ ক্ষুদ্র পর্যায়ের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলিম এলিট/ধনিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজনের রেখাটি অনেক গভীরে বদ্ধমূল ছিল। একই সঙ্গে উচ্চ, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণির মধ্যে একধরনের বিরোধ ছিল, শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মুসলমানরা মূলত ছিলেন পাকিস্তানপন্থী যাঁরা মুসলিম কৃষকদের সংগঠিত করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত 'মৌলভি'রা বিরাট সংখ্যায় ছিলেন ভারতপন্থী যাঁরা গণভোটের মতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালীনও পৃথক আবাসভূমির পরিবর্তে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে 'এক জাতি এক দেশ'-এর জন্য লড়েছিলেন। যার ফলে, এটি কেবল 'সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব' অনুসারী বনাম 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তির লড়াই

ছিল না। জাতি, ধর্ম, শ্রেণি ও বর্ণ অনুযায়ী যে সরল বিভাজন হয়েছে তাও নয়, বরং এর ভেতরে নানামুখীন দ্বন্দ্ব ছিল, যা শুধু পরস্পরবিরোধীই ছিল না বরং মাঠপর্যায়ে এটি একটি জটিল বিষয় হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে অনেকেই আবার স্ববিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হিন্দু অভিজাত শ্রেণি যারা জন্মগতভাবেই বাংলার সঙ্গে সিলেটের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য একমত ছিল তারাই ১৯৪৭ সালে সেই মতাদর্শ পরিবর্তন করে প্রচণ্ডভাবে আসামের সঙ্গে থাকার জন্য মনস্থির করেছিল। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি যৌথভাবে একটি সংঘ গঠন করেছিল যে সংগঠনটি সিলেটকে আসামের সঙ্গে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারাভিযানের আয়োজনও করেছিল। নিম্নবর্ণের কিছু লোক ছাড়া, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কেউই বাংলার সঙ্গে সিলেটের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য ভোট দেয়নি। অন্যদিকে, মাদ্রাসা শিক্ষিত মাওলানাদের মত, কিছু 'জাতীয়তাবাদী' অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম 'অবিভক্ত' ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের গণভোটের মাধ্যমেই সিলেটের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করছে যে, যখন সিলেটের সীমানা নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল, তখন জনগণের রায় বা সম্মতির প্রতি পুরোপুরি 'সম্মান' দেখানো হয়নি। সিলেটের এক-একটি অংশ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। বিভাজনের এই নতুন প্রক্রিয়ায় নেহরু নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শক্তিশালী 'লবি'ও কাজ করছিল, যার মধ্যে ছিলেন চা-বাগানে বিনিয়োগকারী 'হিন্দু পুঁজিপতি', সিলেটের কমিউনিস্ট নেতারা এবং উলামা-ই হিন্দ-এর মাওলানারা। তারাই ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থে আসামের সঙ্গে সিলেটকে সংযুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তথাপি, অভিজাত হিন্দুদের কেউ কেউ আগের মতোই অসন্তুষ্ট ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কলকাতায় বসবাসরত আইনজীবী সিলেটের রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী মাউন্টব্যাটেনের কাছে লিখেছিলেন, 'মহামান্য! কারচুপির গণভোট বাদ দিয়ে আরও একটা গণভোটের আয়োজন করুন।'[১২৪] অবশ্য সিলেটের কৃষক সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা জাহাজিদের (সমুদ্রযাত্রী) এবং হাজার মাইল দূর থেকে সিলেটে কাজ করতে আসা চা-শ্রমিকদের জন্য ১৯৪৭ সালের বিভাজন পুরোপুরিই ভিন্ন একটি বিষয় ছিল। এই দুটি গোষ্ঠীর মানুষ কেবল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হলো: বিশেষ করে কলকাতায় সিলেটি মাঝারি-ব্যবসায়ী, লজিং হাউসের মালিক এবং সমুদ্রগামী জাহাজে চাকরিজীবী মানুষগুলো নতুন পরিস্থিতিতে সুবিধাবঞ্চিত হয়ে ক্রমেই তাদের জীবিকা হারিয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৪৭ সালে নতুন সীমানা নির্মাণের ফলে চা-শ্রমিকেরা তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পাদটীকা

এই গবেষণাটি একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাসকে উপস্থাপন করছে। এটার সময়কাল হলো ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭। যার ইতিহাস ১৯৪৭-পরবর্তী ইতিহাস থেকে গুণগতভাবে আলাদা। সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হলেও বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে [সিলেটসহ] এই গুণগত পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃহত্তর বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কেবল সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন তা নয়, মাঠপর্যায়ে আন্দোলনের দুজন সংগঠক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ (বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী ও তাজউদ্দীনের ডায়েরি দ্রষ্টব্য)। পাকিস্তান কৃষক প্রজা তথা 'মজলুম' বা 'সর্বহারাদের' রাষ্ট্র হবে, এই প্রতিশ্রুতি যেমন জিন্নাহ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে দিয়েছিলেন, তেমনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কৃষি প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত সমাধান হবে ভেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে যৌক্তিক বলে রায় দিয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকে 'মুসলিম কৃষক' ও 'নিম্নবর্ণীয় হিন্দু'দের ঐক্যের রাজনীতি উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার অগ্রগতির বেশ সাফল্য বয়ে এনেছিল।

কিন্তু, ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস হলো পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুদিন পর পশ্চিম পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবি এলিটগণ নজিরবিহীন চতুরতার আশ্রয় নেন। স্বয়ং জিন্নাহ বাংলা ভাষা প্রশ্নে বাঙালিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। পাকিস্তান পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হলো। দাঙ্গা হলো এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তান থেকে পালিয়ে গেলেন। শুরু হলো প্রতিরোধ, যার গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে এবং পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালে 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'সমতাভিত্তিক' বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে, তখনো ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজিত হয়নি। ভারতের সংবিধানে এটি গ্রহণ করা হয়েছে আরও পাঁচ বছর পরে, ১৯৭৫ সালে। এই অভূতপূর্ব অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শুধু নিজের দেশেই নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা দুবার বিভক্ত হয়েছিল। দুই বিভক্তিকালে বাঙালিদের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ দুই রকম। প্রথমবার তাঁরা চেয়েছেন 'আমার সোনার বাংলা'কে এক রাখতে, দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভক্তির ব্যাপারে এঁরাই আবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইতিহাসের এই কৌতুকপ্রদ বিষয়ের স্ববিরোধিতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জয়া চ্যাটার্জির বেশ কিছু গবেষণা। এ ছাড়া তপন রায় চৌধুরীর আত্মজীবনী *বাঙালনামা*, দেবেশ রায়ের উপন্যাস *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* ইত্যাদিতে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের একটি বড় অংশের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার ছবি ফুটে ওঠে। ১৯৪০-এর দশকে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় 'ভয়ানক সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা' লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, সহায়-সম্পত্তি ফেলে কোটি কোটি মানুষের 'নিরাপদ দেশে' স্থানান্তরের মিছিলকেও দীর্ঘায়িত করছিল। এর পেছনে যে কেবল দ্বিজাতিতত্ত্ব দায়ী ছিল তা নয়, বরং আরও দুটি কারণও মোটাদাগে দায়ী ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের 'ভাগ করো ও শাসন করো' এবং 'হিন্দু এলিট বা উচ্চবর্ণীয় ব্যক্তিবর্গের সুবিধাবাদী রাজনীতি' দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা উৎসবকে কলঙ্কিত করেছে। ১৯৭১ সালে অসাম্প্রদায়িক

বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে গোটা অঞ্চলে অসাম্প্রদায়িকতার আলো ফেলেছিল।

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে বেশ দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে বৃহত্তর বাংলার তিনটি জেলা সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া নিয়ে ১৮৭৪ সালে আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ হলো। এটি শিগগিরই পরিচিতি পেল চা-প্রদেশ হিসেবে। ওই প্রদেশর রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতিতে বাঙালিরা বিশেষত সিলেটের বাঙালিরা (হিন্দু ও মুসলিম) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালে বাঙালি জেলাগুলোর মধ্যে কেবল সিলেটই ফিরে আসে ঐতিহাসিক গণভোটের মাধ্যমে। যা হোক, বর্তমান গবেষণায়, ১৮৭৪-১৯৪৭ সাল কালপর্বে আসাম ও সিলেটের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম ও অহমীয়া এলিট, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের ভূমিকার একটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. জয়িতা শর্মা, 'দ্য মেকিং অব মডার্ন আসাম, ১৮২৬-১৯৩৫', পিএইচডি, কেমব্রিজ, ২০০৩।

২. অনিন্দিতা দাসগুপ্ত, 'ডেনাইল অ্যান্ড রেজিসটেন্ট : সিলেট পারটিশন "রিফিউজি" ইন আসাম', *কনটেম্পোরারি সাউথ এশিয়া*, ১০(৩), ২০০১।

৩. দাসগুপ্ত, 'ডেনাইল অ্যান্ড রেজিসটেন্ট', পৃ. ৩৪৩।

৪. উইলিয়েম ভ্যান শ্যান্ডেল, *দ্য বেঙ্গল বর্ডার ল্যান্ড : বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া*, লন্ডন, ২০০৫, পৃ. ৩৮৫।

৫. জয়া চ্যাটার্জি, *বেঙ্গল ডিভাইডেড : হিন্দু কমিউন্যালিজম অ্যান্ড পারটিশন, ১৯৩২-১৯৪৭*, কেমব্রিজ, ১৯৯৪।

৬. বিদুৎ চক্রবর্তী, *দ্য পারটিশন অব বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, ১৯৩২-১৯৪৭*, লন্ডন, ২০০৪, পৃ. ২৭।

৭. হাজী মুহাম্মদ ইউনুস, সাক্ষাৎকার, লন্ডন ১২ এপ্রিল ২০০৮, এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাক্ষাৎকার, জুন ২০০৮। তাঁরা উভয়েই সিলেটের গণভোটের প্রচারাভিযানকারী ছিলেন। মুহিত বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী। হাজী মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৩০ ও ১৯৪০ দশকের ভূমি করের ওপর আমাকে তাঁর কিছু পারিবারিক দলিলপত্র দেখিয়েছেন। দক্ষিণ লন্ডনের ৩২ গিবসন সড়কে নুরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, ১৪ অক্টোবর ২০০৬ এবং ২১ জানুয়ারি ২০০৭-এ। তিনি ১৯৩০ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি একজন লেখক, যিনি প্রথম প্রবাসী সিলেটিদের ইতিহাস স্বদেশি ভাষায় লিখেছেন। তিনি তিনটি পতাকার অধীনে, যথা : ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে নিজ জীবনধারণের ইতিহাস (প্রত্যক্ষদর্শীর গল্প) নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। জনাব ইসলামের দুই নানা কলকাতায় গিয়েছিলেন জাহাজি হতে, তাঁদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা যান। নুরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা*, প্রবাসী প্রকাশনা, সিলেট, ১৯৮৯।

৮. আমি ১৯৯৬ সালে দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের জীবন-ইতিহাসের ওপর মৌখিক ইতিহাস প্রকল্পের প্রধান গবেষক ছিলাম। আবদুল গফুরও (এখন ব্যাংক কর্মকর্তা) একজন তদন্তকারী ছিলেন। প্রবন্ধটি তৈরি করার সময় আমি পুনরায় সাক্ষাৎকারগুলো পড়েছি, যেগুলো এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। আমরা দুজনে অনেক সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যার অনেক কিছুই এখনো আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

৯. মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সি আর দত্তের সাক্ষাৎকারও ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। আমি ১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজার জেলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর আলোকপাত করে একটি বই প্রকাশ করেছিলাম। বইটিতে মৌলভীবাজার জেলায় যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এ জেলা সিলেটের চারটি জেলার একটি। দত্তসহ অনেকের সাক্ষাৎকারই ওই সময়ে নেওয়া হয়েছিল।

১০. ক্যারোলিন অ্যাডামসের ব্যক্তিগত (চিঠি, টেপ ও ট্রান্সক্রিপশনস ফাইল) কাগজপত্রগুলো পি/এডিএম/ শিরোনামে টাওয়ার হেমলেটস লোকাল হিস্ট্রির লাইব্রেরি এবং আর্কাইভে রাখা হয়েছে, ব্যানক্রফট রোড, লন্ডন, পি/এডিএম/২/১১-১২-১৩।

১১. কলিন হে-উড, গ্রোইং *আপ ইন ফ্রান্স*, কেমব্রিজ, ২০০৭, পৃ. ৩২-৩৪।

১২. বিপিন চন্দ্র পাল, *মেমোরিস অব মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস*, ৩য় সংস্করণ, বিপিন চন্দ্র পাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৩। বিপিন চন্দ্র পাল সিলেটের এক মহান 'ভূমিপুত্র'। তিনি সিলেটের বিখ্যাত একজন আইনজীবী ও জমিদারের ছেলে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ালেখা করেছেন। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা রাজপথ-এর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন স্থপতি। তিনি আসামভাষী চা-শ্রমিকদের সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটনে কংগ্রেসকে বাধ্য করেছিলেন।

১৩. ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, *স্মৃতি এবং প্রতীতি*, ওরিয়েন্টাল বুকস, কলকাতা, ১৯৮২।

১৪. সুহাসিনী দাস, *সেকালের সিলেট*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

১৫. চঞ্চল কুমার শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ এবং সিলেট জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন*, কলকাতা, ১৯৮৪।

১৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *আত্মজীবনী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।

১৭. সি এম আবদুল ওয়াহেদ, *সিলেটে গণভোট*, ঢাকা, ১৯৯৯।

১৮. হেনরি কটন, *ইন্ডিয়ান এবং হোম মেমোরিস*, লন্ডন, ১৯১১।

১৯. জি পি স্টিওয়ার্ট, *দ্য রাফ অ্যান্ড দ্য স্মোথ : অ্যান অটোবায়োগ্রাফি*, হেরিটেজ প্রেস, ওয়েইকানেই, ১৯৯৪।

২০. মূলত, আসাম ১৮২০ সালে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশের অধীনে এসেছিল। তার আগে সিলেট ব্রিটিশরাজের সর্বশেষ পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশ ছিল। ১৮২৪ সালে অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশদের সঙ্গে বার্মার ১৮২৬ সালে ইন্দাবো চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যার ফলাফলই হলো ঔপনিবেশিক সীমান্তের স্থানান্তর।

২১. পাল, *মেমোরিস অব মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস*, পৃ. ১

২২. ইসলামের সাক্ষাৎকার, লন্ডন, ২০০৬, ২০০৭।

২৩. *সিলেটি নাগ্রি* স্ক্রিপ্টটি ১৪ থেকে ১৭ শতকের মাঝে বিকশিত হয়। সিলেটি শিক্ষাবিদ মৌলভী আব্দুল করিম ১৮৬০ দশকে এগুলোর কয়েকটি ছেপেছিলেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে *সিলেটি নাগ্রি* ছাপার জন্যে তিনটি প্রেস ছিল, এর একটি কলকাতায় এবং বাকি দুটি সিলেটে। ১৯৫০ সালের পর এসব স্ক্রিপ্ট অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২৪. আবদুল মোসাব্বির ভূঁইয়া, *জালালাবাদ নাগ্রি : আ ইউনিক স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড লিটারেচার অব সিলেটি বাংলা*, জালালাবাদ প্রেস, বদরপুর, আসাম, ১৯৯৯।

২৫. বি সি অ্যালেন, *আসাম জেলা গেজেটারস : সিলেট, আসামের সরকার*, কলকাতা, ১৯০৫, ভলিইম. ২, পৃ. ৭৪। নগেন্দ্রনাথ বসু, *দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি অব কাররুপ*, কলকাতা, ১৯৮৩, ভলিউম, ৩, পৃ. ১৩৯-৪০।

২৬. ভূঁইয়া, *জালালাবাদ নাথ্রি*, পৃ. ২-৫।

২৭. সিলেটিদের নেতৃত্বে ব্রিটেনে বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫০ সাল থেকে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংস্থার মতো কাজ করেছিল। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সামরিক শাসক কর্তৃক গ্রেপ্তার হলেন এবং প্রবাসীরা 'শেখ মুজিব ডিফেন্স তহবিল' গঠন করেন। তাঁদের অর্থে স্যার টমাস উইলিয়াম কিউ সি-কে ঢাকায় পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী হিসেবে লড়তে। ১৯৭০ সালে ব্রিটেনে প্রথম আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করা হয়েছিল। গৌছ খান সেখান সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তৈয়বুর রহমান সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই সিলেটি ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও লন্ডন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিণত হয়েছিল। দেখুন আশফাক হোসেন, 'হিস্টোরিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট : আ স্টাডি অব সিলেট অ্যান্ড ইটস পিপল, ১৮৭৪ টু ১৯৭১' *পিএইচডি অভিসন্দর্ভ*, ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম, ২০১০, পৃ. ১৪২-৫২। সারা গ্লিন, 'দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড : বেঙ্গলি পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন ইন লন্ডন'স ইস্ট অ্যান্ড আ কম্পেরিজন উইথ দ্য জিউস' পাস্ট', *পিএইচডি অভিসন্দর্ভ*, ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন, ২০০৩। কে টি গার্ডনার, *গ্লোবাল মাইগ্রেন্টস, লোকাল লাইভস : ট্রাভেল অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ইন রুরাল বাংলাদেশ*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড ১৯৯৫।

২৮. রবার্ট লিন্ডজি *অ্যানেকডটস অব অ্যান ইন্ডিয়ান লাইফ, প্রাচ্য বিবিধ*, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৮৪০, ভলিউম. ৫, পৃ. ৯৮-৯৯। লিন্ডজি ১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত সিলেটের প্রশাসক ছিলেন। অঞ্চলটি সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। ডেভিড লাদেন বলছেন যে ব্যবসায়ীরা মালদ্বীপ থেকে মুদ্রা কিনে কলকাতা ও চট্টগ্রামে পাঠাতেন এবং সেগুলো ঢাকায় মজুত করে রেখে পরবর্তী সময়ে সেগুলো নৌপথে চাল, মাছ ও অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সিলেটে ও আসামে পাঠাতেন। দেখুন লাদেন, *দ্য ফার্স্ট বাউন্ডারি অব বাংলাদেশ* পৃ. ১৪-১৫।

২৯. শংকর (যার প্রকৃত নাম মনি সংকর মুখার্জী) বাংলা ভাষার একজন জনপ্রিয় লেখক। শংকর, *বঙ্গ-বসুন্ধরা*, দেজ প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯৪-৯৫। সিলেটি সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য কমপক্ষে দুই শতাব্দী পূর্বে প্রসারিত হয়েছিল এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে যে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে লন্ডনের পূর্ব প্রান্ত, লিভারপুল, কারডিফ ও অন্যান্য বন্দর শহরে সিলেটিরা বিভিন্ন দলে বসবাস করত। দেখুন আশফাক হোসেন, *হিস্টোরিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট*, পৃ. ১৪২-১৫৫।

৩০. শামীম আজাদ, *সাক্ষাৎকার*, লন্ডন, ৬ এপ্রিল ২০০৮

৩১. হোসেন, *হিস্টোরিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট*, পৃ. ৫

৩২. হোসেন, *হিস্টোরিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট*, চৌধুরী, *স্মৃতি এবং প্রতীতি*, পৃ. ১৩২-৩৩

৩৩. *প্রসেডিং অব দ্য আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল* (অতঃপর পিএএলসি)

৩৪. আসাম সরকারের চিঠিতে বিস্তারিত দেওয়া আছে, তারিখ ৩ অক্টোবর ১৯২৪

৩৫. *ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস* (অতঃপর আইওআর), এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ.৩০-৩১।

৩৬. সঞ্জীব বড়ুয়া, *ইন্ডিয়া অ্যাগেইনেস্ট ইটসেলফ : আসাম অ্যান্ড দ্য পলিটিকস অব ন্যাশনালিটি*, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া প্রেস, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

৩৭. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৬৯। আরও দেখুন আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ৩১।

৩৮. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ১২।

৩৯. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৬৮।

৪০. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৭২-৭৩।

৪১. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৬৯-৭০।

৪২. অরুণ চন্দ্র ভূঁইয়ান ও অন্যান্য, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব আসাম ১৯২০-১৯৩৯*, আসাম সরকার, গুয়াহাটি, ১৯৭৮, ভলিউম. ২, পৃ. ২৯২।

৪৩. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৭০।

৪৪. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৮৬-৮৭।

৪৫. পিএএলসি, আগস্ট ১৯২৪, পৃ. ৫৮৯।

৪৬. পিএএলসি, জানুয়ারি ১৯২৬, পৃ. ১২৬।

৪৭. পিএএলসি, জানুয়ারি ১৯২৬, পৃ. ৪১।

৪৮. ১৯২০ সালে মোহাম্মদ সাদুল্লাহ আসামের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নাইট উপাধি পেয়েছিলেন এবং ১৯৩৫ সালের পরে তিন তিনবার আসামের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৪৯. পিএএলসি, জানুয়ারি ১৯২৬, পৃ. ৬০।

৫০. পিএএলসি, জানুয়ারি ১৯২৬, পৃ. ২৭-২৮।

৫১. মাহমুদ আলী, *রিসার্জেন্ট আসাম* (আসামের পুনরুত্থান), ন্যাশনাল প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৯৩।

৫২. আতফুল হাই শিবলী, *আবদুল মতিন চৌধুরী : ট্রাসটেড **লেফটেন্যান্ট** অব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ*, ২০১১, পৃ. ১৬১-৬৬।

৫৩. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ২৩।

৫৪. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ২৩।

৫৫. ১৯৩২ সালে রিচার্ড অস্টিন বাটলার ভারতের সহকারী সচিব ছিলেন। তিনি শ্রমবিষয়ক দায়িত্ব পালন শেষে পররাষ্ট্র কার্যালয়ে সহকারী সচিব হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে যান রাজস্ব দপ্তরে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অর্থসচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৫৬. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ১।

৫৭. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ২।

৫৮. আইওআর/৫/১১/১৯৭৬। আসামের সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি। নম্বর. পল-১৯১৭-৫৫৮৫,৩০ অক্টোবর ১৯২৪। পরিশিষ্ট এ, পিএএলসি, জানুয়ারি ১৯২৬, পৃ. ২৩-র সঙ্গে চিঠিটি যুক্ত করা হয়েছে।

৫৯. আইওআর/এল/পিঅ্যান্ডজে/৯/৫৯, পৃ. ২।

৬০. ই জে ফুলেই, *দ্য সুরমা ভেলি ম্যাগাজিন*, ১(৯), ১৯২৭, পৃ. ১৭। ফুলেই ১৯২০ সালে তার বাবার কাছে লিখেছিলেন যে, এইচ সি সুদারল্যান্ড, যিনি সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, তিনিও চা-বাগানে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। আরও একটি উদাহরণ, জন হেনরি কার ছিলেন ইন্ডিয়ার সিভিল সার্ভিসের বিখ্যাত এক অফিসার। তিনি জন স্মিথ কারের ছেলে ছিলেন। আর জন স্মিথ ছিলেন স্কটল্যান্ডের একজন চা ব্যবসায়ী।

৬১. কটন, *ইন্ডিয়ান অ্যান্ড হোম মেমোরিস*, পৃ. ২৭৫।

৬২. কটন, *ইন্ডিয়ান অ্যান্ড হোম মেমোরিস*, পৃ. ২৭৬।

৬৩. সি গিমসনের চিঠি থেকে, নম্বর. ৫৪৫ আইআর, সিলেট, তারিখ ২৪ জুন ১৯২৫।

৬৪. পিএএলসি, জানয়ারি ১৯২৬, পৃ. ৬২-৬৩

৬৫. *অ্যাসাম রিভিউ*, নভেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৪৪। জি পি স্টিওয়ার্ট, ১৯৩০ সালে সিলেটের জেলা কমিশনার হিসেবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন যে 'সিলেট শহর ভারতের একটি বড় শহর ছিল। সিলেট জেলাটি আসামে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে বড় মিলনকেন্দ্র ছিল। পুরো জেলায় চা-বাগানের ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার এবং ইউরোপবাসী ছিল। এর অর্থ হলো, সিলেট শহরে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় চা আবাদকারীর ক্লাব ছিল।' দেখুন স্টিওয়ার্ট, *দ্য রাফ অ্যান্ড দ্য স্মোথ*, পৃ. ৩৫।

৬৬. চৌদ্দ শতকে উপমহাদেশে আধ্যাত্মিক পীর শাহজালাল সিলেটি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয়দের জন্য একটি নতুন যুগের দ্বার খুলে দেন। শ্রীচৈতন্য সিলেটে তাঁর নানার বাড়িতে বড় হয়েছেন, যিনি পরবর্তী সময়ে গোত্রবিরোধী আন্দোলনে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৬৭. হোসেন, *হিস্টোরিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট*, পৃ. ৭৫-৭৬।

৬৮. *ভারতের আদমশুমারি প্রতিবেদন*, ভলিউম, নয়, ১৯৪১, আসাম, পৃ. ৩৮-৪১।

৬৯. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪-৫। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে লিয়াকত আলী খানের চিঠি।

৭০. ভারত সরকার, আসামের জেলাগুলোতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন, কাছাড় এবং সিলেট, ৩১ মার্চ ১৮৭৬ (কলকাতা, ১৮৭৭), পৃ. ৪।

৭১. বাংলার সরকার, ১৮৮৯ সালের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন (কলকাতা, ১৮৯০), পৃ. ৪।

৭২. কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ *ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সভার প্রতিবেদন*, ২৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৬। দেখুন এনএবি, এ প্রসেডিং, রাজনৈতিক (হোম), ১৮৯৬, বান্ডেল নম্বর ১।

৭৩. রণজিৎ রায়, 'নোটস অন সিলেট রেফারেন্ডাম (গণভোট)' সুজিত কে ঘোষ (সম্পাদিত), *পলিটিকস অব সাবভার্সন অব সিলেট*, বি আর প্রকাশনা, দিল্লি, ২০০০, পৃ. ২৩।

৭৪. দেখুন <http://assamassembly.gov.in/mla-1946-52.html>, [accessed 15 May 2012].

৭৫. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ২৪।

৭৬. হাজী মুহাম্মদ ইউনুস, সাক্ষাৎকার, এবং এ এম এ মুহিতের সাক্ষাৎকার।

৭৭. নানকাররা স্থানীয় জামিনদারদের শ্রমিক হিসেবে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা সিলেটে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন কিছু অঞ্চলে মুসলিম জামিনদার নানকারদের ডাকতেন 'কিরান' বা 'এটে মান্দার' আবার কিছু হিন্দু জামিনদাররা ডাকতেন 'ভান্ডার' বলে। নানকাররা হিন্দু ও মুসলিম ছিল। স্থানীয় কমিউনিস্টরা ১৯৫০ সালে নানকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল।

৭৮. শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ*, পৃ. ২২১।

৭৯. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪-৫।

৮০. গুহ, *প্লান্টার রাজ থেকে স্বরাজ*, পৃ. ২১৯-২০।

৮১. ঘোষ (সম্পাদিত), *পলিটিকস অব সাবভারশন*, পৃ. ৯৯।

৮২. আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১১০।

৮৩. উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো : কৌমুদানন্দ ভট্টাচার্য, মৃণাল দাস, সুকুমার নন্দী ও জয়কুমার নন্দী, যাঁরা এই গ্রাম থেকে এসেছেন।

৮৪. শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ*, পৃ. ২১৮-১৯।

৮৫. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের সংসদীয় পরিষদের নেতা ও মুসলিম লীগের মনোনয়নপ্রার্থী হিসেবে কাজ করেছিলেন। যা হোক, জিন্নাহর মৃত্যুর পর মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং ভারতে অভিবাসী হয়েছিলেন। জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, *মহাপ্রাণ, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল*, কলকাতা, ১৯৭৫।

৮৬. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৬১।

৮৭. যেইমাত্র গণভোট শেষ হলো, স্থানীয় কমিউনিস্টরা নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে স্থানীয় বামধারার কর্মীরা মনে করতেন মুসলিম লীগ হচ্ছে কৃষক-প্রজার দল এবং তারা এর 'পৃথক জাতীয়তাবাদ'কে পছন্দ না করলেও কৃষি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সমাধান হিসেবে শেষাবধি পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করে।

৮৮. আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৪।

৮৯. ডাস, *সেকালের সিলেট*, পৃ. ৫১।

৯০. আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৫।

৯১. মাহমুদ আলী, *রিসার্জেন্ট আসাম*, পৃ. ৮০-৮১। আরও দেখুন আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১২০।

৯২. সৈয়দ আবদুল মজিদ কোরেশী, পি/এডিএম/২/১১-১২-১৩, পৃ. ২১।

৯৩. আলী, *রিসার্জেন্ট আসাম*, পৃ. ৮১। ডাস, *সেকালের সিলেট*, পৃ. ৫০।

৯৪. ওয়াহেদ, *সিলেট-এ গণভোট*, পৃ. ৪২-৪৩। তাঁর বইয়ে মাওলানা সাহোল ওসমানীর একটি মুদ্রিত লিফলেট তিনি পুনরুদ্ধৃত করেছেন।

৯৫. আলী, *রিসার্জেন্ট আসাম*, পৃ. ৮১-৮২।

৯৬. আতফুল হাই শিবলী, *আবদুল মতিন চৌধুরী : ট্রাসটেড লেফটেন্যান্ট অব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ*, ২০১১, পৃ. ১৬১-৬৬।

৯৭. সৈয়দ আবদুল মজিদ কোরেশী, পি/এডিএম/২/১১-১২-১৩,পৃ.১৬।

৯৮. আলী, *রিসার্জেন্ট আসাম*, পৃ. ৮১-৮২। আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৫। ডাস, *সেকালের সিলেট*, পৃ.৪৯-৫১। ওয়াহেদ, *সিলেট-এ গণভোট*, পৃ. ৫৭-৬৮।

৯৯. ওয়াহেদ, *সিলেট-এ গণভোট*, পৃ. ৪৫-৪৯।

১০০. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪৮।

১০১. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪৮।

১০২. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪৮-৪৯।

১০৩. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৪৯। গণভোটকালে সিলেটের কংগ্রেসের নেতা বসন্ত কুমার দাস আসাম মন্ত্রিপরিষদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বিভিন্ন তথ্যে দেখা যায়, তিনি সিলেট জেলা কংগ্রেসের অনুকূলে কাজ করেছিলেন।

১০৪. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, পৃ. ৫৪।

১০৫. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, টেলিগ্রাম : যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আইন সদস্য, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল, ৭ জুলাই, পৃ.৬৪।

১০৬. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, টেলিগ্রাম : শিলং ও আসামের সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লি ও লন্ডনে, ৭ জুলাই, ১৯৪৭, পৃ. ৭৩।

১০৭. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, টেলিগ্রাম : কনফিডেনশিয়াল ২২৪৮-এস : আসামের সরকারের পক্ষ থেকে ভাইসরয়কে, ১২ জুলাই, ১৯৪৭, পৃ. ৭৭।

১০৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সাক্ষাৎকার, ১৯৯৬। আরও দেখুন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১৩১-৩২।

১০৯. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, মাউন্টব্যাটেনকে নেহরুর চিঠি, ১৩ জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ৮৫।

১১০. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, নেহরুকে মাউন্টব্যাটেনের চিঠি, ১৩ জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ৯৫-৯৬।

১১১. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, টেলিগ্রাম : নেহরুকে আকবর হাইদেরি, ১৪ জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ৮৯-৯০।

১১২. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, মাউন্টব্যাটেনকে নেহরুর চিঠি, ১৫ জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ৯৫-৯৬।

১১৩. শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ*, পৃ. ২২০-২১। ঘোষ, *পলিটিকস অব সাবভার্সন*, পৃ. ৯৯।

১১৪. আইওআর/আর/৩/১/১৫৭, টেলিগ্রাম, ভাইসরয়কে আসামের সরকার, নিউদিল্লি, নম্বর.১৭৫-এমএসজি, ১০ আগস্ট ১৯৪৭। পৃ. ২৬৯।

১১৫. আইওআর/আর/৩/১/১৫৭, টেলিগ্রাম, নিউদিল্লির ভাইসরয় থেকে আসামের সরকারকে, নম্বর. ৩৩২৯-এস, ১১ আগস্ট ১৯৪৭, পৃ. ২৭৫।

১১৬. একজন বিদায়ী ব্রিটিশ কর্মকর্তা, এইচ ক্রিড লিখেছিলেন, 'এটা মনে হচ্ছে যে পুরো সীমানা পূর্ব বাংলা (সিলেট)-র সঙ্গে রাখা উচিত (প্রধানত করিমগঞ্জ)। ভবিষ্যতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির কোনো সম্ভাবনা পরিহার করার জন্য সীমানারেখা চিহ্নিত করা উচিত। দেখুন ১১৭ আইওআর/৫/২৪/২৬০১-২৬০২, *আসামের সরকার*, বার্ষিক প্রতিবেদন, বছরান্তের জরিপ বিভাগ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ (শিলং, ১৯৪৮), পৃ. ৩

১১৭. ইসলাম, সাক্ষাৎকার, ২০০৬, ২০০৭। আরও দেখুন ইউসুফ চৌধুরী, দ্য রোট অ্যান্ড টেলস অব বাংলাদেশি সেটলারস, বার্মিংহাম, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬-৩৯। বাড়িওয়ালার বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় চৌধুরীর বইয়ে। উনিশ শতকের শেষ দিকে সিলেটি বাড়িওয়ালারা কলকাতায় তাঁদের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে, আইয়ান উল্লাহ অনেক বোর্ডিং বা বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি খুব দ্রুতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সিলেটি অনুসারীদের জাহাজে চাকরি পেতে সাহায্য করছিলেন।

১১৮. শর্মা, শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ, পৃ. ২১৯।

১১৯. দাস, সেকালের সিলেট, পৃ. ৫২।

১২০. চৌধুরী, স্মৃতি ও প্রতীতি, পৃ. ১৫২,২২৪-২৬।

১২১. চৌধুরী, স্মৃতি ও প্রতীতি, পৃ. ১৫২।

১২২. জেনারেল দত্ত, সাক্ষাৎকার।

১২৩. দেখুন দাস, সেকালের সিলেট।

১২৪. আইওআর/আর/৩/১/১৫৮, ১৯৪৭ সালের ১৭ জুলাই কলকাতাভিত্তিক সিলেটি আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী মাউন্টব্যাটেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এটি অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট হয়নি। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে ভাইসরয়ের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যই পুনরায় একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট হওয়া দরকার।'

অনুবাদ : **শিল্পী বেগম**

(রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

খাতি সমাজ চিন্তা

বাংলাদেশে কিশোরীদের যৌন হয়রানির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা

পাপড়ীন নাহার, মার্টিন ভ্যান রিওয়্যাক, রিয়া রিইস

সারসংক্ষেপ

অনেক সমাজেই নারীদের অধস্তন রাখার একটি সামাজিক কৌশল হল নারীর প্রতি সহিংসতা। এর ফলে মেয়েরা ক্রমাগত নিরাপত্তাহীনতা ও আত্মমর্যাদাহীনতায় ভুগতে পারে। নারীর ওপর যৌন সহিংসতা এবং হয়রানির নজির প্রায় সব সমাজেই বিদ্যমান, যার নানা ধরনের নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে। এই প্রবন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধরনের যৌন হয়রানি—যথা 'ইভ টিজিং'-এর বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের কিশোরীরা (১২ থেকে ১৮ বছর) যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, সেটি যুবক-যুবতীদের দ্বারা সংঘটিত বয়ঃসন্ধিকালীন যৌন আচরণ-সম্পর্কিত এই গবেষণা থেকে উঠে এসেছে। এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতিসমূহ এবং একটি অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচ, যেমন ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস, মূল জ্ঞাপকের সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে, নিষিদ্ধ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীরা যৌনতা, যৌন-কামনা উদ্রেককারী আনন্দ এবং রোমান্স বিষয়ে সক্রিয়ভাবে জানতে আগ্রহী এবং এসব তারা জেনে যায়। এসব তথ্য খুব সহজেই ভিডিও, মোবাইল ফোন ক্লিপস এবং পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিন থেকে পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, একদিকে অবদমিত সামাজিক ব্যবস্থা, অন্যদিকে অবাধ তথ্যের বিচরণ দুই দুইয়ের বহিঃপ্রকাশ লিঙ্গবৈষম্যকে উসকে দেয়। কিশোরদের যৌন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম হচ্ছে 'ইভ টিজিং', তারা এটি করে আনন্দ পায় এবং তাদের পৌরুষত্ব প্রকাশ করতে পারে। কিশোরীরা এটা অপছন্দ করে এবং এটা করতে প্ররোচিত করার দায়ে দোষী হওয়ার ভয়ে থাকে। সুতরাং, 'ইভ টিজিং' বাংলাদেশে যৌনতা-সম্পর্কিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শসমূহ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপ্রতুলতার ফল। এই তথ্যসমূহ একটি সমন্বিত যৌন-শিক্ষার গুরুত্বকে নির্দেশ করছে, যা নিছক স্বাস্থ্যকেন্দ্রিকতার বাধা ডিঙাবে এবং জেন্ডার-সম্পর্কিত আদর্শসমূহ তুলে ধরবে এবং তরুণ-তরুণীদের সামাজিক-যৌনতা মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতাসমূহ অর্জনে সাহায্য করবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

ইভ টিজিং, কিশোর-কিশোরী, যৌন হয়রানি, জেন্ডার বৈষম্য, যৌনতা-শিক্ষা, বাংলাদেশ।

প্রারম্ভিক আলোচনা

২০০৯ সালে বাংলাদেশি চারজন ছেলে এবং চারজন মেয়ের (যাঁদের বয়স ১৭ থেকে ২৩ বছর) একটি দলকে দুজন নৃবিজ্ঞানীর সহযোগিতায় সহগবেষক হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই দলের কাজ ছিল কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, চাহিদা, চিন্তাভাবনা এবং এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানা। তারা কীভাবে যৌনতাবিষয়ক তথ্য পায় এবং সেই চাহিদা এবং প্রাপ্তি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের সঙ্গে মিলে যায় কি না, সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং সাক্ষাৎকারগুলো থেকে দেখা যায় যে কিশোরীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে যে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ বার উল্লেখ করেছে, তা হলো প্রকাশ্য স্থানে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা, যা সাধারণত 'ইভ টিজিং' নামে পরিচিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত। 'ইভ টিজিং' একটি ভারতীয় উপমহাদেশীয় ইংরেজি শব্দ। এ শব্দটি দক্ষিণ এশিয়ায় বহুল ব্যবহৃত। প্রকাশ্যে ছেলে ও পুরুষেরা যখন মেয়ে ও নারীদের উৎপীড়ন করে, ছেলেরা গণপরিবহন, রাস্তা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের পথরোধ করে, মেয়েদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে কটুবাক্য বলে, হাসাহাসি করে, অপহরণের হুমকি দেয় এবং এমনকি অযাচিতভাবে মেয়েদের স্পর্শ করে তখন তাকে 'ইভ টিজিং' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১] দক্ষিণ এশিয়ার জনসংস্কৃতিতে 'ইভ টিজিং'কে নারী ও পুরুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জনপ্রিয় ধারার অনেক বাণিজ্যিক হিন্দি/বাংলা চলচ্চিত্রে বিয়ে-পূর্ব প্রেমের সম্পর্কের শুরু হিসেবে নায়ক বা খলনায়ককে চপলতায় নিয়োজিত হতে দেখা যায়[২] এবং পরিমিত যৌন হয়রানিকে প্রায়ই মজার এবং রোমান্টিক হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩] যে রোমান্টিক মজার ব্যাপারটিতে নায়িকার ব্যাপক আপত্তি থাকে তবে নায়ক তা সত্ত্বেও সেই মজাটি করতে থাকে। নায়ক-নায়িকার প্রথম মিথস্ক্রিয়ায় নায়ক নির্লজ্জ চপল আচরণের মাধ্যমে নায়িকাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে আর নায়িকা এই আচরণের ব্যাপক আপত্তি জানাবে। নায়ক-নায়িকার এই আচরণ সামাজিক লিঙ্গ সম্পর্কবিষয়ক শিক্ষারও একটা প্রতিফলন। শিক্ষাকে প্রভাবিত করায়, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি নির্ধারণে অবদান রাখায় (এ ক্ষেত্রে হিন্দি চলচ্চিত্রের গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তরুণ-তরুণীদের বিনোদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম) বিশেষভাবে বিপজ্জনক। এভাবে জনপ্রিয় ধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নারী-পুরুষের যোগাযোগের একটা মডেল সরবরাহ করে।

যা হোক, 'ইভ টিজিং' শব্দটির দ্বারা যে পরিসরের ব্যবহারকে বোঝায় তা ততটা গুরুত্ব পায় না। একজন গবেষক[২] এই বিষয়টিকে দেখেছেন নারীদের প্রতি সহিংসতাকে স্বাভাবিকীকরণের একটি কৌশল হিসেবে, যার অর্থ হলো নারী একই সঙ্গে ঠাট্টার পাত্র এবং ঠাট্টাই তার প্রাপ্য। দ্ব্যর্থহীনভাবে যৌন হয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ভারতীয় নারী আন্দোলনই প্রথম এই সাংস্কৃতিক আচরণ এবং বোধকে চ্যালেঞ্জ করে।

ঐতিহাসিকভাবে উত্তর-উপনিবেশকালের শুরুতে ভারতীয় নারীরা 'ইভ টিজিং'কে প্রথম নথিভুক্ত করে, যখন তারা চাকরি এবং সামাজিকীকরণের জন্য জনপরিমণ্ডলে যুক্ত হওয়া শুরু করেন।[২] বাংলাদেশেও সম্ভবত ১৯৮০ সাল থেকে এই একই গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে এর চর্চা শুরু হয়, যে সময়টিতে অবৈতনিক নারী শিক্ষা, গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং এনজিও প্রবর্তিত শ্রমশক্তি যেমন : স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়।[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশের নারীশিক্ষাকে স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি এবং সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও সক্রিয়তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হলেও, নির্দিষ্ট ধরনের জেন্ডারবৈষম্য এখনো রয়ে গিয়েছে, যেমন : অসম বেতন, জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা।[৫, ৬]

যদিও একটা গবেষণায় দেখা দেখা গেছে যে, ইদানীং নারী ও মেয়েদের জনপরিসরে চলাফেরা খুব সাধারণ বিষয়ে পরিণত, এবং বয়স্ক মহিলাদের ৪৯ শতাংশ এবং তরুণীদের ৩৮ শতাংশ তাদের নিজেদের আশপাশের এলাকার মধ্যে বের হতে নিরাপদ বোধ করে।[৫] প্রকৃতপক্ষে, এর বিপরীত একটি চিত্রও রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এবং গণপরিবহন ব্যবহারের সময় 'ইভ টিজিং'-এর শিকার হওয়াকে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহের একটি প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৭]

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে নারীবাদী আন্দোলন যৌন হয়রানি-সম্পর্কিত একটি নতুন আইন পায়, যে আইনে 'ইভ টিজিং'-এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮, ৯] ২০১০ সাল থেকে 'ইভ টিজিং' বাংলাদেশেও একটি অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক তা এখন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 'ইভ টিজিং' বিষয়টি এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে নারীদেরকে যৌন হয়রানির অপরাধ বিচারের জন্য সরকার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এই নীতি অনুযায়ী যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তির ৭০০০ টাকা (৮৯ মার্কিন ডলার) জরিমানা থেকে শুরু করে এক বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে। গণমাধ্যমে প্রায়ই খবর প্রকাশিত হয় যখন কোনো ব্যক্তি এই অপরাধে ধৃত এবং দণ্ডিত হন, বিশেষত যে ঘটনাগুলো সহিংস হয়। নারীদের

প্রতি সহিংসতা, বিশেষত ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদে কিছু সামাজিক আন্দোলন চলমান থাকে, যেমন মিউজিক কনসার্ট।

এই প্রবন্ধে আমরা ইভ টিজিংয়ের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করেছি, যে সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি এমন একটি যৌন আচরণ যেখানে বিপরীত ব্যক্তির প্রতি সম্মান অনুপস্থিত থাকে, যা অপর পক্ষের জন্য বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। ধর্ষণের বিপরীতে, ইভ টিজিং যৌন সহিংসতার একটি ধূসর অবস্থানে থাকে, যেটি তুলনামূলক কম পরিস্ফুট, বিপরীত পক্ষের অসম্মতিতে যৌন আচরণ বা অভিব্যক্তির সমন্বয়ে ঘটে থাকে, যা যৌন স্বাতন্ত্র্যকে লঙ্ঘিত করে এবং যেটি কর্তৃত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিতে 'স্বাভাবিক' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[১০]

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর মতে, বাংলাদেশে ইভ টিজিং বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা এবং এগুলোর ফলাফল যেমন: অপহরণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, খুন ও আত্মহত্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫, ১১-১৬] 'ইভ টিজিং'-এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হচ্ছে। ২০১০ সালে বারবার এই যৌন হয়রানির খবর পাওয়া যায়, যা থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশে ২৮ জন মেয়ে/নারী আত্মহত্যা করে এবং অন্য ৭ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে।[৪] ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী বাংলাদেশি মেয়েদের ৯০ শতাংশই ইভ টিজিংয়ের শিকার হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে।[১৪, ১৭]

এই প্রবন্ধের মূল আলোচিত বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে কিশোরীরা (১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী) কীভাবে ইভ টিজিংয়ের শিকার হয় এবং তারা এর ওপর কী অর্থ আরোপ করে এবং মেয়েদের ইভ টিজিং করার বিষয়ে কিশোরদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার ধরন। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাব যে যৌনতা এবং জেন্ডার-সম্পর্কিত ক্ষতিকর সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি থেকেই ইভ টিজিংয়ের উদ্ভব হচ্ছে। যৌনশিক্ষা, সরকারি, বেসরকারি পরিষেবা প্রদান এবং সামাজিক পরিবর্তনের নিরিখে বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালীন যৌন এবং প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার উৎসাহিতকরণে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপলব্ধিসমূহ কী বার্তা প্রদান করছে, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

গবেষণাপদ্ধতি

সহগবেষকদের বাছাই করা হয় ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এফপিএবি) যুব কর্মসূচির একদল সহপ্রশিক্ষক থেকে, যারা সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছিল। তারা সবাই 'তারা' নামক একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১৮] তরুণ-তরুণীদের যৌনতা-বিষয়ক অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও চিন্তাভাবনা এবং

তরুণ-তরুণীদের যৌনতা-বিষয়ক তথ্য ও সেবার চাহিদা কতটুকু তারা প্রকল্প পূরণ করতে পারে, এ বিষয়ে সহগবেষকেরা তথ্য সংগ্রহ করে। গবেষণাটি বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলের একটি শহর যশোরে এফপিএবির একটি যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এফপিএবি কাজ করে এ রকম বাংলাদেশের চারটি জেলা (যশোরসহ) থেকে নবীন গবেষকেরা এসেছিলেন এবং সহপ্রশিক্ষক থাকার সময় তাঁদের কৃতিত্ব এবং তাঁদের প্রণোদনাপত্রের ভিত্তিতে তাঁদের বাছাই করা হয়েছিল। তাঁরা সবাই স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং অবিবাহিত ছিলেন। গুণগত গবেষণা দক্ষতার ওপর তাঁদের দুই সপ্তাহের একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং গবেষণা পরিকল্পনা এবং সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা তাঁদের সঙ্গে মিলে তৈরি করা হয়।

এফপিএবি এবং প্রথম লেখকের সহযোগিতায় গবেষণা দল গুণগত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিচের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে: ২৩৭ জন অবিবাহিত ছেলে ও মেয়ে সঙ্গে ২৮টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি); ৬ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, ১১ জন প্রাপ্তবয়স্ক, ১৫ জন মেয়ে এবং ১৬ জন ছেলে, সেই ৪৮ সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার; সমাজের নেতারা, পিতা-মাতা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যক্তিবর্গ এবং এফপিএবির সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দুটি প্যানেল আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া একটি যুববান্ধব সেবাকেন্দ্র, দুটি রাস্তার পাশের জায়গা, যেখানে ফেরিওয়ালারা যৌন সমস্যার স্থানীয় ওষুধ বিক্রয় করে, দুটি পাবলিক পার্ক এবং দুটি সাইবার ক্যাফে—(যেগুলো তরুণ-তরুণীরা ডেটিং প্লেস হিসেবে ব্যবহার করেন) পর্যবেক্ষণ করা হয়। যশোর পৌরসভার বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কিশোর-কিশোরীদের তথ্য-প্রদানকারী হিসেবে বাছাই করা হয় এবং এর মধ্যে আরও ছিল: শহরাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় এবং ইসলামিক বিদ্যালয় এবং কলেজের (মাদ্রাসা) ছাত্রছাত্রী, বস্তিবাসী, এতিমখানার কিশোর-কিশোরী, কিশোরী যৌনকর্মী, যুববান্ধব সেবাকেন্দ্রের অভ্যাগত এবং যশোর শহরের আশপাশের গ্রামীণ এলাকার কিশোর-কিশোরী। ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে পৃথকভাবে এফজিডি সম্পন্ন হয় এবং এই সময় তাদের ১২-১৫ বছর এবং ১৬-১৮ বছর বয়সী দুটি দলে ভাগ করা হয়।

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় উন্মুক্ত এবং অ্যাক্সিয়াল কোডিং পদ্ধতিতে। উপরন্তু যুবকেন্দ্রের বেনামী প্রশ্ন বাক্সে কিশোর-কিশোরীদের তোলা প্রশ্ন এবং কিশোর-কিশোরীরা যৌনতা-সম্পর্কিত তথ্যের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছে এমন স্থানীয় গান, ম্যাগাজিন, কৌতুক ভিডিও, সিডি, চলচ্চিত্র এবং মোবাইলে ডাউনলোড করা তথ্যসমূহের কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করা হয়। সম্প্রদায়ের সদস্যরা এবং এফপিএবির কর্মী সদস্যদের কাছে গবেষণার তথ্যসমূহ উপস্থাপন

করা হয় এবং এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল: সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়ন পাওয়া, প্রারম্ভিক সিদ্ধান্তগুলো যাচাই করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন। প্রক্রিয়া এবং ফলাফল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এই গবেষণাভিত্তিক লিখিত আরেকটি প্রবন্ধে।[১৯] নবীন গবেষক দলের গভীর বিশ্লেষণমূলক জোগানের সাহায্যে চূড়ান্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন লেখার কাজ করেন প্রথম লেখিকা।

প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা-প্রক্রিয়া চলার সময় নবীন গবেষকেরা ক্রমাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন এবং কীভাবে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হয় তা শেখে। তথ্য প্রদানকারীকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তা নির্বাচনের, যেভাবে প্রশ্ন করেছে, যেভাবে তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করেছে, তার মধ্য দিয়ে তাঁরা তথ্য প্রদানকারীর তথ্যকে প্রভাবিত করা থেকে কীভাবে বিরত থাকতে পারে, সে সম্পর্কে শিখেছেন। পক্ষপাতিত্ব কমানোর জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরপরই তাঁদের প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করতে বলা হয় এবং প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহের পর রিপোর্ট এবং অনুধ্যায় পর্বের আয়োজন করা হয়। এই পর্বগুলো কীভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং প্রারম্ভিক সিদ্ধান্তে মতৈক্য অর্জনেও সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য যৌনতাবিষয়ক কথা বলা একটা দুঃসাহসিক কাজ, এফজিডিতে তথ্য প্রদানকারীরা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশ করতে লজ্জা বা ভয় পাচ্ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বন্ধুবান্ধব বা জ্ঞাতি ভাইবোনের অভিজ্ঞতার কথা বললেও, নিজেদের কথা বলছিল না। এটা গবেষণাকে ব্যাহত করেনি, কারণ আমরা কিশোর-কিশোরীদের কাছে যৌন বাস্তবতার সাধারণ ধরন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। যা হোক, এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়মাত্মক ছিল, ফলে এর সঙ্গে অন্য উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের যতটা সম্ভব বেশি সমন্বয় সাধন করা হয়। গবেষণার শেষের দিকে ওই সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে আটটি অবধারণমূলক ঘটনা-বিবরণ তৈরি করা হয়, যা যুবকেন্দ্রের অভ্যাগতদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং এই বিষয়ে তাদের মতামত নেওয়া হয় (বিস্তারিত[১৯])।

গ্রামীণ নিরক্ষর যুবক-যুবতীদের কাছে যৌন বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত, গ্রামীণ বাণিজ্যিক যৌনক্রিয়ার ধরন বা গ্রামীণ মাতা-পিতা ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত সংগ্রহ করতে আমরা সক্ষম হইনি। উপরন্তু, এতিম ও বস্তিবাসী মেয়েদের অভিজ্ঞতার বিষয়েও যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধান করা হয়নি, যা হয়তোবা এই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ভিন্নতা বিষয়ে আরও সমন্বিত অন্তর্জ্ঞান দিতে পারত।

ফলাফল

এই গবেষণায় ছেলে ও মেয়েদের পার্থক্যমূলক সামাজিক অবস্থান উন্মোচিত হয়েছে। এখানে দেখা গেছে, যদি মেয়েরা তাদের যৌন আচরণ-সংক্রান্ত কঠোর রীতিনীতিগুলো মেনে না চলে, তবে তারা কঠোর সামাজিক কলঙ্কের সম্মুখীন হয় (ছেলেদের চেয়ে যা অনেক বেশি), একজন উপযুক্ত স্বামী নির্বাচনের সম্ভাবনা কমে যায় এবং তার পরিবারকে তার বিয়ের সময় বেশি যৌতুক দিতে হয়। এটা অনেক মেয়েকে তাদের কুমারীত্ব রক্ষায় প্রণোদিত করে। বিবাহ-পূর্ব যৌনতা-বিষয়ক সামাজিক নিয়মসমূহ প্রধানত মেয়েদের ওপর আরোপ করা হয়, ফলে তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয় এবং সামাজিকভাবে ছেলেদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা বাধাগ্রস্ত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক এবং ছোটদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে যৌনতা-বিষয়ক আলোচনাও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, লিঙ্গ পৃথক্করণ এবং যৌনতাকেন্দ্রিক সামাজিক বিধিনিষেধসমূহ বাংলাদেশে অবিবাহিত ব্যক্তিদের যৌনতা-বিষয়ক শিক্ষা এবং সেবা প্রদানকে কঠিন করে তুলেছে।

যৌন আনন্দের অন্বেষণ এবং যৌনতা-বিষয়ক উপকরণ

সামাজিক বিধিনিষেধ ও রীতিনীতি সত্ত্বেও অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীরা সক্রিয়ভাবে যৌন-কামনা উদ্রেককারী আনন্দ এবং রোমান্সের পন্থাসমূহের পথ খোঁজে। প্রধানত ছেলেরা কিন্তু মেয়েরাও তাদের বন্ধুবান্ধবী, বয়সে বড় জ্ঞাতি ভাইবোন এবং/বা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়দের সঙ্গে রোমান্স এবং যৌনতা-বিষয়ক আলাপ করে। যাদের কাছে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ আছে (বাসায় বা সাইবার ক্যাফেতে) তারা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য মাধ্যমে তথ্য এবং পর্নোগ্রাফিক উপকরণ খোঁজ করে। পর্নোগ্রাফিক ক্লিপস দেখতে ছেলেরা ব্যাপকভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এই ক্লিপগুলো সাত মিনিট দীর্ঘ হয় এবং মোবাইলের দোকান থেকে এগুলো কিনতে মাত্র ৩ টাকা (০.০৪ মার্কিন ডলার) খরচ হয়। ছেলেরা তাদের বন্ধুদের মোবাইল ফোন থেকে ব্লুটুথের মাধ্যমে বিনা মূল্যে পর্নোগ্রাফি আদান-প্রদান করে থাকে এবং তাদের স্থানীয় যৌনতা উদ্রেককারী গান, কৌতুকের ভিডিও, যৌনতা উদ্রেককারী দৃশ্যসংবলিত চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র-রহিত ক্লিপস দেখার সুযোগ পায়। যৌনতা উদ্রেককারী ছবি এবং গল্পসংবলিত সস্তায় ছাপানো ম্যাগাজিনও জনপ্রিয়, তবে প্রধানত ছেলেদের মধ্যে। শুধু অল্প কয়েকজন মেয়ে বলেছিল যে তারা গভীর রাতে ছেলেদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যৌনতা উদ্রেককারী আলাপ করে। ছেলেরা যৌন আনন্দ পাওয়ার উপায় হিসেবে হস্তমৈথুনের উল্লেখ করেছে। তবে কোনো মেয়ে হস্তমৈথুনের কথা স্বীকার করেনি,

এটার প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা এই ভয় পায় যে হস্তমৈথুন করলে তাদের কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

ছেলে ও মেয়ে উভয়ই রোমান্টিক চলচ্চিত্র (হিন্দি ও বাংলা উভয়ই) দেখতে পছন্দ করে এবং কেউ কেউ যৌন সম্পর্ক ছাড়াই রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িত আছে। যেসব ছেলে ও মেয়ে রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িত আছে তারা উল্লেখ করেছে যে প্রকাশ্যে দেখা করা বা একসঙ্গে ঘুরতে বের হওয়া সহজসাধ্য নয়, কারণ তারা পরিবারের সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে থাকে। পার্ক হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ্য স্থান, যেখানে উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজের ছেলে ও মেয়েরা দেখা করতে পারে। তবে তা সাধারণত বিদ্যালয় বা কলেজ চলার সময় বা ক্লাস শেষ হওয়ার পর। কারণ সন্ধ্যার পর মেয়েদের বাসার বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না। শহরের উত্তরদাতারা দেখা করার স্থান হিসেবে চলমান রিকশা, সাইবার ক্যাফে, সিনেমা হল, বন্ধুবান্ধবী বা আত্মীয়ের বাসা এবং শ্রেণিকক্ষের (ক্লাস শেষে) কথা উল্লেখ করেছে। গ্রামের ছেলে ও মেয়েরা দেখা করার স্থান হিসেবে ঝোপঝাড়, পাট, আখ বা ধানখেত এবং বাঁশবাগানের কথা উল্লেখ করেছে। শুধু কিছু ছেলে যৌনক্রিয়ার কথা স্বীকার করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌনকর্মীর কাছে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছে বা এমনকি ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার কথাও উল্লেখ করেছে। সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীরা বাধা সত্ত্বেও গর্ভপাত এবং (জরুরি) গর্ভনিরোধের মতো সেবা নিতে আসে। সুতরাং, কঠোর রীতিনীতি সব সময় নিবৃত্ত করে না, বরং সতর্কতা ও গোপনীয়তাও সৃষ্টি করে।

যৌনক্রিয়া-সম্পর্কিত প্রকাশনায় প্রবেশগম্যতা

যুবক-যুবতীরা নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে যৌনক্রিয়া ও যৌনতা সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ পূরণ করে। অন্যতম জনপ্রিয় উৎস হচ্ছে যৌনতা উদ্দীপক বই, যা সাধারণত 'চটি বই' হিসেবে পরিচিত—এগুলো যৌনতা উদ্দীপক ছবিসহ গল্পের বই; যেখানে গল্পের চরিত্ররা যখন-তখন যৌনক্রিয়ার লিপ্ত হয়। লেখক এসবের জীবন্ত বর্ণনা দেন এবং গল্পের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত যৌনক্রিয়া ও অজাচার থাকে। অদ্ভুতভাবে যে সমাজে বিবাহবহির্ভূত যৌনক্রিয়াকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেখানে আমাদের তথ্য সংগ্রহের সময় সংগৃহীত চটি বইগুলোতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং, সৎমা এবং ছেলে, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, মামা-মামি, ভাইঝি, ভাগনি, ভাইপো, বোনপো বা বন্ধুদের মধ্যে যৌনক্রিয়া প্রাধান্য পেয়েছে। এই বইগুলোতে লিঙ্গের আকার, যৌনক্রিয়ার স্থায়িত্ব এবং মেয়েদের করা কিছু যৌন কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে মিথ্যা এবং অবাস্তব তথ্য দেওয়া

থাকে। অন্যদিকে ধর্মীয় জীবনাচরণের নির্দেশসংবলিত বইগুলোতে, যেগুলো সাধারণত শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের বাসায় পাওয়া যায়, সেগুলোতে যৌন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রার্থনার একটি অধ্যায় থাকে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যা বিবাহিত দম্পতিদের উদ্দেশ করে লেখা হয়। বইগুলোর পাঠ্যসূচিতে যৌনক্রিয়ার ওপর লিখিত এসব অধ্যায়ে 'শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' চিহ্নিত থাকে। ফলে, এমনকি যেসব তরুণ-তরুণী ধর্মের প্রতি ততটা আগ্রহী নন, তাঁরাও এই বইগুলো পড়তে আগ্রহী হন এবং গোপনে এসব অধ্যায় পড়তে উৎসুক থাকেন।

যৌন উদ্দীপক ছবি প্রধানত বিদেশি পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিন এবং সস্তায় ছাপানো বাংলা ম্যাগাজিনও জনপ্রিয়। এগুলো প্রধানত সিনেমা হলের সামনে, স্থানীয় স্টেশনারি দোকানে বা বাজারে বসা হকারের দোকানে পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলো প্রকাশ্যে রাখা হয় না, সাধারণত অন্য বই বা ম্যাগাজিনের আড়ালে রাখা হয় এবং কোনো ক্রেতা কিনতে চাইলে শুধু তখনই তাকে সরবরাহ করা হয়। মোবাইল ফোন পর্নোগ্রাফি ছাড়াও গ্রামীণ, আধা-শহুরে এবং শহুরে বিন্যাসে নির্মিত যৌন উদ্দীপক সংগীত এবং কৌতুক ভিডিও রয়েছে। এগুলো মূলধারার চলচ্চিত্র এবং সংগীতশিল্পে অপরিচিত অপেশাদার অভিনয়শিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা হয়, যদিও মাঝে মাঝে এগুলোর আবরণের গায়ে জনপ্রিয় গায়ক বা অভিনয়শিল্পীদের ছবি সাঁটা থাকে। তারা সাধারণত সস্তায় সহজলভ্য এই পণ্যগুলো কেনে এবং পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে। তারা বাসায় এগুলো গোপন জায়গায় রাখে, যেমন ম্যাট্রেসের নিচে বা বইয়েরই ভেতরে। অধিকাংশ মেয়ের ধর্মীয় বইগুলোতে প্রবেশগম্যতা ছিল। কয়েকজন মেয়ে অন্যান্য উপকরণে নিজেদের প্রবেশগম্যতা থাকার কথা স্বীকার করে, তবে তারা বলেছিল, তারা কখনো এগুলো কেনেনি, শুধু বন্ধুবান্ধবীর কাছ থেকে দেখেছে।

সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রাপ্তবয়স্করা বলেন যে যদিও অতীতে কিছু কিছু ধর্মীয় এবং চটি বই পাওয়া যেত, কিন্তু তখন সম্ভবত শুধু প্রাপ্তবয়স্করাই এগুলো পড়ার সুযোগ পেতেন। তাঁরা এসব পণ্যের বিস্তার ও বৈচিত্র্য এবং কিশোর-কিশোরীদের এগুলোতে প্রবেশগম্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। অধিকন্তু, কিশোর-কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই স্বীকার করেছেন যে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে অধিকাংশ মাতা-পিতাই জানে না। এটা নবীনদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের যৌনতা-বিষয়ক আলোচনার ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞার ফল। যুবকেরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর এবং তথ্য ও সাহায্যের জন্য ফেরিওয়ালা এবং ভেষজ ওষুধবিক্রেতাদের কাছে যান (বিনা মূল্যে তাঁদের উপদেশ পাওয়া যায়, ওষুধ কিনতে অল্প টাকা খরচ হয়)। এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সাধারণত অসম্পূর্ণ এবং প্রায়ই অসত্য হয়। এ ছাড়া যুবকদের ভ্রান্ত ধারণা, অনিরাপত্তা এবং

ভয়ের পথে পরিচালিত করে। শুধু তা-ই নয়, এই তথ্য জগৎ নিষিদ্ধ বলে এখানে প্রবেশ অপরাধবোধের উৎস বলে গণ্য হয়। এসব তথ্য জেন্ডারের ভূমিকা এবং পুরুষের যৌন ক্ষমতার সাংস্কৃতিক ধারণাকেও পাকাপোক্ত করে। যেমন পুরুষের ক্ষমতায়ন মানে নারীর অধস্থনতা। অতঃপর, ছেলে ও মেয়েরা যখন যৌন চাহিদা অনুভব বা তাদের যৌনতাকে উপভোগ করার জন্য নিজেদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়; বা যখন তারা তথ্য, যৌন উদ্দীপনা, পুলক, ঘনিষ্ঠতা এবং রোমান্সের তালাশ করে, তখন তারা ভয় বা পাপবোধ অনুভব করে।

ডেটিং এবং যৌনতা সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের অনুভূতি

ছেলে ও মেয়েরা উল্লেখ করেছে যে রোমান্স এবং আনন্দ তাদের নিজেদের, তাদের আত্মসম্মান এবং তাদের পরিণত হওয়া স্ত্রীসুলভ বা পুরুষালি—অনুভব করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এসব কিছু অবশ্যই লুকিয়ে হতে হবে, বিশেষত বড়দের কাছ থেকে। তারা কলঙ্ক এবং শাস্তির ভয়ে থাকে, বিশেষত মেয়েরা। প্রাপ্তবয়স্করা রোমান্টিক সম্পর্ককে যৌন সম্পর্ক হিসেবে সন্দেহ করে। ছেলে ও মেয়েরা পরিবারের বিপক্ষে যাওয়াকে ভয় করে। মেয়েদের জন্য এর ফলাফল অধিক খারাপ, যেমন চলাফেরায় বাধা-নিষেধ, বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া, অনাথাশ্রম থেকে বহিষ্কার করা, জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া, ভবিষ্যৎ স্বামীর খিস্তির সম্মুখীন হওয়া, সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর জন্য অবমাননা বয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে বিয়ের পথগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। যদি একটি রোমান্টিক সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত না গড়ায়, মেয়ের পরিবারকে তার জন্য হয়তোবা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি যৌতুকও দিতে হতে পারে।

রজঃস্রাব সম্পর্কে এবং বিয়ের রাতে নিজেদের কুমারীত্ব প্রমাণ করতে পারবে কি না—এই বিষয় নিয়েও মেয়েরা ভয়ে থাকে। ছেলেরা হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষের ফলে দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয়ে থাকে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যৌন ক্ষমতা, যৌন অঙ্গসমূহ এবং স্তন; যৌনক্রিয়ায় রত হওয়ার এবং ভবিষ্যতে সন্তান প্রজননের সক্ষমতা নিয়ে অনিরাপত্তায় ভোগে। তারা ভালোবাসে না এমন কারও সঙ্গে পারিবারিকভাবে আয়োজিত এবং জোরপূর্বক বিয়েতে এবং নিজের পছন্দের রোমান্টিক সঙ্গীকে হারাতে ভয় পায়। উপরন্তু, 'খারাপ' কোনো কাজ করার সময় ধরা পড়ে সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে পাপ করার ভয়েও তারা থাকে।

মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইভ টিজিং

কিশোর-কিশোরীরা যৌনতা-সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে ইভ টিজিং এবং যৌন হয়রানি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মেয়েরা ছেলেদের দ্বারা বারবার প্রকাশ্যে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে, বিশেষত পথচারী মেয়েরা যৌন উদ্দীপক উক্তির শিকার হয়। অধিকাংশ উক্তি মেয়েদের বাহ্যিক রূপ এবং শরীর লক্ষ্য করে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেছে—'ওহ! সাইজ দেখ! নিতম্ব ৪০ এবং বুক ৩৬', 'সেই একখান মাল!' 'হাই সেক্সি! এত বড় বুক বানালে কী করে?' 'হাঁটছে, দুলছে'। মাঝে মাঝে ছেলেরা মেয়েদের স্তনকে এক জোড়া নারকেল বা আপেলের সঙ্গে তুলনা করে। তাই সে ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের বইগুলো নিজেদের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে স্কুল-কলেজে যাওয়া আসা করে। তখন ছেলেরা কটূক্তি করে: 'ইশ্! যদি আমি তার হাতের বই হতে পারতাম, তবে আমি তার বুকের বা হৃদয়ের আরও কাছে যেতে পারতাম।'

মেয়েরা বলেছে যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেয়েদের মুখে বা শরীরে একটি চিঠি ছুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ছেলেরা প্রেমের সম্পর্কের প্রস্তাব দেয় এবং ছেলেরা মনে করে, মেয়েরা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সাড়া দেবে। যদি এই প্রেম প্রস্তাবের কোনো সাড়া না থাকে বা না বোধক উত্তর হয়, তখন তার প্রতি ইভ টিজিংয়ের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। মেয়েদের মতে, ছেলেরা যে তাদের উক্তির মাধ্যমে কোনো মেয়ের প্রতি তাদের আকর্ষণ প্রকাশ করে তা-ই নয়, ছেলেরা যখন কোনো মেয়েকে অপছন্দ করে, তখন তাও তাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন তারা একজন কৃশতনু মেয়েকে ডাকতে পারে শুঁটকি বা একজন লম্বা মেয়েকে লগি (বাঁশ)। যখন তারা একজন মোটা মেয়েকে দেখে, তখন তারা বলতে পারে, 'এরে দিয়ে আমরা কী করব?' যদি একজন মেয়ে একজন ছেলের প্রস্তাবে রাজি না হয়, ছেলেটি বলতে পারে: 'মেয়েটি কাঁচা আমের মতো টক'। মাঝে মাঝে ছেলেরা মেয়েদের লক্ষ করে শিস দেয়, চোখ টেপে, তালি দেয়, উচ্চ স্বরে হাসে, গান গায় (সাধারণত অশ্লীল), চুমু ছোড়ে বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে যৌনক্রিয়ার ইঙ্গিত করে।

যখন ছেলেরা কটূক্তি করে বা স্পর্শ করতে চায়, তখন অধিকাংশ মেয়ে মাথা নিচু করে নীরবে হেঁটে চলে যায়। কোনো কোনো মেয়ে তাদের বড় ভাইদের এই বিষয়টি দেখতে বলে। এক মেয়ে বলেছে যে সে এই বিষয়টি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিল এবং সে তার মাকে মেয়েটির জন্য একটি বোরকা বানিয়ে দিতে বলে, যাতে ছেলেরা কটূক্তি করা বন্ধ করে। কিন্তু বোরকা পরা মেয়েরাও নিরাপদ নয়। মাদ্রাসার এক মেয়ে বলেছে যে তখন ছেলেরা কটূক্তি করে, বলে: 'হাই সেক্সি, অ্যারাবিয়ান নাইটস'। এ ধরনের কটূক্তির ফলে মেয়েরা ভয় পায় এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মৌখিক হয়রানির পর অনেক মেয়ে শারীরিকভাবে হয়রানির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন চিমটি কাটা, লাথি দেওয়া, বুকে স্পর্শ করা এবং

ঘেঁষাঘেঁষি করা দাঁড়ানো। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে একটি ছেলের একজন মেয়েকে অ্যাসিড ছুড়ে মারা, অপহরণ করা এবং একই কারণে ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে মেয়েরা জানিয়েছে। কোনো মেয়েই এই মনোযোগ পছন্দ করে না, কারণ ছেলেগুলো তাদের কাছে 'অপরিচিত' থাকে, ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে ঘটে, এটা মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ্যে একধরনের সার্বক্ষণিক অনিরাপত্তার বোধ তৈরি করে এবং তারা এই বিষয়টি কাউকে জানালে, হয়তোবা তাদেরই এই ঘটনার উসকানিদাতা হিসেবে দোষারোপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মেয়েদের সঙ্গে করা সব ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস থেকে দেখা গেছে যে যদি কোনো মেয়ে কারও কাছে হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলে বা যদি সে হয়রানির শিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়, তবে সমাজ বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার নিজের পরিবারও তার ওপর দোষারোপ করে এবং তার পরিবারের অবমাননা হয়।

ছেলেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইভ টিজিং

ছেলেরা স্বীকার করেছে যে তারা মৌখিকভাবে মেয়েদেরকে হয়রানির সঙ্গে জড়িত এবং অনেকে শারীরিকভাবে হয়রানির সঙ্গে জড়িত থাকার কথাও স্বীকার করেছে। বস্তিবাসী কয়েকজন ছেলে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে, দুজন গণধর্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল বলে জানায়। অনেকে স্বীকার করে যে তারা প্রকাশ্য স্থানে, যেমন মেলা বা আনন্দোৎসব, সিনেমা হল, হাটবাজার, বাসে বা ট্রেনে, ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে। যেমন একজন বলেছে, '...যখন বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল, তখন আমি একটি মেয়ের সংবেদনশীল অংশ টিপে দিই।'

যখন ছেলেদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তারা মেয়েদের জ্বালাতন/হয়রানি করে; অধিকাংশ ছেলে উত্তর দিয়েছিল, এটা করতে তাদের ভালো লাগে এবং এটা থেকে তারা আনন্দ পায়। কেউ কেউ বন্ধুদের সামনে নিজের পুরুষত্ব দেখানোর জন্য এবং কেউ কেউ বন্ধুদের চাপে এমনটা করে। যেমন একজন ছেলে বলেছিল যে তার বন্ধুরা তাকে বলেছিল, বন্ধুদের সামনে একটা মেয়ের বুক স্পর্শ করলে সে তাদের সামনে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করতে পারে। তাই ছেলেটি নিজেকে বাহাদুর প্রমাণের লোভে দৌড়ে একটি মেয়ের কাছে যায় এবং তার পুরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য রাস্তায় তার বন্ধুদের সামনে হঠাৎ মেয়েটির সংবেদনশীল অংশ টিপে দেয়। অন্যরা মেয়েদের ইভ টিজিং করলে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে থাকে, তাই তারা এমনটা করা থেকে বিরত ছিল।

অনেক ছেলের কাছে ইভ টিজিং সাধারণ একটি বিষয়। তাদের মতে, প্রকাশ্য স্থানে মেয়েদের উদ্দেশে কটূক্তি করা এবং তাদের স্পর্শ করা ক্ষতিকর কিছু নয়, কারণ এতে মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যাবে না এবং বড়রাও এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে না। এমনকি তারা একে অপরকে না চিনলেও এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও কিছু ছেলে মনে করে যে প্রত্যেক অবিবাহিত ছেলেরই রাস্তায় প্রত্যেক অবিবাহিত মেয়েকে প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার আছে। যা হোক, এ ধরনের আচরণে একজন মেয়ের কী ধরনের অনুভূতি হতে পারে, অধিকাংশ ছেলেই এ বিষয়টি কখনো চিন্তা করে দেখেনি।

আলোচনা

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের কিশোরীদের ইভ টিজিংকে একটি জেন্ডারভিত্তিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রসঙ্গায়ন করা হয়েছে, যা মেয়েদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। লিঙ্গবৈষম্য, যা যৌন হয়রানিতে রূপ নিচ্ছে, বাংলাদেশি সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[২০-২৪] বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিকতা, জেন্ডার রীতি এবং পর্দাপ্রথার কারণে মেয়েরা জন্মের পর থেকেই বৈষম্যের শিকার হয়[২৫, ২৬] এবং এগুলো তাদের যৌন হয়রানির অজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।[২৭] আইন এবং বিচার-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াসমূহ সমস্যাটিকে আরও শোচনীয় করে তুলছে।[২৮, ২৯] মেয়ে এবং নারীদের যৌন হয়রানির অপরাধে ছেলে এবং পুরুষদের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত চালু করা সত্ত্বেও, রাতারাতি সাংস্কৃতিক আচারগুলো পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়।[৭, ১১] সমাজ মেয়েদের দোষারোপ করে থাকে, ফলে যৌন নিপীড়ন এবং সহিংসতার কথা প্রকাশ করা তাদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে যায়, যা কিশোরী বয়স পার হওয়ার পরও বন্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি-সম্পর্কিত ২০০৪ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, কর্মজীবী নারীরাও হয়রানির অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। কারণ তাঁরা কলঙ্কিত হওয়ার, প্রতিশোধের শিকার হওয়ার এবং চাকরি হারানোর ভয়ে থাকেন।[৩০]

যৌন সম্পর্কে ছেলে ও মেয়েরা নিজেদের ভূমিকাকে কীভাবে দেখবে, তা জেন্ডারবৈষম্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে বস্তিবাসী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণের ধারণা খুবই ক্ষীণ।[৩১] দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য গবেষক দেখিয়েছেন যে যৌন হয়রানি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল, যা পিতৃতান্ত্রিকতা এবং ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত এবং নারী ও মেয়েদের যৌন অবমাননা এবং শোষণ প্রকাশে একধরনের অনাগ্রহ রয়েছে।[৩২-৩৪] একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরের ফলে পুরুষদের পুরুষালি সনাতন ভাব সংকটের মুখে, যেটি মিসরের রাস্তায় নারীদের হয়রানির অন্যতম কারণ।[৩৫]

যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্যবোধ এবং নিয়মগুলোও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে বিবাহপূর্ব যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধ।[৩৬-৪০] আমাদের গবেষণা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যৌনতার ওপর সাধারণ এবং গোঁড়া সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, বিবাহপূর্ব যৌনতার প্রতি সমাজের যৌন নিপীড়নমূলক আচরণের ফলে জেন্ডার পৃথক্করণ এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য অপ্রতুল তথ্যের ব্যবস্থার ফলে যৌনতা-বিষয়ক ভুল ধারণা ও ভয় তৈরি হয়। ফলে যৌনতা রহস্যাবৃত হয়ে পড়ে এবং কিশোর-কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের যেকোনো ধরনের মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে যৌন অর্থ জড়াতে শেখে। এর ফলে তাদের আরও স্বাভাবিকভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা এবং বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অযৌন অন্তরঙ্গতা তৈরির যে ক্ষমতা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা আরও প্রকট হচ্ছে কারণ, এমন খুব কম প্রকাশ্য স্থান আছে যেখানে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন ছেলে ও মেয়েরা পরস্পর দেখা এবং যোগাযোগ করতে পারে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পর্নোগ্রাফিক উপকরণসহ বৈশ্বিক গণমাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বর্ধিত প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনও নির্দিষ্ট কিছু গঁৎবাধা জেন্ডার এবং যৌন নিয়ম ও প্রত্যাশা, যেমন পুরুষদের কর্তৃত্ব এবং আনন্দ, জোরদার করতে ভূমিকা পালন করছে। কোনো কোনো লেখক দক্ষিণ এশিয়ায় যৌন সহিংসতা উসকে দেওয়ার জন্য গণমাধ্যম এবং হিন্দি চলচ্চিত্রকে দায়ী করেন।[২, ৩, ১১-১৪]

সম্ভবত ছেলেমেয়েদের সামাজিক মিশ্রণ, রোমান্টিক সম্পর্ক এবং ডেটিংয়ের ওপর বাধা-নিষেধ—যা পর্নোগ্রাফির প্রভাবে এবং যৌনতা ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক শিক্ষার অনুপস্থিতিরই একটি ফল হচ্ছে ইভ টিজিং। এটা প্রমাণিত যে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে এবং তাদের মধ্যকার মেলামেশা সংকীর্ণ করে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কুমারীত্ব এবং পারিবারিকভাবে বিয়ের নিয়ম রক্ষার যে প্রচেষ্টা বয়স্করা করেন, তা ভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। কিশোর-কিশোরীদের যৌন এবং যৌনতাসম্পর্কিত আচরণ অনেকটা নির্ভর করে তাদের যৌন-সামাজিকীকরণের দক্ষতার (Sexual Interaction Competency) ওপর। অধিকন্তু, যৌন সামাজিকীকরণের সঙ্গে সমাজজীবনের অন্য অনেক অযৌন বিষয় জড়িয়ে আছে।[৪১] যৌনক্রিয়ায় দক্ষতা অর্জন যৌন সামাজিকীকরণের একটি অংশ;[৪২, ৪৩] এখানে যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা, সংবেদনশীলতা এবং আচরণগত কৌশল জড়িত। এটি মানুষকে তাদের পারস্পরিক আনন্দদায়ক যৌনক্রিয়ার বন্দোবস্ত করতে সাহায্য করে।[৪৪] এই সামাজিক দক্ষতার অভাব ইভ টিজিংয়ের মতো বিকৃত আচরণকে আরও সহজে সাড়ম্বরে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।

পরিশেষে, বাংলাদেশে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। এই গবেষণায় কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা প্রকাশিত তাদের দেহ এবং যৌন অনুভূতি-সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ এবং অনিরাপত্তা এটাই দেখায় যে নবীনদের সমন্বিত যৌনতা শিক্ষায় প্রবেশাধিকার থাকা উচিত এবং যা শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক না হয়ে জেন্ডারবৈষম্যের মতো বিষয়গুলোকেও সামনে নিয়ে আসবে এবং যা সামাজিক-যৌন মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা তৈরি করবে। এই গবেষণার সময়ে বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে যৌনশিক্ষার কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কি না, তা নিরীক্ষা করা হয় এবং দেখা গেছে, এ বিষয়ে খুবই অপর্যাপ্ত তথ্য আছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্র্যাক তাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য গ্রামীণ বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা চালু করেছে এবং এফপিএবি ও আরও চারটি এনজিও সমন্বিত যৌনশিক্ষা পাঠ্যক্রম তৈরি করছে এবং কয়েকটি জেলার বিদ্যালয়ে চালু করেছে। বন্ধুবান্ধব, রাস্তার ফেরিওয়ালা, ইন্টারনেট, পর্নোগ্রাফি এবং অন্যান্য উৎস থেকে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরা যে ভ্রান্ত তথ্য ও বার্তা পাচ্ছে, সেগুলোর ভারসাম্য রক্ষার্থে তাদের সম্পূর্ণ এবং সঠিক তথ্যে প্রবেশাধিকার থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ম এবং সামাজিক শাস্তি যতই কঠিন হোক না কেন, কিশোর-কিশোরী ও নবীনেরা স্বাভাবিক যৌন অভিব্যক্তির অংশ হিসেবে প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে তথ্য, আনন্দ এবং যৌন উদ্দীপনার খোঁজ করবে। প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা তাদের রক্ষা এবং দিকনির্দেশনা দেওয়ার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা এবং মনোবল জোগানো।

একইভাবে, নবীনদের লক্ষ্য করে পরিচালিত যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষাকে শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্রিকতা থেকে বের হয়ে আসা উচিত এবং কিশোর-কিশোরীদের উদ্বেগের প্রধান কারণগুলোর বিষয়ে সঠিক উপদেশ প্রদানে যত্ন নেওয়া এবং নিবারণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে যারা যৌন সক্রিয় এবং যারা (এখনো) যৌন সক্রিয় না, সবাইকে তাদেরও সম্পৃক্ত করা উচিত। শারীরিক স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ ছাড়াও এখানে আরও সেবা যুক্ত করতে হবে, যেখানে কিশোর-কিশোরীরা তাদের ভয় আর নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং জোরপূর্বক বিয়ে, যৌন হয়রানি ও কলঙ্ক এবং জোরপূর্বক যৌনক্রিয়ার মতো বিষয়গুলো মোকাবিলা করতে পারে। অধিকন্তু, মেয়েদের প্রতি হয়রানির বিষয়গুলো প্রকাশ করা, যাতে আরও সহজ হয়, তার অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ছেলে ও মেয়েদের তাদের নিজেদের এবং অন্যের যৌন অধিকার নিয়ে আরও বেশি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন এবং বাবা-মা ও প্রাপ্তবয়স্কদের সমাজে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে (শুধু নীরবে সমর্থন না করে) তাদের ভূমিকা উপলব্ধি করা উচিত। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের মিথস্ক্রিয়া থাকা প্রয়োজন এবং এর দ্বারা কঠোর জেন্ডার বিভক্তি বন্ধ

হওয়া উচিত। গণমাধ্যম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়া জনগণকে যৌন সহিংসতা বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি করতে এবং চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইন্টারন্যাশনাল **প্ল্যানড প্যারেন্টহুড** ফেডারেশনের (আইপিপিএফ) অধীনে এই গবেষণায় অর্থায়ন করে ডাচ সরকার। মাঠপর্যায়ের কাজে সহযোগিতা করে এফপিএবি। লেখকেরা বিশেষভাবে তথ্যদাতা কিশোর-কিশোরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাদের মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধ রচিত এবং আটজন নবীন, যারা এই গবেষণার একটি বড় অংশের কাজ সম্পন্ন করেছে : মোছাম্মাৎ সাবিনা আকতার, ময়নুল হাসান ইসলাম, মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, পারিজাত খাতুন, পারভেজ কামাল, মাহফুজা রহমান, মিঠুন কুমার রায়, আফরোজা খানম সুমি ও আজমারিনা তানজির। আইপিপিএফ লন্ডন এবং আইপিপিএফ দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের নবীন ও কিশোর-কিশোরী দলের আমাদের সহকর্মীদের, এফপিএবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং সম্পাদনায় সাহায্য করার জন্য ক্যাথি ডে ক্রাফকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পোস্টডক্টরাল গবেষণা সহযোগী, নৃতত্ত্ব বিভাগ, ডারহাম ইউনিভার্সিটি, ডারহাম, ডারহাম, যুক্তরাজ্য; এবং গবেষণা সহযোগী, ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড সোসাইটি, নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটি, নিউক্যাসল-আপঅন-টাইন, যুক্তরাজ্য।

জ্যেষ্ঠ গবেষক, রটজারস ডব্লিউপিএফ, উটরেচট, নেদারল্যান্ডস।

অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড প্রাইমারি কেয়ার, লেইডন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার এবং সহযোগী অধ্যাপক, আমস্টারডাম ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস।

তথ্যসূত্র

১. Gangoli G., *Indian Feminisms: Law, Patriarchies and Violence in India*. London: Ashgate Publishing, 2007.

২. Baxi P. “Sexual harassment,” 2001. www.india-seminar.com/2001/505/505pratikshabaxi.htm.

৩. Ramasubramanian S, Oliver MB, “Portrayals of sexual violence in popular Hindi films, 1997-99,” *Sex Roles* 2003;48(7-8):327-36. DOI: 10.1023/A:1022938513819.

৪. Das MB, Ahmad JK, Bernard C, et al. “Whispers to Voices. Gender and Social Transformatioin Bangladesh,” World Bank and Aus AID, 2007. http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/295657120574028672 6/genderReport.pdf.

৫. Rashid M., “Letting eve-teasing go unpunished.,” *The Daily Star,* 9 September 2007. www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=5952.

৬. Kabeer N. “The decline in “missing women” in Bangladesh,” November 2012. www.opendemocracy.net/5050/naila-kabeer/decline-in-missing-women-in-bangladesh

৭. “Eve teasing” - a social curse. Studz Mode.com, 2013. www.studzmode.com/essays/EveTeasing-A-Social-Curse-505336.html.

৮. Agnes F., “Protecting women against violence: review of a decade of legislation, 1980-89,” *Economic and Political Weekly* 1992; 27(17):19-33.

৯. Kapur R, Khanna S. “Memorandum on the Reform of Laws Relating to Sexual Offences,” Delhi: Centre for Legal Research, 1996.

১০. Working definition.Youth Incentives and WGNRR.2006. http://www.rutgerswpf.org/sites/default/files/Grey%20Areas.pdf.

১১. UNICEF. Bangladesh: “When sexual harassment leads to suicide,” 2009. www.unicef.org/sowc09/docs/SOWC09_Table_9.pdf.

১২. Mawson J. “UNICEF supports efforts to end sexual harassment of girls and women in Bangladesh,” Government, NGO partners and adolescents target “eve teasing”. 2010. www.unicef.org/ infobycountry/bangladesh^55216.html.

১৩. Ain O Salish Kendra. 2010. www.askbd.org/web/.

১৪. Bangladesh National Women Lawyers Association.. “Eveteasing.” www.bnwla.org.bd/content/view/165/133/lang,en/.

১৫. Bangladesh National Women Lawyers Association, “Violence against Women in Bangladesh,” Annual Report, 2000. www.thp.org/ system/files/Harassment.pdf.

১৬. Ethirajan A. “Bangladesh “Eve teasing” protest draws students,” *BBC News*, Dhaka, 2010. www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11687647.

১৭. The Hunger Project, 2000. http://www.thp.org/files/Harassment.pdf.

১৮. Rutgers WPF, “Do They Match?” Research reports and training manuals. www.rutgerswpf.org/content/downloads.

১৯. Van Reeuwijk M, Nahar P., "The importance of a positive approach to sexuality in sexual health programmes for unmarried adolescents in Bangladesh," *Reproductive Health Matters* 2013;21(41):69-77.
২০. Siddiqi MD. "The Sexual Harassment of Industrial Workers: Strategies for Intervention in the Work place and Beyond," CPD and UNFPA Report 26. 2003. www.cpd.org.bd/pub_attach/unfpa26.pdf.
২১. Jahan R. "Family violence: some observations," in Akandaand Jahan, editors. *Collected Articles: Women for Women*, Research and Studz Group, Dhaka, 1983.p.41-47.
২২. Jahan R. "Hidden wounds, visible scars: violence against women in Banglades," in Agarwal B, editor, *Structures of Patriarchy*. London: Zed Books, 1988.
২৩. Nahar P. "Violence against childless women," in Bolaiah D,et al, editors, *Gender-based violence and sexual and reproductive health,* Mumbai: National Institute for Research in Reproductive Health, Indian Council of Medical Research, 2010. p.11-30.
২৪. Naved RT, Akhtar N. "Spousal violence against women and suicidal ideation in Bangladesh," *Women's Health Issues* 2008; 18(6):442-52.
২৫. Marcus R. BRIDGE Development Agenda Report No.10., "Violence against women in Bangladesh, Pakistan, Egypt, Sudan, Senegal and Yemen," Report prepared for Special Programme WID. Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1993.
২৬. Schuler SR, Islam F. "Women's acceptance of intimate partner violence within marriage in rural Bangladesh," *Studies in Family Planning* 2008;39(1):49-58.
২৭. Chowdhuri S. "Violence against Women in Bangladesh: Situational Analysis/Existing Interventions," Monograph Series 4. James P Grant School of Public Health, BRAC University, 2007. http://openlibrary.org/books/OL24104307M/Violence_against_women_in_Bangladesh.
২৮. Afsana K, Rashid SF, Thurston W. "Challenges and gaps in addressing women's health in the health policy of Bangladesh," World Conference on Prevention of Family Violence, Banff, Alberta, Canada, 23-26 October 2005.
২৯. Bhuiyan R. "Bangladesh: personal law and violence against women," in Schuler M, editor, *Empowerment and the Law: Strategies of Third World Women*, Washington, DC: OEF International, 1986.
৩০. Billah M, Riazuddin AKM. "Workplace environment for women: issues of harassment and need for interventions," Centre for Policy Dialogue. Report No.65.2004. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN021437.pdf.
৩১. Rashid SF. "Small powers, little choice: contextualizing reproductive and sexual rights in slums in Bangladesh," *IDS Bulletin* 2006;37(5).
৩২. Zubair S. "Just a time-pass: acknowledgement/denial (?)of sexual harassment in young women's discourse," *Hawwa* 2005;3(2):197-219.
৩৩. Leach F, "Sitaram S. Sexual harassment and abuse of adolescent school girls in South India," *Education, Citizenship and Social Justice* 2007;2(3):257-77.Doi: 10.1177/1746197907081262.
৩৪. Qamar H. "Reasons for eve teasing: a personality assessment, psychological fresh look," in Qamar H, editor, *Applied Psychology and Indian Perspective*, Psychology, Health, Sports, Women's Studies. Delhi: Gayan Publishing House, 1998.
৩৫. Fatima MP. "Street harassment in Cairo: a symptom of disintegrating social structures," *The African Anthropologist* 2008; 15(1/2):1-20.
৩৬. Lazeena M. *Romance and Pleasure: understanding the sexual conduct of young people in Dhaka in the Era of HIV and AIDS*, Dhaka: University Press, 2005.
৩৭. Barkat A, Majid M. "Adolescent and youth reproductive health," in *Bangladesh: status, policies, programs, andissues,* Policy Project, January 2003.
৩৮. Nahar Q, Tuùnon C, Houvras I, et al. "Reproductive health needs of adolescents in Bangladesh," a studzreport. Working Paper No. 130. Dhaka: ICDDR, B:Centre for Health and Population Research, 2003.
৩৯. Rob U, Mutahara MU. "Premarital sex among urban adolescents," *Quarterly of Community Health Education* 2001;20(1):103-11.
৪০. Uddin J, Choudhury AM. "Reproductive health awareness among adolescent girls in rural Bangladesh," *Asia Pacific Journal of Public Health* 2008;20(2).
৪১. Vanwesenbeeck I, van Zessen G, Ingham R, et al. "Factors and processes in heterosexual competence andrisk: an integrated review of the evidence," *Psychology and Health* 1999;14:25-50.

৪২. Vanwesenbeeck I. “Sexual socialization,” Background paper: “Sexuality under 18: how the social environment influences sexual development,” International conference organised by Rutgers Nisso Groep and World Population Foundation, Amersfoort,11-12 October 2010.
৪৩. Vanwesenbeeck I. “Sexual violence and the MDGs,” *International Journal of Sexual Health* 2008;20:1-2.
৪৪. Jackson S, Scott S. *Theorizing Sexuality,* Berkshire:McGraw-Hill; Open University Press, 2010.

শব্দকোষ

Access to—প্রবেশগম্যতা
Breasts—বুক (পড়ুন স্তন)
Cousin—জ্ঞাতি ভাইবোন
Courtship—বিয়ে-পূর্ব প্রেমের সম্পর্ক
Erotic pleasure and romance—যৌন-কামনা উদ্রেককারী পুলক এবং শিহরণ
Flirtatious—চপলতা
Hypothetical—অবধারণমূলক
Incest—অজাচার
Informant—জ্ঞাপক
Humiliate—অবমানন
Menstruation—রজঃস্রাব
Mobility—চলিষ্ণুতা
Normative—নিয়মাত্মক
Public sphere—জনপরিমণ্ডল
Qualitative methods—গুণগত পদ্ধতিসমূহ
Reflection—অনুধ্যায়
Reinforced—উসকে দেওয়া
Taboo—নিষিদ্ধ বিষয়
Text—পাঠ
Wetdream—স্বপ্নদোষ

পর্যালোচনা নিবন্ধ

স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র

মিজানুর রহমান খান

বাংলাদেশ : কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস—কামাল হোসেন
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩।

আমি ও আমিত্বকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে কামাল হোসেন ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। ইতিহাস এমন জিনিস, যা একটু ঝেড়েমুছে নিলেই ঝকঝকে হয়ে ওঠে। জাতির ইতিহাসের ঝকঝকে ষাটের দশকের অন্যতম বরপুত্র কামাল হোসেনের হাতে ঝকঝকে হয়ে ওঠা সেই ইতিহাস। কত তথ্য এখনো অজানা। এই সেদিন আমি তাঁকে অবাক করতে পেরে আনন্দিত হলাম। তিনি যখন জেলে তখন অক্সফোর্ডে তাঁর ওয়ার্ডেন চিঠি লিখেছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিবকে। ব্রিটিশ আর্কাইভস থেকে পাওয়া সেই চিঠি আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। এমনকি তাঁকে এমন একটি নথি দিলাম, যেখানে তথ্য আছে যে লন্ডনের পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে কামাল হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে! ভাগ্যিস পরদিন ভুল সংশোধনী ছাপা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাকশালে ম্লান একজন কামাল হোসেন মন্ত্রিসভা থেকে ‘ছুটি’ নিয়ে অক্সফোর্ডের অল সউলস কলেজে ফেলোশিপ পেয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই *বাংলাদেশ : কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস* লেখার সূচনা। বইটি ইউপিএল প্রকাশ করেছে ২০১৩ সালে।

১৯৫৯ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেই থেকে ১৯৭৫-এর আগস্ট মাঝখানে কয়েক সপ্তাহের বিরতিতে তাঁরা একত্রেই ছিলেন। ১৪টি পরিচ্ছেদের ঝাঁপিতে তিনি বন্দী করেছেন বাঙালির ইতিহাস। ১৮৭১ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে ছয়টি চ্যাপ্টার, যেখানে উত্তাল ষাটের দশক মূর্ত সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। সপ্তম চ্যাপ্টারে ক্র্যাকডাউন ও স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন, অষ্টমে রাষ্ট্রগঠনের চ্যালেঞ্জ, নবমে সংবিধান তৈরি, দশমে পররাষ্ট্রনীতিতে স্বাধীনতার আগের প্রবণতা, একাদশে বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নয়ন, দ্বাদশে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক, ত্রয়োদশে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ও সবশেষ চতুর্দশে জাতিসংঘে বাংলাদেশ।

আগেই স্বীকার করে নিই, এই আলোচনাটার একটা তির্যক ধারা আমি যথাসাধ্য রক্ষা করতে চাই, সেটা মূলত আত্মজিজ্ঞাসার একটা জায়গা থেকে। বিনয়ের কারণে নয়, অক্ষমতার ছোঁয়া যে থাকবেই, তাতে সন্দেহ অত্যল্প, আর সে জন্য লেখক ও পাঠক উভয় কুলের কাছেই করজোরে ক্ষমা চেয়ে নিই। হতে পারে এটা একটা জবরদস্তি। কারণ আমাদের সব মহৎ অর্জন আমরা এত পরিপাটি করে বুঝতে চাই যে, যাতে মনে হয় সেসব এতখানি মসৃণ ও মনোমুগ্ধকর হলে আমাদের আজকের এতটা রাজনৈতিক অধোগতি কেন। অবিভক্ত পাকিস্তান একটি অংশগ্রহণমূলক সাধারণ নির্বাচন করেছিল, যেন কেবল স্বাধীনতা হারানোর জন্যই। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ২৩ বছরে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে না পারার অপারগতার কারণেই কি পাকিস্তান টেকেনি? চারপাশের জগৎ অনেকটা বুঝে ওঠার আগ পর্যন্ত 'পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী' বলতে কল্পনায় খেলা করত এরা বুঝি রংচঙেও কিম্ভূতকিমাকার হবে। এরা বুঝি ভিনগ্রহের কেউ হবে। আমরা এদের চিনি না। ওঁরা আমাদের আত্মীয় নন। নাহলে বিনা রক্তপাতে আনা স্বাধীনতা কেউ এভাবে হারায়? কেবল 'আমরা' যদি রাষ্ট্র পাই, তাহলে সেখানে গণতন্ত্রের নহর বইবে। মানবসভ্যতা কত শত বছর আগে স্বায়ত্তশাসন, ফেডারেল সরকারব্যবস্থার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ করা সরকারব্যবস্থা করার বুদ্ধি বের করে ফেলেছে। বহুজাতিগত, বহুধর্মগত ও বহুভাষাভাষী অর্থাৎ বহুত্ববাদী একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ও তা থেকে সুফল লাভ করার কত শতাব্দী পর পাকিস্তান স্বাধীনতা পেয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্রকে না বুঝতে পারা নয়, সমস্যা ছিল বুঝতে না চাওয়ার। ওরা গণতন্ত্রের কিচ্ছু বোঝেনি, আমরাই কেবল বুঝেছিলাম, এটা ত্রুটিপূর্ণভাবে সত্য, প্রকৃত সত্য হলে আমাদের কি এই দশা হয়!

জাতীয়তাবাদে আমাদের আনুগত্য আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের বড়াই। আমরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দিয়ে প্রথম গণতন্ত্রের সবক নিয়েছি। ১৯৫২ সালেই আমরা দাবি তুলতে পরতাম, কেবল বাংলা নয়, পাকিস্তানে উচ্চারিত সব মাতৃভাষা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

আমরা বলেছি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা কখনো লক্ষ করিনি কেউ আহত হলো কি না। হলোই বা সংখ্যায় ওরা কত! এই সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র আমাদের বিরাট সর্বনাশ করেছে। আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। ৯০ ভাগের বেশি মুসলিম তাই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে কুচ পরোয়া নেই। এই সমাজে এই বিষয়ে একধরনের

কৃত্রিম মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করার ভান চলছে। ঠেকায় পড়লে অন্যের কাঁধে দোষ চাপায়, ভেতরে সমান রাঙা।

আমরা আমাদের পুরো মনোজগৎ তৈরি করেছি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে। জাতিসত্তায় সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব তাই অতীব প্রকট। পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যালঘু হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর দাদাগিরি করে, এটা চলতে দেওয়া যায় না। আমরা সর্বস্ব দিয়ে এই একটি বিষয় পরাস্ত করতে চেয়েছি বলেই তো প্রতীয়মান হয়। ওয়ান ইউনিট ও প্যারিটির জিঞ্জির ভেঙে দিতে হয়তো এর বিকল্প ছিল না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, বিকল্প পথের সন্ধান করার মতো দলীয় গণতন্ত্র আমরা চর্চা করতে প্রস্তুত ছিলাম কি না? আমরা কি বহুমত ও বহুপথের দিশা খোঁজার চেয়ে ব্যক্তির প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে গণতন্ত্র বুঝিনি? এই বিষয়ে একটা গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে রাখলাম, কারণ বই পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি এদিকেই একটু বেশি হাঁটব।

বাংলাদেশের মতো একটি সমাজব্যবস্থা, যেটি এখনো প্রচণ্ড রকমের ভাঙচুর ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ইতিহাসনির্ভর কোনো বইয়ের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে সেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা জরুরি, যেগুলো অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ এবং ভবিষ্যতের পথচলায় একটা নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমি ড. কামাল হোসেনের নতুন বই, যেটি লেখা শুরু হয়েছিল বিদেশ-বিভুঁইয়ে, সেটির পরিচ্ছেদওয়ারি আলোচনায় যাচ্ছি।

বইটির শুরু হয়েছে এটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সন্ধানে দুটি নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব 'অগ্রসরমান মধ্যবিত্ত' থেকে এসেছে। তিনি লিখেছেন, গত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। এটা আজ বেশি করে নজর দেওয়ার বিষয় যে, ১৯৭১ সালটি যে আমাদের জীবনে ঘনিয়ে এল সেটির প্রেক্ষাপটকে আমরা যদি কেবলই পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য ও বঞ্চনার আলোকে দেখি, তাহলে আমাদের জনগোষ্ঠীর বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা দুরূহ হতে পারে। কারণ সেটা খণ্ডিত হবে। আমরা কী পরিস্থিতিতে কী ধরনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় পশ্চিমের বৈষম্যের সঙ্গে লড়াই করেছি, সেটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া দরকার। কারণ, বৈষম্য থাকলেই ছয় দফার মতো আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বিশ্বের বহু জনগোষ্ঠী চরম বৈষম্যমূলক অবস্থায় থেকেও ছয় দফা এবং বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকে ধরে সামনে পথ চলতে পারেনি।

সুতরাং ড. কামাল হোসেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট কী করে সবার অলক্ষ্যে বাঙালি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের

বীজ বপন করেছিল। বাংলার মুসলমানরা তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব এবং সব সরকারি পদে ৫৫ ভাগ সংরক্ষিত করে চুক্তি করেছিল ওই প্যাক্টে। গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দী উভয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অবিস্মরণীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুতরাং আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আজ বিক্রমপুরের সিআর দাশকে মাথায় তুলে নিতে হবে।

আমরা কি লক্ষ করব যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিকে সমতার অনুভূতি দিতে 'বিশ ও ত্রিশ দশকের অগ্রসর হিন্দু ও বিরক্ত মুসলমানরা' যেভাবে চুক্তি করেছিল সে রকম একটা আপস আমরা করতে পেরেছি কি না কিংবা সেটা করার জন্য একটা পরিবেশ সমাজে বিরাজমান রয়েছে কি না। সাতচল্লিশের আগে প্রভাবশালী হিন্দুরা নিশ্চয় খুশি হতেন, যদি মুসলমানসহ সব জাতপাতের মানুষ কেবল 'ভারতীয়' পরিচয়ে ভারতের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তা তো হওয়ার কথা ছিল না। কারণ নেতৃত্ব সর্বজনীন হতে পারেনি এবং তারা তা হতে কতটা উতলা ছিলেন সেটা এক বিরাট প্রশ্ন।

এর মধ্যে এটা আমরা দেখি যে অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে টেনে তুলতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের ক্ষমতায়নকে ব্যবহার করা হয়েছে। মার্লো-মান্টোর সাংবিধানিক সংস্কার কমিশনে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইলেক্টরেট বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল।

বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি। সেই চুক্তির মডেল, বিশেষ করে তার চেতনা আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। সুতরাং সিআর দাশদের মতো যাঁরা আছেন তাঁদের পাঠ্যপুস্তকে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের গল্প কেবল ভাষা আন্দোলন থেকে উৎসারিত হয়নি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা কট্টর জাতীয়তাবাদ সব সময় খুব ভালো কিছু নয়। এটাকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের পীড়নে পরিণত করেছি। বায়ান্নর সূতিকাগার বাংলাদেশের মহান অর্জন চূড়ান্ত মহিমা ছড়িয়েছে হিমালয়ের দেশ নেপাল। তারা এবার তার নতুন সংবিধানে লিখেছে, নেপালে উচ্চারিত সব ভাষা হবে নেপালের জাতীয় ভাষা। আমরা যদি এই বাক্যটি বাহাত্তরের সংবিধানে লিখতাম তাহলেই শহীদের আত্মা বেশি শান্তি পেত। আমরা এতকাল ভেবেছি, বাংলা রাষ্ট্রভাষা লিখে এবং পাহাড়িদের বাঙালি পরিচয় দিতে বাধ্য করে আমরা বুঝি ভালো কিছু করেছি। আসলে কালের পরিক্রমায় এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কাপ্তাইয়ের জলবিদ্যুৎ করে উপজাতিদের চোখের পানিতে বিদ্যুৎ বানিয়ে আমরা আত্মতৃপ্তি পেয়েছি। কিন্তু তা কৃত্রিম ছিল। অনগ্রসর অংশ, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে আমরাই খাল কেটে কুমির আনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি। আমরা সার্বভৌমত্ব ও অন্যবিধ

যুক্তিতে নীরবে শাসকদের সমর্থন দিয়েছি। অথচ ঐতিহাসিক ছয় দফা তা সমর্থন করে না।

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারির নীতিতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্তমানে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার অংশীদারির ধারণার তীব্র খরা চলছে। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে একদা যে দ্বেষ ছিল, তাই যেন এখন ভিন্নরূপে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ফিরে এসেছে। কিন্তু পার্থক্য হলো বিশ্বসভ্যতা এগিয়েছে, কিন্তু বাংলায় অন্তত এই ক্ষেত্রে থমকে গেছে। ক্ষমতার ভাগাভাগি, তা নিয়ে আন্তদলের মধ্যেও বিরাট ঘাটতি। ক্ষমতার অংশীদারি দূরে থাক, ক্ষমতা কেবল ভোগ করলেই হবে না, তাকে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করতে হবে। চিত্তরঞ্জন দাশ যা এই একই ভূখণ্ডে পরাধীন ভারতে করতে পেরেছিলেন, তা এখন স্বাধীন ভূখণ্ডে অনেকের জন্য কল্পনা করাও কঠিন। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিম যে ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কামারুদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, উপমহাদেশে সেই সময়ের মুসলিম লীগপন্থী গ্রুপগুলোর মধ্যে এই ধারাটিই ছিল সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ।

আজ যখন কেবল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ঘটনাবলির দিকে তাকিয়ে অনেকে পূর্ব বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুসন্ধান করেন, তখন তা যথাযথ বলে মনে হয় না, বরং দ্বন্দ্ব বাড়ে। তবে দেখার বিষয় হলো আবুল হাশিমরা মুসলিম লীগে থেকে এসব করে বেশি জুত করতে পারেননি। এমনকি কোণঠাসা হয়ে পড়েন, কামাল হোসেন যাকে আগাম অবসরে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে মুসলিম লীগের ভেতরে থেকেও একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে সেই ধারার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন তার অনুপম উদাহরণ আবুল হাশিম। সুতরাং সিআর দাশ ও আবুল হাশিমরা চিরসবুজ নায়ক। অথচ আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় এই নায়কেরা এবং তাঁদের কর্মগাথা অনুপস্থিত।

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, 'অসমতার' ইস্যু ষাটের দশকে সব থেকে বিস্ফোরণোন্মুখ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এখন আমাদের যেটা ঘাটতি সেটা হলো ষাটের দশক স্মরণ করতে গিয়ে ব্যক্তির ভূমিকা এতটাই বড় হয়ে আসে যে, সেই 'অসমতা' স্বাধীনতার পরে এই ভূখণ্ডের মানুষের, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া বাকি থেকে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় 'অসমতা'কে দূর করার জন্য যে তেমন কোনো চিন্তাভাবনা করা হয়নি, তার বড় উদাহরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সৃষ্টি হওয়া এবং পার্বত্য চুক্তির পরে তা বাস্তবায়িত হতে না পারা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনগ্রসর বঞ্চিত বাঙালির যে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি দানা

বেঁধেছিল, তা একাত্তরের ডিসেম্বরের পরের বাংলাদেশে নতুন করে ফিরে এসেছে। ২২ পরিবারের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যায়নি। তার প্রমাণ ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ১১ লাখ লোক আয়কর প্রদান করে। এই অবস্থার বড় কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে যেমন, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনকে রাজনৈতিকভাবে অস্বীকার করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শরিকানা ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শেখানোই হয়েছে তাদের উন্নতি মানে 'আগের তুলনায়' মানে বাপচাচাদের তুলনায় ভালো থাকা-খাওয়া। ভোট এলে শুধু ভোট দিবা। প্রার্থীরা কী প্রক্রিয়ায় আসবে-যাবে সেখানে তোমার ভোট লাগবে না। ষাটের দশকের একজন তুখোড় ছাত্রনেতা ও বর্তমানে মন্ত্রী লেখককে বলেছেন, 'পাকিস্তান আমলে তো দলীয়ভাবেই স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হতো। আইয়ুব এসে বেসিক ডেমোক্রেসি করে সেটা বিলোপ করলেন। আমরা এখন সেটাই ফিরিয়ে আনছি।' কিন্তু তিনি যেটা বলেননি সেটা হলো স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক গণতন্ত্র অর্থাৎ অগণতান্ত্রিক ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিজেদের লোক বাছাইয়ের চেষ্টাটাই বড় আকারে চোখে পড়ে। দলীয় ভিত্তিতে আনা হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অধিকতর জনপ্রতিনিধিত্বশীল বা জনসম্পৃক্ত করার চিন্তা থেকে নয়, এটা মূলত রাজনৈতিক কৌশল। ম্যাকিয়াভেলিয়ান রাজনীতিই এর অন্তর্নিহিত দর্শন।

বাংলাভাষী ও বাঙালির রাষ্ট্রগঠনের জাত্যভিমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠের বলদর্পী মনোভাব তাকে অনেক মৌলিক ক্ষেত্রে অন্ধ করে দিয়েছিল। সেই অন্ধত্ব আজও নানা ক্ষেত্রে চলছে। সামাজিক অসমতা দূর করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ বয়ে এনেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে স্বাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ ও নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসর্বস্ব বিষয় হিসেবে দেখেছে। শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলগত ধ্যানধারণায় দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রধানত ষাটের দশকের 'পূর্ব পাকিস্তানি' হয়ে আছে। তারা বলছে, উন্নয়ন নাও, গণতন্ত্র দিতে পারব না। যদিও কথাটা ইদানীং শাসক দল তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলছে বলে বলাবলি হচ্ছে, আসলে এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। এই একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দুই প্রধান ধারার শাসকগোষ্ঠী ষাটের দশকের 'পূর্ব পাকিস্তানিদের' জন্য বড় বড় দালানকোঠা ও বেশি বেতন-ভাতা ধরনের উন্নয়ন দিচ্ছে। সম্প্রতি আকস্মিকভাবে তারা স্থানীয় সরকারের নির্বাচনকে দলীয় ভিত্তিতে এনেছে এবং বিএনপি এর বিরোধিতা করছে কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনায় আগেও যা ছিল না এবং এখনো যা নেই, তা হলো অনগ্রসর মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্ন। তারা এমন কোনো কোটাব্যবস্থায় যেতে নারাজ যেখানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের ভূমি বিষয়ে নিরাপদ বোধ করতে পারে। সম্প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রভাবশালী

মহল আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর পদ্ধতি দাবি করেছে। এটা এমন একটি প্রেক্ষাপটে, যখন উচ্চ আদালত এক রায়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আওতায় পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া স্বায়ত্তশাসনকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেওয়া হয়েছে।

জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফেরেন্স গেওরেস তাঁর বই *দ্য পলিটিক্যাল ডিসকোর্স অব স্পেশিয়াল ডিসপ্যারিটিস: জিওগ্রাফিক্যাল ইনইক্যুলিটিস বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা*তে দেখিয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে সামাজিক অসমতার প্রশ্নটি 'চিরসবুজ' হয়ে আছে। তাঁর কথায়, 'কারও এটা স্বীকার করা উচিত যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্নে সমতার ইস্যুই মুখ্য ভূমিকা পালন করে' (পৃ. ৫৭)। কিন্তু বাংলাদেশের রুগ্‌ণ রাজনীতিতে সত্যিকারের মতাদর্শগত বিভেদে 'সমতার ইস্যু' ছাড়া অন্যান্য উটকো যত বিষয় আছে তাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

অনগ্রসর মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করে আজকের সংসদ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার কাঠামোতে তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, পাঞ্জাবি সেনা ও আমলা প্রভাবাধীন ক্ষমতাকাঠামো শুধুই সামন্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, সেখানে একটি ধেয়ে আসা পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতাও আছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রে একটি প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে 'ক্ষমতা ভাগাভাগি' কেবলই প্রতারণামাত্র।

কেন্দ্র থেকে অঞ্চলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণই ছিল ছয় দফার মূলকথা। আর স্বাধীন বাংলাদেশ মোটা দাগে ওই একই সমস্যায় ভুগছে, কোথাও কেউ বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে বিকশিত করতে নারাজ। এর বড় প্রমাণ কোনো একটি ক্রান্তিকালে আমাদের দেশটি একটি জাতীয় সরকার গঠনে অপারগ থাকতে পারে। কারণ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা এতটাই পুঞ্জীভূত করা হয়েছে যে এখানে সমতার নীতি একেবারেই অস্বীকৃত রয়েছে। আর নির্বাচনকালীন সরকার গঠনে তা বিরোধী দলকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ পাঁচটি মন্ত্রণালয় দেওয়ার শর্তও তাই যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ মনে করা হয় না।

ড. কামাল তাঁর দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে ছয় দফা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো লাহোর প্রস্তাবের যথাযথ প্রতিফলন বাহাত্তরের সংবিধানে করতে না পারা। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান কী কী পারল না তার বিবরণ আছে। কিন্তু আজ আমাদের দরকার আরও বেশি অনুভব করা আমাদের কী করার কথা ছিল, আমরা কেন করিনি। বা কেন করতে পারিনি 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকারের ফেডারেশন'। বাহাত্তরে আমরা সমগোত্রীয়ের কথা বলে ফেডারেশনের ধারণাই পরিত্যাগ করলাম। বললাম সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে এটা হবে এককেন্দ্রিক। ক্ষুদ্র জাতিগত সংখ্যালঘুকে আমরা

কেবলই সংখ্যার জোরে পরিমাপ করলাম। এমনকি একজন মানবেন্দ্র লারমা যখন মাথা ফুঁড়ে দাঁড়ালেন, তখনো আমাদের হুঁশ হলো না। কিংবা আমরা কত তাড়াতাড়ি পাহাড়িদের জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবি হিসেবে আবির্ভূত হলাম। আমরা কত তাড়াতাড়ি বদলে গিয়ে বুঝলাম এবং বললাম স্বায়ত্তশাসন আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য তা হুমকি বয়ে আনতে পারে। অথচ ছয় দফা বলেছিল লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটাবে। সার্বভৌম ইউনিটটির ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা সংবিধানে কেন স্থানীয় শাসন নামে একটি নতুন চ্যাপ্টার লিখেছিলেন তার কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। কেবল ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন চেয়েছিলাম। প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট হবে লিটল রিপাবলিক। আসলে এর দিকে তাকালে এখন মনে হয় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যদি সংবিধান লেখা হতো তাহলে এ দেশকে আমরা বাহাত্তরেই বহুভাষাগত বহুবর্ণগত বহুজাতিগত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারতাম। যেটা সম্প্রতি নেপাল করেছে। আমাদের নেতারা সংবিধানে কী বিধান লিখেছিলেন, যাতে অর্পিত সম্পত্তির দিকে নজরদানকারীরা নিবৃত্ত হন।

আর এখানে জাতীয় সরকার গঠনের বিষয়টি বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। আজ দেখার বিষয় হলো পূর্ব বাংলার দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে ঐক্য করার প্রশ্নে কী ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছিল। আমাদের এই কৌশল রপ্ত করতে হবে। সেখানে অভিন্ন লক্ষ্য ছিল আইয়ুবের ওপর চাপ বাড়ানোর। তাই পাঞ্জাবি রাজনীতিক মুশতাক আহমেদ গুরমানি, মোহাম্মদ দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের রক্ষক। কিন্তু তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলেন এই ভেবে যে তাহলে স্বৈরশাসকের ওপর চাপ বাড়ানো সম্ভব। তাই তারা একটি সম্মিলিত বিরোধী দল করতে চাইলেন। মুজিবের কাছে পৌঁছাতে মানিক মিয়াকে ধরলেন।

তবে কী আশ্চর্য ইতিহাসের কীভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাংলাদেশ ইতিহাস বারবার এই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যে কাকে বাদ দিয়ে কাকে আনা হবে আর তাতে কী লাভ হবে। এই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ওই ব্যক্তিকে আনলে কোনো লাভ নেই, সেটা ষাটের দশকের অভিজ্ঞতা।

কামালের বর্ণনায় মানিক মিয়া এটা জানতেন যে ঢাকায় তাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে আইয়ুবকে সরিয়ে পাঞ্জাবি রাজনীতিকদের আরেকটি গ্রুপকে ক্ষমতায় বসালে তাতে বাঙালির লাভ কী। আমরা কতগুলো পরিহাস লক্ষ করব। স্বাধীন বাংলাদেশ যেহেতু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে নজর দেয়নি, তাই সব সময় ব্যক্তিকে ওঠানো ও নামানের রাজনীতিটা বড়

হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই একদলীয় নয়, বাংলাদেশ আসলে ব্যক্তির শাসনের সংকটে বেশি ভুগছে। কারণ চীন দেখিয়েছে যে একদলীয় শাসন ও এক ব্যক্তির মধ্যে কী পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব। একদলীয় শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং তাকে গতিশীল করতে হলে তার ভেতরে গণতন্ত্র অনুশীলন করতেই হবে। কারণ নইলে এটা টিকবে না। চীনের শীর্ষ নেতাকে কখনো কোনো বড় বিপর্যয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করা হয় না। তাকে কৈফিয়ত দিতেও হয় না। কারণ তিনি মিডিয়ায় প্রতিদিনই শিরোনাম হন না। বাংলাদেশের মতো কিছু দেশের নাম্বার ওয়ান ব্যক্তি গণমাধ্যমের মূল আকর্ষণে থাকতেন। একটানা অনেক দিন তাঁর বাণী না থাকলে, কেমন পানসে মনে হয়। এই যে অবস্থা আমরা একটি কর্তৃত্বপরায়ণ ও নামসর্বস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, এটাই একটা বিরাট বাধা। এবং আমরা খেয়াল করব যে আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়া, শেখ মুজিব, এরশাদ এভাবে ব্যক্তির নাম ধরে ধরে আমাদের শাসনামলগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা চিত্রিত হয়ে থাকে। এটার জন্য প্রচলিত প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতি দায়ী হয়ে থাকলে প্রধান দায়টা সম্ভবত শীর্ষ নেতাকেই নিতে হবে। কারণ তিনি নিজেকে মিডিয়ায় কীভাবে দেখাতে চান, সে বিষয়ে কোনো নীতিমালা করতে চান না। তিনি মিডিয়ার মাধ্যমে জনবিচ্ছিন্নতার বদনাম ঘোচাতে চান। আর সে কারণে মাঝেমধ্যেই অমুককে গ্রেপ্তারে কড়া নির্দেশ ও তদন্তের আগেই ফলাফল প্রকাশের মতো আত্মঘাতী প্রক্রিয়ায় নিজেকে তিনি সম্পৃক্ত করে ফেলেন। আর তাঁর চারপাশের ব্যক্তিরা প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলেন। মন থেকে না চাইলেও মোসাহেবি করা প্রতিযোগিতায় তাকে অংশ নিতে হয়। কারণ নইলে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি থাকে। সুতরাং ব্যক্তিবাদ বাংলাদেশ গণতন্ত্রের জন্য বিরাট হুমকি। জেনারেল জিয়ার পরে এরশাদ ক্ষমতায় থেকে দল করেছেন। কিন্তু এসব দলে কখনো গণতন্ত্র ছিল না। আর স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগ ক্রমাগতভাবে গোপন ব্যালটে দলের কমিটি গঠনের ধারা বেগবান করার পরিবর্তে পকেট বিপ্লব করে ফেলেছে। ইদানীং তারা তীব্র ও ব্যাপকভিত্তিক উপদলীয় কোন্দলের কারণে পকেট কমিটিও আর করতে পারছে না। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ১৫ অক্টোবর *প্রথম আলো*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আগে বিদ্রোহী প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। কারণ নির্বাচন ছিল নির্দলীয়। এখন এটা করা যাবে। এর মানে দাঁড়াল দলের প্রার্থী বাছাইয়ে গণতন্ত্র থাকবে না। কিন্তু বহিষ্কারের বেলায় দল তার ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাবে। *ইত্তেফাক* খবর দিয়েছে, প্রস্তাবিত প্রার্থী মনোয়নন বোর্ডের প্রধান থাকবেন এমপি। এর মানে ৭০ অনুচ্ছেদ দ্বারা কেন্দ্রীয় নেতার রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃত এমপি স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণটা করবেন। এর আগে আমরা দেখেছি উপজেলা পরিষদের স্বায়ত্তশাসন

এমপি, মানে ৭০ অনুচ্ছেদের এজেন্ট দিয়েই খর্ব করা হয়েছে।

পাঞ্জাবিরা কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে প্রাদেশিক সরকার দিয়ে বাংলা শাসন করেছিল, সেই পাঞ্জাবিরা ব্যবস্থাটা রেখে গেছে। এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি। প্রাদেশিক সরকারের পুরো কাঠামোটা অবিকল আমরা গ্রহণ করেছিলাম। অনেক ক্ষেত্রে সেই নব্য পাঞ্জাবিরা শাসন করছেন।

সুতরাং যাঁরা বলেন, একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হয়নি, তাঁরা ঠিকই বলেন, কিন্তু তার ব্যাপকতা আছে। তাদের তালিকা নিয়ে ধরে ধরে মূল্যায়ন করা দরকার, ছয় দফার মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে। একই হাতে তালিকা নিতে হবে যে একটি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়ণের প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে 'স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের' সন্ধান করা যায় কি না। স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার জনগণকে দিতে হলে অবশ্যই পার্টি লাগবে। গত দুই দশকে বিশ্বে যেখানেই নতুন সংবিধান হয়েছে তার একটি অন্যতম ধারা হলো রাজনৈতিক দলের জবাবদিহি ও নিরীক্ষার প্রশ্নটিকে পাদপ্রদীপে নিয়ে আসা। অথচ বাংলাদেশে এটা অনুপস্থিত। এখানে এক-এগারোতে জবরদস্তি দলের নিবন্ধন ও জবাবদিহির নামে কতিপয় শিথিল বিধানাবলির প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু তা কেউ মানে না। নির্বাচন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশ্বাস করে না যে এই বিধানাবলির কড়াকড়িভাবে আরোপ করার মতো গণতান্ত্রিক সহনশীল পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজমান রয়েছে।

এই প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণে যে ড. কামাল হোসেন যা বলছেন, সে আলোকে আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় আছি। তিনি লিখেছেন, মানিক মিয়া দৌলতানাকে বললেন, আইয়ুবকে তো সরাব বুঝলাম। তাহলে তাঁর পরিবর্তে পাঞ্জাবিদের যে নতুন শাসকেরা আসবেন, তাঁরা কি সেই তথাকথিত 'প্যারিটি' সরিয়ে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বশীলতা মানবেন।

মানিক মিয়া বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কি পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি স্থানান্তর করবে? অর্থাৎ বাঙালি নির্বাচিতদের হাতে পুঁজি খরচ করতে দেবে। মূলধন দিতে ভয় পেত তারা। ভাবত বাঙালি কী করে টাকাপয়সা খরচ করবে। ওদের বিশ্বাস করা যায় না। টাকাপয়সা যেটুকু দিত তাও তাদের খাস আমলাদের তদারকিতে খরচ হতো। সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজও অটুট।

সেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আজও উপেক্ষিত। আজও 'কেন্দ্রীয় শাসক ও আমলারা' ভাবেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যথেষ্ট কর্মক্ষম নয়, কিংবা ওদের বিশ্বাস করা যায় না। তাই স্থানীয় সরকার কাঠামোতে তারা যে পরিবর্তনই আনুক বিএনপি ও আওয়ামী লীগ একমত যে ওদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাবে না। তার ফল এই শাসনে যে যখনই থেকেছে স্থানীয় সরকার দিয়ে উন্নয়ন বাজেটের দুই শতাংশ খরচ করা হচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় দলের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়,

সেই যুক্তি দিচ্ছে এটা গোপন রেখে যে তারা তাদের উন্নয়ন বাজেটের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে খরচ করছে (সাক্ষাৎকার ১৩ অক্টোবর ড. তোফায়েল আহমেদ)। মূলত সেই একই মনোভাব, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিশ্বাস করা যাবে না।

জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় যখন দুই নেত্রীকে সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে উঠল তখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির একচ্ছত্র প্রভাবকে ক্ষতিকর মনে করা হয়নি। সে কারণে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রশ্নটি অনুচ্চারিত থেকেছে। বলা হয়েছে আগে এরশাদকে অপসারণ করা হোক। তারপর অন্যসব দেখা যাবে। বলা হয়েছে এটাকে অপসারণ করলেই অন্যান্য সব পথ খুলে যাবে। ইতিহাস আবারও শিখিয়েছে সরানোর প্রক্রিয়াটা যদি গণতান্ত্রিক এবং অহিংস হতো তাহলে অন্য অনেক জট খুলত। আমরা এখনো সেই একই জট ও সংকটের মুখোমুখি। বেগম খালেদা জিয়া ৯২ দিনের একটি সহিংস কর্মসূচি দিলেন, দেড় শতাধিক মানুষ নিহত হলেন, কিন্তু সেই কারণে তাঁর দল থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়েনি। দলটি মানুষকে এখনো বোঝাতে পারছে যে নির্বাচন না করতে পারার কারণেই যত দুর্যোগ। একটা নির্বাচন হোক তাহলেই সমস্যা মিটে যাবে। তার মুখে সংস্কারের কোনো কথা নেই। গণমাধ্যম প্রথাগতভাবে দুই প্রধান দলের মূল নেতৃত্বের প্রতি কমবেশি আস্থাশীল থেকেই বাকস্বাধীনতা চর্চা করে থাকে। এর একটা বড় প্রমাণ হলো, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের খবর প্রকাশে যদি একটি সমীক্ষা চালানো হয় তাহলেই এই চিত্রটি ফুটে উঠবে যে সংবাদপত্র তাদেরই কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যারা জনপ্রিয়, যারা নির্বাচনে বেশি ভোট পায়। তাই এ দেশে পরিবর্তন ও সংস্কারের বিষয়টি বড় ধরনের কোনো জনবিতর্কের বিষয়ে পরিণত হতে পারছে না। এর ফলে 'গণতান্ত্রিক ঘাটতি' বেড়ে যাচ্ছে।

ওয়ান ইউনিট ও প্যারিটি এই উভয় রাজনৈতিক মতবাদ পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিকদের তরফে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার মূলে ছিল স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করা। মানুষের অধিকারকে নাকচ করা। নাম যা-ই হোক না কেন, মূলকথা ছিল একটি ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী বা অলিগার্কিকে (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যাকে বলেন কতিপয়তন্ত্র) সুরক্ষা দেওয়া।

প্রথম দফা : সরকার হবে ফেডারেল, সংসদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। আমরা ফেডারেল সরকার করতে পারি। বহুদেশ আমাদের চেয়ে কম আয়তনের দেশের ফেডারেল কাঠামো আছে। ৭০ অনুচ্ছেদের মতো কোনো অনুচ্ছেদ সংবিধানে ঢোকানোর কথা ছিল না। আরও অনেক কারণে সংসদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা বাকি রয়ে গেছে। সংসদ সরকার নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল। কিন্তু সরকার বহু ক্ষেত্রে সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয় দফা : প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া আর সব বিষয় আঞ্চলিক সরকার করবে। এর নির্যাস নিয়ে বলতে পারি, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বা সরকারব্যবস্থায় এর যতটা প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব ছিল, তা বাস্তবায়নের কোনো চেষ্টা চোখে পড়েনি। এমনকি বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনো জোরালো ভিত্তি পায়নি। শাসকগোষ্ঠী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে কাজে লাগে না এমন সব বিতর্কে লিপ্ত থেকেছে এবং সেই ধারা অব্যাহত আছে। চীন একদলীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকেও শিনচিয়াংকে ১৯৫৫ সালে স্বায়ত্তশাসন দেয়। উল্লেখযোগ্য আইন ও বিধিবিধান এবং নীতি প্রাদেশিক সরকার, সংসদ ও দল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ৬০ বছরে ১১৫ গুণের বেশি জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছে। কোনো খাসজমি কাউকে ইজারা দিতে হলে কোনো পৌরসভাকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। প্রযুক্তি ও ডিজিটাল যুগ আসার পরও স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা শাসকেরা মুখে আনছে না। এমনকি দলীয় ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করেও তারা 'বিকেন্দ্রীকরণ' শব্দটি মুখে আনছে না। কারণ তারা তৃণমূলের দল ও তার নেতাদেরও বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে কেন্দ্রশাসিত আমলাদের। সে কারণে কোনো পৌরসভা বা ইউপির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে জনপ্রতিনিধিরা অপসারিত হবেন। সেখানে বসবেন কেন্দ্রশাসিত আমলা। এভাবে ছয় দফা যেখানে ছিল স্বায়ত্তশাসনের মূর্ত প্রতীক এবং যাকে ১২১৫ সালে প্রণীত ব্রিটিশ শান্তি চুক্তি ম্যাগনাকার্টার সঙ্গে (যাকে পরবর্তীকালের সব লিখিত সংবিধানের মৌলিক মানবাধিকারের মৌলিক উৎস মনে করা হয়) তুলনা করা হয়, তার চেতনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্যুত হয়েছে। সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন ধারণার বিরোধিতা করা হয়েছে।

৬৫ বছর পর আমাদের আবারও ফিরে তাকাতে হবে পাকিস্তানি ২৩ বছর যেখানে দুটি প্রধান ধারা ছিল, সামরিক শাসন বা স্বৈরশাসনকে প্রলম্বিত করা এবং মৌলিক গণতন্ত্র করে কার্যত রাজনৈতিক দলকে অসম্মান করা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অমর্যাদা করা। আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলকে ভয় পেতেন, তার কারণ রাজনৈতিক দল বলে নয়, তার কারণ সেই পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভুটোর পিপিপি যেকোনো অনির্বাচিত ও অরাজনৈতিক শাসকের জন্য বিরাট হুমকি ছিল। সে কারণে আইয়ুব খান দেখলেন কেবল বন্দুকের নল দিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা যাবে না। সে কারণে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রে গেলেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিটি যে তখন বিশ্বের দেশে দেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট আগ্রহ জন্ম দিয়েছিল, এই বিষয়টি এই লেখক গভীরভাবে অনুধাবন করেন, যখন তিনি মার্কিন জাতীয় মহাফেজখানায় দেখেন যে

ওই সময়ে দুই পাকিস্তানে থাকা মার্কিন কনস্যুলেটগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মাঠপর্যায়ে এই নতুন ব্যবস্থা কী কাজ দিয়েছে তা তদারক করেছেন। ষাটের দশকে অর্চার ব্লাডও ঢাকার বাইরে গ্রামে গিয়ে মৌলিক গণতন্ত্র কেমন কী কাজ দিচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত ফিল্ড রিপোর্ট দিয়েছেন।

সভ্যতার সংঘাত ধারণার জন্য বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিজ* বইয়ে (পৃ. ২৪৩) লিখেছেন, 'দল' সম্পর্কে আইয়ুব খান জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিধ্বনি তুলে বলেছিলেন, দল জনগণকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে এবং অশুচ বাগাড়ম্বরকারীদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সংসদ হওয়া উচিত উচ্চ মর্যাদা ও প্রজ্ঞাবানদের দিয়ে যাঁরা কোনো দলের হবেন না। মিসরের নেতা নাসের যিনি ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে ব্যবহারকারী ট্যাংক সরবরাহ করেছিলেন, তিনিও দল সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করতেন। নাসেরের মতে, এটা সমাজকে বিভক্ত করতে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার। ১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর আইয়ুব এক সেমিনারে বলেছিলেন, (সূত্র ডন, ১৪ অক্টোবর, ২০১৪) 'ইস্কান্দার মির্জার 'কন্ট্রোলড ডেমোক্রেসি', আইয়ুবের 'বেসিক ডেমোক্রেসি' ও জেনারেল পারভেজ মোশাররফের 'টেইলরড ডেমোক্রেসি'র সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক সত্যি আলগা ছিল' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। সবারই লক্ষ্য ছিল মধ্যস্থতাকারী বা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথায় হেনশমেন বা তল্পিবাহক সৃষ্টি করা।

পাকিস্তানি রাজনীতির উত্তরাধিকার আমরা বহু ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে চলছি। ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হলো (পৃ. ১১), ১৯৬২তে এল নতুন সংবিধান। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার এল। পরোক্ষ নির্বাচন এল এবং গঠিত হলো একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে বাঙালিকে কার্যকরভাবে নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল (পৃ. ১১)।

জেনারেল এরশাদ যেভাবে ক্ষমতা নেওয়ার আগে পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেভাবে আইয়ুব খানও ক্ষমতা দখলের চার বছর আগে ১৯৫৪ সালে নিবন্ধ লিখেন।

যদিও এ কথা সত্য যে ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামো হলেই তা গণতান্ত্রিক হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে এ কথা সাধারণভাবে সত্য যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে ফেডারেল ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বের ছয়টি দেশ কাঠামোগতভাবে ফেডারেল কিন্তু সেখানে নির্বাচনী গণতন্ত্র নেই। এগুলো হচ্ছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ইথিওপিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (*ফেডারেল ডেমোক্রেসিস*, মাইকেল বার্জেস ও অ্যালান-জি গ্যানিয়ন সম্পাদিত, পৃ. ৩১৬)।

মাইকেল বার্জেস ও গ্যানিয়ন মনে করেন, 'এটা স্পষ্ট নয় যে ফেডারেলবাদ একট কার্যকর হাতিয়ার কিংবা অগণতান্ত্রিক শাসনকে তীব্রতা দেয়। ফেডারেশন একদলীয় কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন বা সামরিক জান্তা একটি ডি জুরে ফেডারেলিজমকে নাকচ করে ডি ফ্যাক্টো ইউনিটারিজম আরোপ করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো তারই একটি ধ্রুপদি দৃষ্টান্ত, যেটি একটি দল দ্বারা স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শাসিত হয়েছে। তবে কথা হলো ফেডারেলিজম হলো সে ব্যবস্থা যা আসলে একটি কার্যকর হাতিয়ার ও গণতান্ত্রিক শাসনকে তা গতিময় করে বলেই প্রতীয়মান হয় (*ফেডারেল ডেমোক্রেসিস*, পৃ. ৩১৬)।'

অনেকে যুক্তি দেন যে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ১ লাখ ৪৪ হাজার বর্গকিলোমিটারের আবাসভূমিটি তো ফেডারেল কাঠামো পরিচালনার উপযোগী ছিল না। এই যুক্তির ভিত্তি দুর্বল। ওই লেখকদ্বয় এ সম্পর্কে বলেছেন, 'নীতিগতভাবে একটি ফেডারেশনের ভূখণ্ডগত কোনো আয়তনের সীমারেখা নেই, এমনকি ফেডারেল অঙ্গসমূহকে একত্রে যুক্ত থাকতে হবে তারও কোনো যুক্তি নেই (যেমন আলাস্কা ও হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন)।

ড. কামাল হোসেন তাঁর ছয় দফার পরিচ্ছেদে স্মরণ করেছেন কী করে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে নিপীড়নের শিকার হলেন, তা থেকে মুক্তি পেতে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। ১৯৬৬ সালের মধ্যভাগের কথা। তিনি লিখেছেন, 'সে ধরনের নিপীড়নের মুখে আন্দোলনটি সংকটে পড়ল, আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো বিষয়টিকে আদালতে নিয়ে যাওয়া। আমরা একটি রিট আবেদনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়ার আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করলাম (পৃ. ২৬)।'

৫ দশক পরে এসে আমরা দেখি, যেকোনো ধরনের আন্দোলন ধরপাকড়ের কারণে সংকটে পড়ে এবং আদালতেও তা চ্যালেঞ্জ হয়। কিন্তু দুই অবস্থার মধ্যে একটি গুণগত মৌলিক ফারাক ঘটে গেছে। সেটা কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক? অগ্রগতি বা পরিবর্তনটা ঋণাত্মক হলে তা নিয়ে সমাজে কোনো আলোচনা আছে কি না? যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটা বদ্ধ সমাজের লক্ষণ কি না?

১৯৬৬ সালের সেই উত্তাল দিনগুলোতে ছাত্রজনতার আন্দোলনের কারণে সরকারের টলমল অবস্থা হয়েছিল। সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ কিন্তু দায়িত্বহীন আচরণ করেনি। তার প্রমাণ ড. কামাল হোসেনদের রিটের ফলাফল থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাইকোর্টের যে রিট বেঞ্চে ওই আবেদন করা হয়েছিল সেখানে তিনজন বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতি মাকসুমুল হাকিম, আবদুল হাকিম ও আবদুল্লাহ। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রিট আবেদনটি অগ্রাহ্য হলো। কিন্তু বিচারপতি আবদুল্লাহ ঠিকই

বাকস্বাধীনতার সপক্ষে ভিন্নমত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর নয়। আর আজ সাধারণ নির্বাচন চাওয়াটাও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ও অদরকারি বলে দায়িত্বশীলেরা মনে করতে পারেন। এরপর *ইত্তেফাক* মামলার ফলাফলকে ড. কামাল বলছেন, 'অধিকতর বর্ণিল ইতিহাস।' এর সঙ্গে আমরা আজ খুব কি কিছু তুলনা করতে পারি। হাইকোর্ট বেঞ্চ *ইত্তেফাক* বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ নাকচ করলেন। এরপর নতুন আইন দিয়ে তা ঠেকাতে গেলে চ্যালেঞ্জ হলো। আর তখনো ৩ : ১ ভোটদৃশ্য আমরা পেলাম। বিচারপতি সিদ্দিকী ও বিচারপতি সালাহ উদ্দিন আহমেদ রিট আবেদন নাকচ করলেন। আর বিচারপতি সায়েম ভিন্নমত দিলেন যে বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ অবৈধ।

বইটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে গোলটেবিল সম্মেলন (পৃ. ২৯)। সময়কাল ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর থেকে মার্চ ১৯৬৯। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি শওকত আলী বই লিখেছেন, *আগরতলা ষড়যন্ত্র সত্য মামলা*। এর প্রধান দুটি দিক নতুন প্রজন্মকে নির্মোহভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। সরকার তখন আমাদের জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিল তা যদি 'সত্য' হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে তখন আমাদের নেতাদের সামনে মামলা পরিচালনায় কী কী বিকল্প খোলা ছিল। ড. কামাল হোসেনের বিবরণ অনুযায়ী, এই ঘটনায় প্রথম যিনি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি আমীর-উল ইসলাম। তিনি তাঁর এক মক্কেলের (নেভাল কমান্ডো কামালউদ্দিন আহমেদ) সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পারেন যে জেলে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁর শরীরে তিনি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান (পৃ. ২৯)। তাহলে কি এ ধরনের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা এড়ানোর জন্যই আমরা সেদিন সেই 'সত্য' প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলাম? তখন 'সত্য' প্রকাশিত হলে কি জাতীয় নেতাদের ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণদান অবধারিত ছিল? আমরা যে সেদিন 'কৌশলগতভাবে' পুরো বিষয়টিকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখাতে চেয়েছি, বিশ্বের অন্যান্য জাতি একই ধরনের অবস্থায় মুক্তির জন্য কী পথ বেছে নিয়েছে? বড় প্রশ্ন, এটাই একমাত্র পথ ছিল কিনা? এই পথ অনুসরণ করাই কি একমাত্র উত্তম বিকল্প ছিল? তার চেয়েও বড় কথা, পুরো ঘটনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখানোর এই রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা বা না করা নিয়ে নীতিনির্ধারক মহলে কি যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার কোনো উল্লেখ ড. কামাল হোসেনের বইয়ে নেই। সেখানে কি সেদিন কেউ ভিন্নমত দিয়েছিলেন? যে জাতি মাত্র দুবছর পরেই মৃত্যুর জন্য বুক পেতে দিয়েছে, সেখানে কি কেউ ফাঁসির মঞ্চে যেতে চায়নি? সত্য প্রকাশ করে কেউ আত্মঘাতী হতে চায়নি?

অনেক সময় আইনজীবীদের কাছে তাঁদের মক্কেলেরা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে 'সত্য' প্রকাশ করে থাকে। আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা লড়তে গিয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবীদের কাছে তা কতটা পরিষ্কার ছিল। তারা কি এমন কোনো কৌশল নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন যেখানে 'সত্য'কে বাঁচানোর কোনো প্রচেষ্টা থাকতে পারত? মামলা লড়াইয়ের জন্য ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার টম উইলিয়ামসকে আনা হয়েছিল। ড. কামাল হোসেন দেখিয়েছেন কী করে টম উইলিয়ামসকে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী উত্ত্যক্ত করেছিল।

তিনি রাষ্ট্রের পক্ষের বিরুদ্ধাচরণকারীদের আইনজীবী। ঢাকায় তাঁর গাড়ি অনুসরণ করা হয়েছে। নিকৃষ্ট যেটা ঘটেছে সেটা হলো তার রুমের তালা ভেঙে ফাইলপত্র তছনছ করা হয়েছে। বেশ বোঝাই যায়, তাঁর জন্য সরকারি বাহিনী এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যাতে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। এ থেকে পরিষ্কার যে আদালতের পবিত্রতায় সরকার বিশ্বাসী ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো সরকারের যাঁরা প্রতিপক্ষ তাঁরা কতখানি এই পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা তো স্পষ্ট দেখি যে ড. কামাল হোসেন এবং আমীর-উল ইসলাম রিট করার যে ধারার সূচনা ষাটের দশকে কিংবা তাঁদের পেশাগত জীবনের সূচনায় করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা তো আজও চলছে। সেখানে কতটা গুণগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে বিশেষ করে যেখানে প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত সেখানে আইনের শাসনের চেতনা কতটা উজ্জীবিত? আমরা আমাদের রাজনীতিকদের মুখে কথায় কথায় পাকিস্তানি ২৩ বছরের নানা উপাখ্যান বলতে শুনি, সেটা কেন? সেটি কি এটাই নির্দেশ করে যে ওই সাংস্কৃতিক মানের উত্তরাধিকার আমরা আজও বহন করে চলেছি?

কোনো বিদেশি আইনজীবীকে আদালতের আঙিনায় ঢুকতে দেওয়া এবং না দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কি অতীতের স্পর্শকাতরতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছি।

টম উইলিয়ামসের কাছে কি আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার 'সত্য' দিকটি প্রকাশ করা হয়েছিল? তাঁকে কেন আনা হয়েছিল?

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, 'তাঁর সফর এবং এই মামলায় তাঁর অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্য পূরণ করেছে (পৃ. ৩১)।'

এটা লক্ষণীয় যে এ রকম একটি মামলায় যখন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো তখন কিন্তু কেবলই অবাঙালিদের দিয়ে তা গঠন করা হয়নি। কারণ বিশ্বকে দেখানোর মতো একটা তাড়না সেই সামরিক জান্তারও ছিল।

১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারির (এর তিন দিন পরে আসাদ নিহত হয়) তারিখ আমরা বিশেষভাবে মূল্যায়ন করব। কারণ আমার জানামতে এই প্রথম ড. কামাল

হোসেন এই তারিখ এবং পর্বটিকে অন্যান্য ঘটনা থেকে পৃথক করেছেন। উভয় অংশের শ্রদ্ধাভাজন রাজনীতিকেরা মিলে গঠন করেছিলেন আইয়ুববিরোধী ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি। কামাল হোসেন লিখেছেন, 'ড্যাক নেতারা বায়তুল মোকাররমে প্রতীকীভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেন। আসগর খান সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি দাঙ্গা পুলিশের টার্গেট হলেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর রঙিন পানি ছিটিয়েছিল। এই সমাবেশের তাৎপর্য ছিল সেটাই যে সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নেতারা সুচিন্তিতভাবে আইন ভঙ্গ করলেন। আর ছাত্রদের মধ্যে যারা দ্রোহি অংশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তাঁরা প্রতীকী আন্দোলনের মধ্যে আটকে ছিলেন না (পৃ. ৩৫)।' তার মানে এটা পরিষ্কার যে ছাত্ররা রাজনীতিকদের অতিক্রম করে গিয়েছিল। সুতরাং এ থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক পর্ব আমরা নিজেদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাব যে রাজনীতিকেরা এর বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন কি না? তাঁরা কি ধরেই নিয়েছিলেন যে ছাত্ররা আইয়ুব হটিয়ে কেবল তাঁদের ক্ষমতায় বসিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো বইখাতা হাতে স্কুলে ফিরে যাবে? তাঁরা কি সেটা ভেবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা কি ভেবেছিলেন যে নেতৃত্ব কোনোভাবেই যাতে ছাত্রদের হাতে না যায়। এর একটা কারণ কি এই ছিল যে রাজনীতিকেরা তাঁদের চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। ছাত্র নেতৃত্ব ছিল। পতাকা উত্তোলনের মতো নানা ঘটনাতেও আমরা দেখি রাজনীতিকেরা ছাত্রদের অনুসরণ করেছে। আর সেটা মনে রাখলে এটা ভাবতে সুবিধা হয় যে এরশাদকে হটাতে হঠাৎ করে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গজিয়ে ওঠেনি। ওই বীজ ওই মাটিতে আগেই বপন করা ছিল। একজন মেজর জিয়াই নিজেকে রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম রাজনীতিকদের ছাড়িয়ে যেতে চাননি। পতাকা তুলে এবং মুজিবকে অনেক কিছুতেই বাধ্য করে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে 'খর্ব' কিংবা কারও মতে হয়তো 'মহীয়ান' করে তুলেছে।

আমরা কখনো সত্যের মুখোমুখি নিজেদের দাঁড় করাইনি। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ব। একটা ন্যূনতম গণতন্ত্রচর্চা লাগবে। আমরা চীনের মতো একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ব। আমাদের ন্যূনতম একটা গণতন্ত্রচর্চা লাগবে। শুধু মুখের কথায় হবে না। খাতাপত্র লাগবে। আমরা অবাক হই যে আমরা বিভিন্ন দফার হিসাব রাখি কিন্তু খাতার হিসাব রাখি না। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো আর্কাইভ নেই। ষাটের দশকের বড় বড় ঘটনার কোনো রেজল্যুশনের কপি নেই। তাই ভিন্নমতের রেকর্ড নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসেরও তেমন কোনো রেকর্ড নেই। কেবল সিদ্ধান্তগুলো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রেস রিলিজ মিলতে পারে। সুতরাং কে কখন কোন বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশ্নে 'হ্যাঁ'কে না করেছেন, বা 'না'কে হ্যাঁ করেছেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা যাবে না। আর

এই প্রক্রিয়াতেই সব সময় স্বৈরশাসন বা এক ব্যক্তির শাসনকে টিকিয়ে রাখতে ধারাবাহিকভাবে আনুকূল্য দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া হবে। কিন্তু দল পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক ও গঠনমূলকভাবে ডিজিটাল বা আধুনিক কিছু ঘটে না। উদাহরণ দিই, সংসদীয় বিশেষ কমিটি সামান্য সংশোধনসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার টিকিয়ে রাখল। কিন্তু তা পরে কীভাবে বাতিল হলো তা জানা যায় না। বলা হয়, দলের অমুক সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সভার কোনো কার্যবিবরণী আপনি পাবেন না, পেলেও সেখানে কী যুক্তিতর্ক কে কীভাবে দিয়েছিল, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এটা যদিও 'ওসব কমিউনিস্টরা' করে, আমাদের লাগে না বলেন, আসলে তাঁরা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পান। এটা তাঁরা করেন কারণ তাঁরা জবাবদিহির কবলে পড়তে চান না। স্বচ্ছতায় তাঁদের কোনো বিশ্বাস নেই। তাঁরা সরকারি আমলা পোষেন, তাঁদের দ্বারা নথিপত্র সংরক্ষণে তাঁদের গভীর আস্থা। তখন আর 'কমিউনিস্টরা করে' বলে মুখ ঘুরিয়ে নেন না। জনপ্রশাসন চালাতে ওটা লাগে। কিন্তু দলীয় প্রশাসন চালাতে নথিপত্র সংরক্ষণ লাগে না। এর ফলে যা দাঁড়ায় সেটা হলো আমলারা দলীয় রাজনীতিকদের ওপর সহজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এটা মানা ভালো যে আমরা একাত্তরে স্বাধীনতা লাভের পরে ছাত্রদের আর ক্যাম্পাস জীবনে ফিরিয়ে নিতে চাইনি। কাজটা খুবই কঠিন ছিল অথচ শুরুই করা হয়নি। বরং আমরা প্রতিনিয়ত বিনা শর্তে এবং কোনো পরিণাম বিবেচনা না করেই ফলাও করে নতুন প্রজন্মকে শেখাই যে ছাত্ররাই তাদের লেখাপড়াসংক্রান্ত নিজস্ব ১১ দফার মধ্যে ছয় দফা ঢুকিয়ে তাকে বেগ দিয়েছিল। ছাত্ররাই শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল। অন্য পেশাজীবীরা তা পারেনি।

আমরা স্লোগানের মতো করে জানি, আইয়ুব খান গণ-অভ্যুত্থানে বিদায় নিয়েছিলেন। সত্যি। কিন্তু সত্যেরও নানা রূপ আছে। জেনারেল এরশাদকে আমরা 'গণ-অভ্যুত্থানে' বিদায় দিয়েছিলাম। সেটাই সব সত্যি? নাকি দুই অবস্থার মধ্যে একটি মিল হলো, যারা তাদের অগণতান্ত্রিক ও ছিনতাই করা শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছিল, তারা হঠাৎ উপলব্ধিতে নিয়েছে এদের টিকিয়ে রাখাটা আর সার্বিক বিবেচনায় ভায়াবেল নয়। তারা না বলার পরে তারা নেই হয়ে যায়। কামাল হোসেন লিখেছেন, 'কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই ১৮ বছর সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকার পরে তিনি তাদের দ্বারা ত্যাজ্য হলেন।' কথিতমতে তিনি একজন সফররত বিদেশি প্রতিনিধিকে বলেছেন, 'সম্ভবত তারা আমার মুখ দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।' জেনারেল এরশাদও এই একই উক্তি করেছিলেন। কারণ ১৯৬৯ ও ১৯৯০-এর মধ্যে কোনো মৌলিক কাঠামোগত ফারাক সৃষ্টি হয়নি। অনেকের মতে, অসাংবিধানিক শাসন বা সংবিধান ভেঙে পড়ার বিষয়টি বুঝি কেবলই 'ব্যক্তি বা

গোষ্ঠীর' সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। আসলে তা নয়। ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলো যারা প্রতিষ্ঠান গড়েছে সেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চাইলেই সংবিধানকে দুমড়ে দিতে পারে না। এটা এতটাই অসম্ভব যে সেখানে ষড়যন্ত্র চলে কিন্তু তাতে সংবিধান দুমড়ে যায় না। রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র কমবেশি থাকবে। কিন্তু যেসব দেশে ন্যূনতম জবাবদিহি ও স্বচ্ছতাসংবলিত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা থাকে না, সেখানে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব মাথা কুটে মরতে বাধ্য, আর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব না থাকলে এমনসব ষড়যন্ত্র চলে, যাতে সংবিধান থেকে ছিটকে পড়ার মতো ঝুঁকি থাকে।

আমাদের এই আত্মজিজ্ঞাসা থাকা দরকার একাত্তরের আগে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তম হয়েছিল বললে কিংবা সেটা স্বীকার করলে এটা প্রমাণিত হয় কি না যে তখন আওয়ামী লীগ ব্যক্তি ও কতিপয়তন্ত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় চলেছে, নাকি দলকে ভবিষ্যতের স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে তুলতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চিন্তা করা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, এটা তেমনভাবে করাই হয়নি, এমনকি তেমন কোনো দূরদর্শিতাও দেখানো হয়নি। সবটাই ছিল সরকারবিরোধী আন্দোলনকে সফল করতে। আজও সেই ধারা চলছে কি না? সেটাই বেগবান কিনা? বিএনপি দল গোছাতে পারে না। কিন্তু সেই দুর্বলতাকে তার পুনরায় বেশি ভোট পেয়ে সরকার গঠন করার সম্ভাবনার পথে বড় বাধা হিসেবে দেখা হয় না। সুতরাং আমাদের এখানে রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠনই করে অনেকটা এই নিয়তি মাথায় নিয়ে যে সে তার চলার পথে ছিটকে পড়তে পারে। যখন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ছিল তখনো কেউ দল গড়েনি। যখন নেই তখনো কেউ দল গড়েনি। তারা দলের ভেতরে ব্যালটে বিশ্বাস করে না। কারণ তারা তেমন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে না। তাই জাতীয় নির্বাচনও তারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না।

ড. কামাল গোলটেবিল নিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ করেছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের আলোচনার অংশ হিসেবে সংবিধান সংশোধনীর বিষয়ে আগাম সমঝোতা প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশিত। জেনারেল এরশাদের পতনের পরে আমরা দ্বাদশ সংশোধনী পাস করেছিলাম। যদি এই সংশোধনীটা নিয়ে বহু বছর ধরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আলোচনা করতে পারত তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া সম্ভব ছিল। এমনকি ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টিও তা পেত। ড. কামাল হোসেনের বইটি একটি জ্বলন্ত সাক্ষ্য হয়ে আছে যে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়ণ ও জবাবদিহি প্রশ্ন সব থেকে কম গুরুত্ব পেয়েছে। গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বায়ত্তশাসন। মানে রাজনীতিকদের ক্ষমতায়ন। প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন কী করে অর্থনৈতিক গোলামির জিঞ্জিরটা ভাঙা যায়। কিন্তু সেটা যারা ভাঙবে তারা সেসবের সুবিধা কী

করে গণতান্ত্রিকভাবে বিলাবেন তা আলোচনার বিষয় ছিল না। এক ইউনিট ভেঙে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন পাবে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার কী করে তৃণমূলে ও কেন্দ্রে প্রার্থী বাছাই করবে তার কোনো রূপকল্প তৈরি করা হয়নি। এ নিয়ে কখনো আলোচনা হয়নি। স্থানীয় সরকারের পবির্তনগুলো সেই সাক্ষ্য দেবে। এ দেশে কখনো ক্ষমতার পৃথক্করণ বা ক্ষমতার বন্ধন নিয়ে আলোচনা হয়নি। আলোচনা চলে এডিপির সাইজ কী হবে না হবে তার ওপর। আমরা শুনতে পাই তারা এডিপি বাস্তবায়ন করতে পারে না। তবুও তারা দল ও সরকারের সামর্থ্য বাড়ানোর কোনো কাঠামোগত আলোচনা একই সঙ্গে শুরু ও বাস্তবায়ন করার গরজ অনুভব হয় না।

আমি এটা মানব না যে দল চালানো নিয়ে তখন সময় ছিল না। কারণ এই সময় তারা কখনো পায়নি। সামনে কবে পাবে তা পরিষ্কার নয়। এরশাদের আমলে যখন সংস্কারের কথা বলেছি, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের কথা বলেছি, তখন বলা হয়েছে এরা দালাল। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী যখন বললেন, বিএনপিকে স্বরাষ্ট্রসহ পাঁচটি দপ্তর দেওয়ার কথা বললেও তারা নির্বাচনে আসেনি। আসন্ন নির্বাচনেও দেবেন তা তিনি বলতে নারাজ। অর্থাৎ কোনো সংস্কারে তাদের বিশ্বাস নেই। কৌশল, কৌশল আর কৌশল। এটাই চরম সত্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'সামরিক শাসন থেকে সাধারণ নির্বাচন ও এরপর'। মার্চ ১৯৬৯ থেকে মার্চ ১৯৭১। কামাল হোসেন লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু একটি গণপরিষদের প্রস্তাব করলেন। এর ৫৬ ভাগ আসন ৫৬ ভাগ জনসংখ্যার ভোটে নির্বাচিত হবে। এটা সবারই জানা এবং বহুল আলোচিত যে সত্তরের নির্বাচনে ইয়াহিয়া ও তার প্রশাসন ভেবেছিল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাই নির্বাচন তারা অবাধ করেছিল। কিন্তু গণপরিষদ কী করে বহুজাতিগত ও বহুধর্মগত ও বর্ণগতভাবে তার কোনো রূপকল্প ছিল না। আর বহুজাতিগত কোনো প্রতিনিধিত্ব ছাড়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক গণপরিষদ হতে পারে না। স্বাধীনতার পর বিতর্ক করা হয়েছে আমরা অবিভক্ত পাকিস্তানের আওতায় গণপরিষদ করেছিলাম; সেটা কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান লিখবে। অথচ মূল বিতর্ক হওয়া উচিত ছিল সত্তরের গণপরিষদ কি বহুজাতিগত ও বহুধর্মগত ছিল? সেটা কি একান্তভাবে বাঙালির, মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের করা হয়েছিল কি না? যদি তাই করা হয়ে থাকে তাহলে সেটাই ছিল বাহাত্তরের গণপরিষদের বড় গলদ। কারণ বাহাত্তরের সংবিধান পাহাড়িদের বাঙালি করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর কুঠারাঘাত করেছিল। এটা বাঙালি টের পেয়েছে বহু পরে যখন তারা 'সংখ্যাগরিষ্ঠের পূর্ণগ্রাস' অনুভব করতে শুরু করেছিল। পাহাড়িকে বাঙালি বানাতে তাদের তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। নিজের ঘাড়ে গরম নিশ্বাস অনুভব করার আগ পর্যন্ত তারা কেবল

পাকিস্তান না বাংলাদেশ প্রশ্নে বিতর্ক করেছে। বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজনেও নয়, তার ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের জাত্যভিমানকে অহেতুক আঘাত দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইসলাম নামকরণ গ্রহণ করে কোনো দলই থাকতে পারবে না। এর কোনো দরকার ছিল না। সেটা যে ভুল ছিল তার প্রমাণ আওয়ামী লীগ ১৫তম সংশোধনীতে অযথা স্ববিরোধিতা ও অসহায় আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছে।

৩১৩ আসনের সংসদ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। রাজা ত্রিদিব রায় ও মুসলিম লিগ নেতা নুরুল আমীনের বিজয়ের তাৎপর্য আওয়ামী লীগ অনুভব করতে পারেনি। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের জোশ দেখেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা দুটি প্রধান ধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন। আওয়ামী লীগ বিরোধী মুসলিম লীগের একটি আসন বিএনপিকে পরে দুশর বেশি আসন দিয়েছে। আজও আমরা আলোচনা করি না যে ১৬৯ আসনের মনোনয়ন কী প্রক্রিয়ায় হয়েছিল। একটি আসনের বিপরীতে কারা মনোনয়ন চেয়েছিল, আর তা কী প্রক্রিয়ায় দেওয়া হয়েছিল। কামাল হোসেনের বইয়ে এর উত্তর নেই। এটা উত্তর নয় যে সবাই তা মেনে নিয়েছিল। কোনো শান্তিভঙ্গ ঘটেনি। কোনো বোমা ফাটেনি। টাকার খেলা হয়নি। দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আজও এই হাতবাছাইয়ের যুগে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে না। কিন্তু তাই বলে তাকে আমরা গণতান্ত্রিক বলে মানতে পারি না। আমার সন্দেহ দলের শক্তির বহিঃপ্রকাশ না থাকলে পর্দার আড়ালের শক্তি আরও বেশি শক্তিমান হয়ে ওঠে। আর সেটা না হলেও জনগণ নানা সন্দেহ করে। মার্চের আলোচনা কোথায় কীভাবে কেন ভেঙে গিয়েছিল, তা কামাল হোসেন চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সব মুখ্য বিষয় এখানে আসেনি। এটা মোটেই অতীতের বিষয় নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের যে সংস্কারের কথা বলছি তা কোনো দিন বাস্তবায়ন করতে হলে আওয়ামী লীগ ১৯৬২ সালের সংবিধানের কেন, কোথায় কী সংশোধনী চেয়েছিল, তা দফাওয়ারি বিতর্কের কেন্দ্রে আনতে হবে। ১৯৭২ থেকে আলোচনা করলে হবে না। ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান নিয়ে কোনো মতবিরোধ ছিল কি না তা জানা যায় না। মুসলমান ছাড়া রাষ্ট্রপতি হবেন না, এই বিধান নিয়েও বিরোধ হয়নি। এটা সত্যি হলে মনে হতেই পারে লড়াইটা গণতন্ত্রের নাকি ক্ষমতাকেন্দ্রিক ছিল? ওই দুই বিধানে আওয়ামী লীগের কোনো সমস্যা না থাকলে আমরা কি এটাই সন্দেহ করব যে আওয়ামী লীগ উন্নয়নকে (স্বায়ত্তশাসনের অপর নাম) গণতন্ত্র ও ন্যায় থেকে আলাদা করে যে দেখছে সেটা নতুন নয়। এটা তাঁর অতি পুরোনো রুগ্ণ মতাদর্শ!

পিন্ডি ভাগ করে ক্ষমতা এনে 'স্বায়ত্তশাসন' করব ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে সেটা কবে কোথায় বলা হয়েছিল? সেটা হয়নি এবং

তার চিন্তারাজ্যেও তা ছিল না। তার প্রমাণ রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ কোনো প্রকারের আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ২৩ বছর ধরে অগণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলা প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাসে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার লোকবলসহ তা কবুল করে নিল।

কামাল হোসেন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যা থেকে প্রমাণ মিলবে যে া অ্যাডহক ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথম দিন থেকেই চালু করা হলো। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়েছেন। এখন তাঁরা কাজ করবেন কোথায়। প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন তাঁরা নতুন সেনাবাহিনীতে ঠাঁই পাবেন। কিন্তু তা হলো না। বঙ্গবন্ধু ভাবলেন তাঁদের একটা ঠাঁই করে দেবেন বিডিআরে। কিন্তু সেখানে নীরবে আমাদের ইতিহাসের প্রথম নীরব পিলখানা বিদ্রোহ হলো। বিডিআর তাদের নেবে না। মুজিব সেখানে ছুটলেন। কিন্তু তাদের রাজি করানো গেল না। ফিরে এসেই তিনি রক্ষীবাহিনী গঠন করলেন। নুরুল ইসলামের বরাতে দুর্দান্ত তথ্য প্রকাশ করেছেন কামাল হোসেন। নুরুল ইসলাম চাইলেন এমন একটি পরিকল্পনা কমিশন, যেখানে পাকিস্তানিদের মতো আমলারা নীতিনির্ধারণে ছড়ি ঘোরাবেন না। কিন্তু আমলারা রীতিমতো তা প্রতিহত করলেন। তাঁরা এমনকি তাঁদের মাথার ওপরে নয়া রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। সন্দিগ্ধ আওয়ামী লীগ কেবল আমলাদের তোষণ করতেই বিচার বিভাগকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করা থেকে বিরত থাকলেন। বড় নেতারা এসব মেনে নিলেন কারণ তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে করেই হোক ক্ষমতায় অনেক দিন থাকবেন। তাই আমলাদের অন্যায় আবদারের সঙ্গে তাঁদের বিনা শর্তে সন্ধি করতে হলো।

কামাল হোসেন ভুট্টোর প্রতি বাঙালিদের সন্দেহের কথা বলেছেন। লিখেছেন 'ভুট্টোর সঙ্গে আর্মির যোগসূত্র থাকার বিষয়ে কিছু সত্যতা থাকতে পারে।...হামিদ, উমর, গুল ও পীরজাদার মতো হকিশ জেনারেলরা ভুট্টোকে 'জাতীয় স্বার্থের' ধারকবাহক হিসেবে মনে করলেন (পৃ. ৭৫)।'

এই ধারণা সত্যি হলে তার মানে দাঁড়ায় এই যে জেনারেলরা একদা 'জাতীয় স্বার্থে' ভুট্টোকে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুজিবকে শায়েস্তা করা বা পথের কাঁটা দূর করার কাজে সাহায্য করেছিলেন, জেনারেলরাই পরে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। শেখ মুজিব ভুট্টোকে বলেছিলেন, সামরিক বাহিনীর ক্রীড়নক না হতে। বলেছিলেন, ব্যবহার করার পরে তাঁরা তোমাকে গিলে খাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। এসব কথা সাধারণত লেখালেখি হয়। কিন্তু যেটা হয় না তা হলো আমলারা সবার আগে টের পায় যে রাজনীতিকেরা দলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত জোরে নয়, তারা আমলাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করার জোরে টিকে থাকতে চায়। সুতরাং এই রাজনীতিকেরাই

ঝানু আমলাদের চোখে ক্রমশ বোঝা হয়ে ওঠেন। আর তখন তাঁরা 'জাতীয় স্বার্থের' সংজ্ঞাটা বদলে নেন। এটা বদলাতে যেটা করতে হবে সেটা হলো, জনপ্রশাসনের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আমলা নিয়োগ ও পদোন্নতির পাশাপাশি মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দলীয় নেতা নির্বাচন ও তাঁদেরই আমলাদের নেতা বানানোর প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে হবে।

জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, দলীয় শাসন নির্বিশেষে এমনভাবে চালানো হয় যেখানে জনপ্রতিনিধিরা কখনো ডিসি ও টিএনওদের প্রভাববলয়ের বাইরে যেতে পারে না। মানুষও জেনে গেছে, ডিসি, এসপি ও টিএনওরাই সর্বেসর্বা। নির্বাচিতরা বড় নেতা ও বড় আমলা উভয়ের তল্পিবাহক।

বইটির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একাত্তরের ১ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন বর্ণিত হয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি টানা ৯২ দিন অসহযোগ আন্দোলন করেছেন। সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছাড়া আর কোনো ধরনের রাজনৈতিক অর্জন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই দেউলিয়াপনা কেবল একটি দলের নয়, এটা বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনার প্রতিফলন। সুতরাং কেবল বিএনপির নিন্দা ও সমালোচনা প্রাপ্য নয়, এই লজ্জা ও ব্যর্থতা রুগ্‌ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুটোই সন্ত্রাসপ্রবণ হয়ে পড়েছে। জনগণ যদি সম্পৃক্ত থাকে তাহলে একটি শাসনব্যবস্থা কীভাবে গণমুখী হতে পারে তার একটি ধ্রুপদি নজির হলো মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো।

সরকারকে অচল করা আর জনজীবনকে অচল করার মধ্যে পার্থক্য আনা হলো। টানা চার দিন সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত হরতাল হলো। তাও আবার ডাকঘর, রেলসহ সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন, কলকারখানাকে এর বাইরে রাখা হলো। তখন নেতারা চাইলেই টানা চার দিন হরতাল ডাকতে পারতেন। সেটা অসফল হতো না। তবে দেখার বিষয় হলো সেই কর্মসূচি ঠিক করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনের মতো ব্যক্তিরা। এখন কী প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি দেওয়া হয় এবং কোথায় কীভাবে কারা সিদ্ধান্ত দেয় তা বোঝা কঠিন। তাহলে আমরা দেখি, দখলদার বাহিনী হটাতেও জনস্বার্থ মাথায় ছিল। আর স্বাধীন দেশে হরতাল ডাকা শুরুই হলো সব ধরনের পরিবহন ও কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়ার টার্গেট নিয়ে।

ড. কামাল হোসেনের বইটি যদিও আমাদের আলো দেখায় না যে বাকশাল কেন ও কী কারণে গঠন করা হয়েছিল। তবে এটা পরিষ্কার করে যে দলের পুনর্গঠনের চিন্তা তাজউদ্দীন আহমদ করেছিলেন, কিন্তু তা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ধরনের বহু তথ্য রয়েছে, যা আমাদের ইতিহাস নির্মোহভাবে অনুধাবনে

গুরুত্বপূর্ণ। কামাল হোসেন তাঁর দিকের ঐতিহাসিক দায়িত্বটি নিশ্চয় অনেকখানি পালন করেছেন। কোথাও বলেননি, কিন্তু পাঠক পড়তে গিয়ে বুঝবেন যে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সুতো গেঁথেছেন সমকালীন ঘটনাকে স্মরণ রেখেই। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে দলের গণতন্ত্রায়ণই মূলকথা। বর্তমানে সবচেয়ে অনীহা হলো অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে অন্তত হাজার মাইল দূরে রাখা। দলের গণতন্ত্রই বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারে। প্রথাগত সাধারণ নির্বাচন এর সমাধান দেবে না। অথচ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে ব্যক্তি বা কতিপয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গড়ে তোলার কথা আজও ভাবা হয়।

এত ঘটনা থাকতে ড. কামাল হোসেনের মনে পড়েছে একজন ইকবাল আতহারকে। এই ইকবালের গল্প দিয়ে শেষ করি। তিনি লিখেছেন, 'ইকবাল অবাঙালি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করা হয়। স্বাধীনতার পরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খলিকজ্জামানকে তৃণমূলের বাংলাদেশ দেখতে পাঠানো হয়েছিল। ওই ভদ্রলোক ইকবালের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁকে হেড অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে মুসলিম লীগের সব স্থানীয় কমিটি বাতিল করে নতুন করে কমিটি গঠন করতে। এর লক্ষ্য কেন্দ্রের প্রতি অনুগতদের দিয়ে কমিটি গঠন করা (পৃ. ৭)।' ইকবাল বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে সপক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। ইতালিতে তিনি আমাদের প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

আমার কোনো সন্দেহ নেই যে দলীয় গণতন্ত্র প্রশ্নে আমরা যত কথাই বলি না কেন, আমরা ১৯৪৭ সালেই পড়ে আছি। এক-এগারোতে জবরদস্তি দলের নিবন্ধন ও তাদের অডিট ব্যবস্থা চালু করেছি, কিন্তু ওসবে কারও বিশ্বাস নেই। স্থানীয় সরকারের নির্বাচন দলীয়ভাবে করার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির উপরে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। স্বায়ত্তশাসন যেটুকু তলানিতে জমত, তাও চেটেপুটে নিঃশেষ করা হবে। সর্বত্র আমাদের লোক চাই। এবার 'হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ'। আমার অনুগত লোক চাই। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই, হাজার হাজার চৌধুরী খলিকজ্জামান সারা বাংলাদেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কানে কানে বলছে, 'অনুগত থাকো। হলে তোমারই হবে!'

খ্যাতি
বই আলোচনা
চিন্তা

ভয়ের সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধান

রেজাউল হক

ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি,
আলী রীয়াজ, ২০১৪, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সাবিন মাহমুদ, পাকিস্তানের একজন মানবাধিকারকর্মী। করাচির প্রাণকেন্দ্রে নিজ ক্যাফে 'দ্য সেকেন্ড ফ্লোরের' সামনে গত এপ্রিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সমমনা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক আর মুক্তমনাদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছিল দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। বেলুচিস্তানে বছরের পর বছরজুড়ে বেলুচদের ওপর চলা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই তাঁর অপরাধ। বেলুচিস্তান নিয়ে এক সেমিনারে অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এর আগে লাহোরের প্রখ্যাত লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে এ রকম একটি সেমিনার বাতিল করতে হয়েছিল সরকারের চোখরাঙানির কারণে। করাচির সেমিনারকে ঘিরেও সরকারের কাছ থেকে হুমকি রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো বাধা মানেননি তিনি।

সাবিনের স্মরণে *দ্য ফ্রাইডে টাইমস*-এ অসাধারণ এক শোকগাথা লেখেন পাকিস্তানি কবি ও সাহিত্যিক সালমান তারিক কোরেশি। লেখার ইতি টানেন এভাবে : 'তাঁকে মারা হয়েছে কারণ মুক্তচিন্তা বেশ ছোঁয়াচে। এর দ্রুত বিস্তার রোধে যেসব জায়গায় এর জন্ম, সেখানেই এর বিনাশ জরুরি। তাঁর হত্যাকাণ্ড বাকিদের জন্য এক সতর্কবার্তা।'[১]

সাবিনের মতো একদল মানুষের স্বাধীন চিন্তা আর কাজের রাশ টেনে ধরার জন্য তাদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আতঙ্ক। আর এভাবেই স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে আতঙ্ক আর ভয় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের শক্তিশালী অস্ত্র।

২.

ভয় ও আতঙ্কের এই সংস্কৃতি বাংলাদেশেও বিরাজমান। প্রথমা থেকে প্রকাশিত আলী রীয়াজের *ভয়ের সংস্কৃতি: বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি* বইটিতে বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতির শেকড়-সন্ধান আর এর ব্যাপকতা বোঝার এক প্রয়াস। সমাজে বিদ্যমান নানা চাপান-উতোর, জাতীয় সমস্যা, সাম্প্রতিক সহিংস রাজনীতি, রাষ্ট্রের কঠোর অবস্থান এবং কীভাবে ভয়ের সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করছে, তা বুঝতে হলে এই বইয়ের পাতা ওল্টাতেই হবে।

আলী রীয়াজ মনে করেন, 'ভয়ের সংস্কৃতি উপস্থিত সর্বত্র এবং তা সম্পর্ককে ভাগ করে দিচ্ছে পদসোপান অনুযায়ী : প্রবল ও অধস্তন; পেট্রন ও ক্লায়েন্ট—এভাবে। এই সম্পর্ক কেবল গোষ্ঠীগতই নয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও উপস্থিত। বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে জবরদস্তির যে উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই, মানুষ হিসেবে মানুষের ন্যূনতম সম্মান যে কোনোখানেই কেউ কাউকে দিতে নারাজ, তা-ও আসলে সৃষ্টি অন্যকে ভীত করে নিজের কাজ আদায়ের মানসিকতা থেকে' (পৃষ্ঠা-১৫)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ শুরুর দিকে ভয়ের সংস্কৃতি এবং এর নানা দিক ব্যাখ্যা করেছেন। যে সমাজে এই ভয়ের সংস্কৃতি বিদ্যমান, সেখানে সহিংসতা আর বলপ্রয়োগ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী আর মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ভয়ের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্নমতকে স্তব্ধ করে দেওয়া। গ্রামসিকে উদ্ধৃত করে রীয়াজ বলছেন, 'একটি গোষ্ঠী আরেকটি গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইলে প্রথমেই আদর্শিক আধিপত্য স্থাপন করতে হবে। আর আদর্শিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হলে একটি গোষ্ঠী যে আরেকটি গোষ্ঠীর চেয়ে নৈতিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে শ্রেয় তা প্রমাণ করতে হবে' (পৃষ্ঠা-২৩)।

আর সমাজের ক্ষমতাবান ও আধিপত্যকামী গোষ্ঠী নিজের মতাদর্শকে প্রধান করে তোলার জন্য সমাজে বিরাজমান অন্যান্য মতাদর্শকে কোণঠাসা করে একেবারে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। কাজেই ক্ষমতার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে প্রান্তিকতার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতে, সংস্কৃতির ক্রিয়াশীলতার মধ্যে একটি প্রান্তিকতা আছে। প্রতিটি সংস্কৃতির রক্ষক বা মোড়ল থাকে। এই মোড়লেরা সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে দেন। আর সংজ্ঞার মাধ্যমে তৈরি ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ। আর এই ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা, কেন্দ্রের ব্যাখ্যা। সমাজে ক্ষমতাসীনদের এই ব্যাখ্যা ও মতাদর্শের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ায় ব্যাখ্যা ও মতাদর্শের ঠাঁই হয় প্রান্তিক অবস্থানে। আর সমাজ গঠনে অসমভাবে ছড়ানো আছে প্রান্তিকতার অবস্থান ও বিভিন্ন মুহূর্ত। আর এটিই কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তিকতার সম্পর্ক নির্ধারণ করছে।[২]

রীয়াজ এরপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভয়ের সংস্কৃতির রাজনৈতিক অর্থনীতির দিকে। রীয়াজের পর্যবেক্ষণ, একদল মানুষ বা একটি সুসংগঠিত শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকার জন্য নিজেদের মতো করে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছে। আর বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে ভয়, সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের উপস্থিতি ছিল।

বাংলাদেশে আইনের শাসনের অভাব আর আমলাতন্ত্রের স্বাধীনতা কীভাবে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম করেছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রীয়াজ তুলে ধরেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের পর্যবেক্ষণ : 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঐতিহ্যে আইনের শাসন নেই। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ১০০ বছরে আইন ছিল প্রশাসনিক ফরমান, ডিক্রি, অনুশাসন। ১৯১৯ অ্যাক্ট থেকে ১৯৩৫ অ্যাক্ট পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে জনগণের ভোটাধিকার ছিল সীমিত, এই ভোটাধিকার বৃদ্ধির জন্য জনগণকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কেন্দ্রের এবং প্রদেশের সরকারগুলো আইন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ববহ সদস্য ছিল সরকারি কর্মকর্তাই এবং সরকার মনোনীত। পাকিস্তান আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আইনের শাসন কার্যকর ছিল না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর প্রাথমিক পর্যায়ে আইনের শাসন সংকুচিত ছিল। জিয়াউর রহমান কালপর্বে বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র থেকে রিক্রুট করা মনোনীত মন্ত্রী এবং বাছাই করা "জনপ্রতিনিধি"র মন্ত্রীর ছিল করায়ত্ত। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের পশ্চাৎপটে ছিল ব্যর্থ একটি সামরিক অভ্যুত্থান, অভ্যুত্থান-পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠক এবং বৈঠক-পরবর্তীতে লাইসেন্সের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের বৈধতা দেওয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় তার বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনা। এরশাদ আমলে এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায় লাভ করেছিল। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দেশ শাসনে আইনের শাসন নেই, এই আইন জনগণ তৈরি করেনি বরং তৈরি হয়েছে জনগণের জন্য : ফলে তৈরি হয়েছে দ্বিবিধ মন, একটি বেসামরিক/সামরিক রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য, অপরটি জনসাধারণের জন্য; একটি আমলাতন্ত্রের জন্য অপরটি ক্ষমতাসীনদের জন্য; একটি পার্টির জন্য অপরটি পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের জন্য। এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আইনের শাসনের ঐতিহ্য তৈরি করেনি বরং তৈরি করেছে কর্তৃত্ববাদী শাসনের ঐতিহ্য। অন্য পক্ষে এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতিতে ঐতিহাসিক চূড়ান্ততা হচ্ছে কর্তৃত্ববাদ। এই কর্তৃত্ববাদ ব্যবহার করেছে উদারনৈতিকতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, আইনের শাসন (শেখ মুজিবের মুজিববাদ, জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্র, এরশাদের

উন্নয়নের রাজনীতি, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিক কাল্ট) অলজ্জিতভাবে আইনবহির্ভূত প্রভুত্বের রাজনীতি বিস্তারের জন্য (পৃষ্ঠা-৪৪)।'

স্বাধীনতার পরপরই যে সরকার ক্ষমতায় এল, তা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দলীয় কর্মীদের ক্ষেত্রবিশেষে বাড়াবাড়ি, দুর্নীতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলো। শাসকশ্রেণি জনগণের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলো রাষ্ট্রের ওপর। শিল্পকারখানা, সমাজতন্ত্র আর অর্থনীতিতে জাতীয়করণ করা হলো নামে। আর ঠিক এ রকম অবস্থায় জনগণের মধ্যে আদর্শিক আবেদন কমে যাওয়ায় শাসকশ্রেণি সমাজে বিরাজমান অন্য আদর্শগুলোর ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তারে নির্ভর করল বলপ্রয়োগের ওপর। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বাহিনীকে এ জন্য ব্যবহার করা হলো। ৭ মার্চ ১৯৭২-এ জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৭২ নামে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে গড়ে তোলা হলো রক্ষীবাহিনী নামে সম্পূর্ণ নতুন এক নিপীড়ক বাহিনী।[৩]

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০-এর সময়টিতে বাংলাদেশ 'ইন্টারমিডিয়েট স্টেট' থেকে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টেট'-এ পরিণত হয়। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ পুনর্বণ্টনের ভার। পঁচাত্তর-পরবর্তী দুটি সামরিক সরকারের সময় নিপীড়ন, রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা আর সংবিধানকে ইচ্ছেমাফিক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর বাইরে এ সময় ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয়। বিরোধী মতাদর্শ দমনে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের সংস্কৃতি এ সময় আরও কদর্য ও হিংস্র রূপ লাভ করে। পঁচাত্তরের ঠিক পরবর্তী বছরগুলোতে সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়কার শাসকশ্রেণি সামরিক বাহিনীগুলোতে 'শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনার অজুহাতে সেখানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে লোক দেখানো বিচারের নামে ভিন্নমতাদর্শীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। এর ভেতর কেবল ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর থেকে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে ১ হাজার ১৪৩ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর কয়েক শ জনকে ১০ বছরমেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের ভাষায় এসব 'বিচার' বিচার ছিল না। এসব করা হয়েছিল সে সময়কার শাসকশ্রেণির প্রতিহিংসা মেটানোর জন্য।[৪]

১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। নতুন প্রজন্মের একদল পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটে আর সম্ভাবনা তৈরি হয় মতৈক্যের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার, যেখানে আইনের শাসন নিশ্চিত হবে। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থ আর শাসক পরিবারগুলোর মধ্যে বৈরী প্রতিযোগিতা সেই সম্ভাবনায় পানি ঢেলে দেয়। আর তখন থেকেই শাসকগোষ্ঠী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নিপীড়ক প্রতিষ্ঠান আর নানা কালো আইনের ওপর।

৩.

শাসকগোষ্ঠীর জন্য হুমকিস্বরূপ স্বাধীন মতকে বাধা দিতে কীভাবে এই ভয়ের সংস্কৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা-ও আলী রীয়াজ বিশদ আলোচনা করেন এ বইয়ে। রীয়াজ অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখান কীভাবে বিভিন্ন সময়ে শাসক দল আর রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য সহিংসতায় কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

পত্রিকা প্রতিবেদন আর পরিসংখ্যান দিয়ে আলী রীয়াজ বলেন, এই গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমাজে একটি আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যেখানে মানুষ অসহায়, আতঙ্কিত এবং সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আতঙ্কিত মানুষ সাধারণত অন্যায়কে উপেক্ষা করে এবং কখনো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। এই ভীতিকর পরিবেশ প্রচলিত ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে বেশ কাজ করে। আর আতঙ্কিত সমাজে প্রতিবাদকারী মানুষের সংখ্যাও বেশ কমে যায়। আর জনগণের সামনে ক্ষমতা প্রদর্শন করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও বেছে নেয় সহিংস পথ।

অতীতে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি আর সরকারের কার্যক্রমের দিকে তাকালেই এর সত্যতা মেলে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ৮৮ জন, যাঁদের ভেতর ১২ জন পরে মুক্তি পান, গুম ও গুপ্তহত্যার শিকার হন। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন ও কারা হেফাজতে মারা যান ৭৩ জন।[৫] বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটকে ৫ জানুয়ারির রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়ায় যে সহিংস অবরোধ শুরু হয়, তাতে আসকের হিসাব (জানুয়ারি-এপ্রিল) মতে ৬১৩টি ঘটনায় প্রাণ হারান ১২৫ জন (অবরোধে নিহত হন ৭৮ জন) আর আহত হন ৩৩৭০ জন।[৬] আর সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান হতাহতের যে হিসাব (৫ জানুয়ারি-২৪ ফেব্রুয়ারি) দেন, সেখানে দেখা যায়, ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মারা যান ১১৯ জন, এঁদের মধ্যে বিএনপি-জামায়াত জোটের অবরোধের বলি হন ৬১ জন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মারা যান ৩৭ জন।[৭]

৪.

রীয়াজ মনে করেন, ভয়ের সংস্কৃতি একটি 'সামাজিক প্রপঞ্চ', যার স্বরূপ উন্মোচিত হয় 'অনুশীলন (বা প্র্যাকটিস)' এবং 'আলোচনা (বা ডিসকোর্স)'-এর ভেতর দিয়ে। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি টেনে আনেন ফরাসি দার্শনিক এতিয়েন বালিবারকে। বালিবারকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন: 'বর্ণবাদের প্র্যাকটিসগুলো হলো সহিংসতা, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, মানহানি, শোষণ। আর তার

পাশাপাশি আছে ডিসকোর্স, যেগুলো অন্যকে আলাদা বলে ক্রমাগতভাবে চিহ্নিত করতে তৎপর। গায়ের রং, নাম, ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে একধরনের স্টেরিওটাইপ বা ছাঁচে ফেলা ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে; অন্যকে সেভাবেই প্রতিনিধিত্ব করে (পৃষ্ঠা-৬৫)।' বাংলাদেশে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচলিত ডিসকোর্সের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। এ দেশের আদিবাসীদের ব্যাপারে এ ধরনের ডিসকোর্সগুলো বেশ চোখে পড়ার মতো।

'আদিবাসীদের সাংবিধানিক অস্বীকৃতির সাথে আছে সমাজে তাদের সমান বলে স্বীকার না করে নেওয়ার প্রবণতা। আমাদের এখানে আমরা নিজেদের বাঙালি/বাংলাদেশী নামে পরিচয় দিই আর অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের চিহ্নিত করি "উপজাতি" হিসেবে, তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তাদের মর্যাদা জাতির সমান নয়। কিন্তু এই চিহ্নিতকরণ কতটা যুক্তিসংগত? নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরার মতে, নৃবিজ্ঞানে "উপজাতি" বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের সমাজব্যবস্থা জ্ঞাতি সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ অনুপস্থিত। এই অর্থে তথাকথিত "উপজাতি"দের সে নামে ডাকার কোনো যৌক্তিকতা বর্তমানে নেই, কারণ তারা কেউই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বাইরে স্বাধীন গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ হিসেবে বাস করে না।'[৮]

আলী রীয়াজের পর্যবেক্ষণ, 'সরকারি ও বেসরকারি উভয় অংশ থেকে, "উপজাতিদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের" জন্য যে চেষ্টা ও আহ্বান থাকে, তাতে চিহ্নিত হয় "মূলধারা" ও "প্রান্তিক" অবস্থানের বিষয়টি (পৃষ্ঠা-৬৬)।'

নৃবিজ্ঞানীর বয়ানে রীয়াজ তুলে ধরেন কীভাবে আদিবাসীদের নিজ ভূমিতে দৈনন্দিন নানা আচরণের মধ্য দিয়ে অসম্মানজনক জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'চাঁদের গাড়ি' নামে যে বিশেষ ধরনের যান রয়েছে, তার সামনের সারির আসনগুলোয় আদিবাসীদের বসার অধিকার নেই। এমনকি যাত্রী না থাকলেও আদিবাসীদের পাড়াপ্রধান অথবা মৌজাপ্রধানদের পাদানিতে ঝুলে গন্তব্যে যেতে হয়। আর নৃবিজ্ঞানীর নিজস্ব বর্ণনায় পাহাড়িদের অবমাননার কদর্য রূপটি উঠে আসে, 'আর হেল্পারদের ভাষা ব্যবহারের রীতি বুঝতে পারলে, মনের সকল তত্ত্ব জানা যায়। পাহাড়িদের জন্য প্রথম, এবং শেষ, সম্বোধন হচ্ছে "তুই" আর অপাহাড়িদের জন্য সম্বোধন হচ্ছে "আপনি" আর আপনার [কাছের মানুষ] লোক হলে বড়জোর "তুমি"।...এ হচ্ছে পাহাড়ে বিদ্যমান পাহাড়ি-সম্পর্কিত বাঙালি মনস্তত্ত্ব।'[৯]

আদিবাসীদের নিজ জমি থেকে উৎখাত করার জন্য সেখানে ঘটানো হচ্ছে সহিংসতা। আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা কাপেং ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভূমিকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় পার্বত্য

চট্টগ্রামে ১৫৩টি পরিবার আক্রান্ত হয়েছে এবং বসতবাড়ি পুড়েছে ৫৮টি। আর সহিংসতার ঘটনায় হতাহত মানুষের সংখ্যা ১২৬। কাপেং ফাউন্ডেশনের দাবি অনুযায়ী, আলোচ্য সময়ে ৩ হাজার ৯১১ একর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভূমি বেদখল হয়ে গেছে। এর মধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলায় এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী প্রায় ১৭৫ একর আদিবাসীদের জমি জোর করে দখল করে নেয় আর উচ্ছেদ করে ৭৪টি আদিবাসী পরিবারকে।[১০]

আলী রীয়াজের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভয়ের সংস্কৃতির তিনটি মাত্রা রয়েছে: প্রথমত, সংবিধানে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়ত, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি ধ্বংস করা। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করা (পৃষ্ঠা-৭৩)।

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেখানে তাদের বদলে রয়েছে 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী'। আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমির লড়াই আর বঞ্চনার ইতিহাস নিয়ে আরণ্যক নাট্যদলের এক অসাধারণ নাটক *রাঢ়াঙ*, যার মানে দূর থেকে ভেসে আসা মাদলের ধ্বনিতে জেগে ওঠার আহ্বান। মামুনুর রশীদের রচনা ও নির্দেশনায় নাটকটিতে দেখা যায় মহাজনের শঠতা আর ঋণের চক্রে পড়ে জমি হারাতে বসা একদল সাঁওতাল ছুটে আসে ঢাকার এক নামকরা উকিলের কাছে। সাঁওতালরা জমির মাপজোখ বোঝে না আর জমির নথিপত্র রাখার ব্যাপারটাও জানে না। উকিল সাহেব তাদের অভয় দেন আইএলও কনভেনশনের ১৬৯ ধারার কথা বলে, যেখানে আদিবাসী হিসেবে সাঁওতালদের নিজ ভূমির ওপর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[১১]

কিন্তু সংবিধান যেখানে আদিবাসীদের অস্তিত্বই স্বীকার করে না সেখানে নিজ ভূমির ওপর তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে কীভাবে? আর নিজস্ব ভূমিতে গড়ে ওঠা জীবনধারা ও সংস্কৃতিও বিপন্ন হয়ে পড়ে যখন তারা নিজের ভূমির ওপর অধিকার হারায়। অন্যদিকে, তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ঘটছে সংখ্যাগুরুর ভাষা দিয়ে তাদের মাতৃভাষা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। আলী রীয়াজের ভাষায়, 'আদিবাসী ভাষাকে প্রবল জনগোষ্ঠীর ভাষা দিয়ে পরাজিত করার ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও জীবনই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রবল জনগোষ্ঠীর দ্বারা (পৃষ্ঠা-৮৬)।'

৬.

একটি গোষ্ঠীর অপর গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলে সমাজে একধরনের অসম সম্পর্কের দরকার। সম্পদের ওপর অসম অধিকার, আদর্শিক আধিপত্য আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সমাজে অসম সম্পর্ক সৃষ্টি

হয়। সম্পদের ওপর অসম অধিকার সমাজের ভেতর সামাজিক অবস্থানের এক পদসোপান তৈরি করে। যার সম্পদ যত বেশি, সমাজে তার অবস্থান তত উঁচুতে। লিঙ্গজ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। প্রচলিত আইন পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত না করায় সমাজে নারীর অবস্থান একটু নিচের দিকেই।

সমাজে বিভিন্ন সময়ে যেসব আদর্শের প্রাবল্য দেখা যায়, তার কারণেও সম্পর্কে অসমতা সৃষ্টি হয়। দুটি উপায়ে ভাবাদর্শ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্য স্থাপন করে। 'প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডিসকোর্স তৈরি ও তা বহাল রাখার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, ওই ডিসকোর্সের স্বীকৃতি ও অনুমোদনের ব্যবস্থা করে (পৃষ্ঠা-৮৯)।'

আমাদের সমাজে 'নারী আর পুরুষ সমান নয়', 'পুরুষ স্বভাবতই আক্রমণকারী', 'মহিলাদের কাজ এটা, ওটা তাদের কাজ নয়'—এ ধরনের ডিসকোর্সের গ্রহণযোগ্যতা লিঙ্গজ অসমতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। অসম সম্পর্ক তৈরিতে রাষ্ট্রেরও দায় আছে। রীয়াজ আরও আলোচনা করেন, কীভাবে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আর সাংঘর্ষিক আইন তৈরির মাধ্যমে এই অসম সম্পর্ক তৈরি করছে। রীয়াজের পর্যবেক্ষণ—সমাজে অসম সম্পর্ক বজায় রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বলপ্রয়োগ, সহিংসতা ও আতঙ্ক।

হিন্দুরা কীভাবে রাজনৈতিক সংকটের বড় শিকার হচ্ছে, তা-ও উঠে আসে রীয়াজের বইয়ে। বারবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে আর বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এ ধরনের আক্রমণ তাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে আর তাদের ভেতর গভীর অনিশ্চয়তার বোধ তৈরি করেছে। এই অনিশ্চয়তা বোধ তাদের নিজ ভূমিতে পরবাসী করেছে। রীয়াজ আদমশুমারি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করে দেখান যে, কীভাবে ১৯৯১ থেকে ২০০১-এর সময়ের সরকারি হিসাব থেকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাদ পড়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা না হলে তাকে সব সরকারই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু উল্লিখিত সময়ে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা না ঘটলেও হিন্দুদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগ এই দৃষ্টান্তকে ঠুনকো প্রমাণ করেছে বলে মনে করেন রীয়াজ। তিনি *প্রথম আলো*র এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা নয় লাখ কমে গেছে। এ জন্য হিন্দুদের মোট প্রজনন হার তুলনামূলকভাবে কম বলে দাবি করা হলেও প্রতিবেদক নিজস্ব অনুসন্ধানে জেনেছেন এর প্রধান কারণ দেশত্যাগ, যার মূলে রয়েছে সমাজে বিরাজমান ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ।[১২] এ ছাড়া বৈষম্যমূলক আইন আর পক্ষপাতমূলক সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র এই সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে।

২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারি-উত্তর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পর দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আক্রান্ত জায়গাগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের গড়েয়া ও কর্নিয়া জায়গা দুটি এর ভেতর ছিল। বসতবাড়ি, বাজার, মন্দির কোনোটিই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ছোবল থেকে বাদ যায়নি। একজন আক্রান্ত গ্রামবাসী আফসোস করে বলছিলেন, '৭১, ৯৬, ২০০৮, এমনকি বাবরি মসজিদ ভাঙার জের ধরে সারা দেশে হিন্দুদের ওপর সহিংসতা চললেও তার ঢেউ কর্নিয়াতে পড়েনি। তবে এবার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। বেছে বেছে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ওপর আক্রমণ করা হয়েছে।' পাশের একটি গুদামঘরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন ওই ঘরেই লুট করা সামগ্রী আর মালামাল জমা করা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এতটাই খারাপের দিকে গিয়েছিল কর্নিয়ায়।

দিনাজপুরের গড়েয়ায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার রূপ ছিল সবচেয়ে বীভৎস। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাউকেই করুণা দেখায়নি দাঙ্গাবাজরা। টিনের তৈরি ঘরবাড়ি ও দোকানে এমন তাণ্ডব চালানো হয়েছিল, দেখে মনে হয় যেন টর্নেডো বয়ে গেছে পুরো গ্রামের ওপর দিয়ে। সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা সুমি বেওয়া কেঁদে কেঁদে বর্ণনা দিচ্ছিলেন কীভাবে আক্রমণকারীরা তাঁর কান ছিঁড়ে দুল নিয়ে গেছে। সুমি বেওয়া অভিযোগ করেন, 'ওরা দলবেঁধে এসে আমাদের পেটাতে শুরু করে। চলে যাবার সময় বলে যায় ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, আমরা যেন এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। এ দেশ নাকি আমাদের নয়।'[১৩]

৭.

ফতোয়া আর সালিস কীভাবে স্থানীয় ও তার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় জীবনে স্থান করে নিচ্ছে, তার বিশদ বর্ণনা আছে 'ফতোয়া আর সালিসের রাজনীতি' অধ্যায়ে। একটি নির্দিষ্ট আদর্শ যখন সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, তার ভাবানুসারীরা নতুন কাঠামো তৈরি করে একধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বশে আনতে চায়। শুরুর দিকে ফতোয়ার পরিধি এলাকা পর্যায়ে ব্যক্তির ওপর সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে তা বড় হতে হতে সংগঠন, বিশেষ করে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকেও এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এমনকি প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এই নতুন বিধান রাষ্ট্রের সমর্থনে জায়গা করে নিয়েছে সংবিধানে। রীয়াজ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরকে উদ্ধৃত করে এই নতুন বিধানকে অভিহিত করেন 'জীবনযাপন আর জগৎসংসার সম্বন্ধে

দৃষ্টিভঙ্গি'। ধর্মকে কেন্দ্র করে একধরনের ব্যাখ্যা এ 'দৃষ্টিভঙ্গি'র মূল ভিত্তি। আর এই 'দৃষ্টিভঙ্গি' হচ্ছে একধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নমনীয় ও সহনশীল নয়। 'আতঙ্ক' ও 'সন্ত্রাস' তৈরি আর বিস্তারই হচ্ছে এ রাজনীতির মূল ইন্ধন।

উপসংহারে রীয়াজ ভয়ের সংস্কৃতির পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেন। যে সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি প্রবল, সেখানে রাষ্ট্র কর্তৃত্বপরায়ণ রূপ নেয়। আরেকটি পরিণতি হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, যেখানে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভয় মানুষকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করে। ভয়ের সংস্কৃতি মানুষকে হতাশ ও আশাহীন করে তোলে। এ অবস্থায় অনেকে চরম মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পৃথিবীজুড়ে চরমপন্থার রাজনীতির বিকাশ এই কারণে ঘটছে বলে মনে করেন রীয়াজ।

৮.

এ বছরের বর্ষবরণে অসংখ্য লোকের ভিড়ে একদল নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা মনে আছে। পয়লা বৈশাখের মতো সর্বজনীন উৎসবে নারীর অংশগ্রহণ রুখতে আর সহনশীল ও উদার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। মানুষকে আতঙ্কিত করতেই এই পরিকল্পিত সহিংসতা। আচিন ভানায়েককে উদ্ধৃত করে রীয়াজ বলছেন, 'সহিংসতা হলো এক নাটক। নাটক এই অর্থে যে তা অন্যদের সামনে বা জ্ঞাতসারে এটি ঘটানো হচ্ছে, যাতে করে এর প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে। যার ওপর প্রত্যক্ষ সহিংসতা চালানো হলো না, তাকেও জানানো হলো তারও এই পরিণতি হতে পারে (পৃষ্ঠা-১৩)।'

আতঙ্কবাজরা যখন আমাদের স্বাধীন মতপ্রকাশের আকাশটাকে কালো মেঘে ঢেকে দিচ্ছে, তখন তার আড়ালে থাকা আশার সূর্যটার কথা জানান দিতে ভোলেননি রীয়াজ। রীয়াজের মতে, ব্যক্তির কাছেই রয়েছে এই অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করার অস্ত্র। ব্যক্তিকে বশ্যতার বদলে প্রতিরোধ করতে হবে, সহ্য করার বদলে প্রতিবাদ করতে হবে এবং চুপচাপ থাকার বদলে সরব হতে হবে। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে যাত্রা শুরুর আগে রীয়াজ আমাদের কবিগুরুর সেই অমোঘ বাণীর কথা মনে করিয়ে দেন : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'

টীকা

১. সালমান তারিক কোরেশির শোকগাথা পড়তে দেখুন 'She Was Killed Because of Poetry', Salman Tarik Kureshi, *The Friday Times*, 01 May, 2015.http://www.thefridaytimes.com/tft/she-was-killed-because-of-poetry/

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন 'প্রান্তিকতা, সংস্কৃতি ও মতাদর্শ', বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৪৬, নভেম্বর ১৯৯২।

৩. বিস্তারিত জানতে পড়ুন *Inconvenient Truths About Bangladeshi Politics*, Ali Riaz, 2012, Prothoma Prokashan, Dhaka.

৪. প্রহসনের এসব বিচার আর এর শিকার হতভাগ্য মানুষের পরিসংখ্যান দেওয়া আছে এই বইয়ে—*Bangladesh : A Legacy of Blood*, Anthony Mascarenhas, 1986, Hodder and Stoughton Educational, London.

৫. ২০১৪ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ জানতে পড়ুন 'বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৪ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর পর্যালোচনা', ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫। http://www.askbd.org/ask/2014/12/31/human-rights-situation-2014-asks-observation/

৬. তিন মাসের রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতদের পরিসংখ্যান জানতে দেখুন http://www.askbd.org/ask/2015/05/05/political-violence-january-april-2015/

৭. ডেভিড বার্গম্যানের পরিসংখ্যান জানতে দেখুন 'Political Crisis 2015---Analysis of Deaths', David Bergman, 25 February, 2015. http://bangladeshpolitico.blogspot.com/2015/01/political-crisis-2015-analysis-of-deaths.html

৮. আরও জানতে পড়ুন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি : দেড় দশকের কীর্তন', নাসিরউদ্দিন রহমান, দৈনিক *ভোরের কাগজ*, ২০ মার্চ ২০১৩। http://www.bhorerkagoj.net/content/2013/03/20/23.jpg

৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন 'সংস্কৃতি, প্রান্তিকতা ও আত্মপরিচয়ের সংকট : বাংলাদেশে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী', প্রশান্ত ত্রিপুরা, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৪৬, নভেম্বর ১৯৯২।

১০. বিস্তারিত জানতে পড়ুন, 'Human Rights Report 2014 on Indigenous Peoples in Bangladesh', Kapaeeng Foundation, 2015, Dhaka.

১১. আইএলওর ধারাটি পড়তে দেখুন http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

১২. বিস্তারিত জানতে পড়ুন, '১০ বছরে ৯ লাখ হিন্দু কমেছে', শিশির মোড়ল, *প্রথম আলো* ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২।

১৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন 'Snap Shots of Ruined Villages', Rezaul Hoque, January 22, 2014. https://rezaulhoque.wordpress.com/2014/01/22/snap-shots-of-ruined-villages/

লেখক পরিচিতি

নুরুল ইসলাম

শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান (১৯৭২-৭৫)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসের (পরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস) পরিচালক হিসেবে সুদীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইমেরিটাস ফেলো। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *মেকিং অব নেশন : বাংলাদেশ : অ্যান ইকোনমিস্ট'স টেল* (ইউপিএল, ২০০৩); *এক্সপ্লোরেশন ইন ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ : সিলেক্টেড আর্টিকেলস অব নুরুল ইসলাম* (অ্যাশগেট, ২০০৩); *ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ : এ স্টাডি ইন পলিটিক্যাল ইকোনমি* (ইউপিএল, ১৯৭৯); *ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ* (পারগ্যামন, ১৯৭৮)।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট এবং ভাষাশহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালার পরিচালক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থপঞ্জি; বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা; মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চা; বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১; আফ্রিকার ইতিহাস; বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থপঞ্জি; বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন* ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে লেখকের ৫০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সারাহ গ্লিন

সারাহ গ্লিন একজন শিক্ষক এবং স্থপতি। তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান জিওগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক, সেন্ট এন্ড্রুতে ভূগোলবিদ্যার শিক্ষক সহকর্মী এবং সেন্ট এন্ড্রুস সেন্টার ফর হাউজিং রিসার্চের সহযোগী সদস্য। তিনি অক্সফোর্ড পলিটেকনিক এবং কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় পড়াশোনা করেন এবং একাডেমিয়ায় আসার আগে তেরো বছর স্থপতি হিসেবে কাজ করেন। লন্ডনের পূর্বাঞ্চলে অভিবাসীদের রাজনৈতিক গতিশীলতা নিয়ে লন্ডন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে "Safe as houses", *Scottish Left Review,* 42, 2007; "East End Immigrants and the Battle for Housing: a comparative study of political mobilisation in the Jewish and Bengali communities", *Journal of Historical Geography,* 31 pp 528-545,2005; "Bengali Muslims: the new East End radicals?" *Ethnic and Racial Studies,* 25:6 pp969-988, 2002 ইত্যাদি।

আশফাক হোসেন

আশফাক হোসেনের জন্ম ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৯, মৌলভীবাজার জেলা শহরে। সদর উপজেলার সাধুহাটি হলো তাঁর গ্রামের বাড়ি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নটিংহামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ ও এমফিল। এমফিল পর্যায়ে গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়; গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা পঁচিশের বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন অনন্য সাধারণ গবেষণার জন্য ২০১২-১৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচারপতি ইব্রাহিম স্মারক স্বর্ণপদক অর্জন করেন । তিনি ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মানবিক-সমাজবিজ্ঞান-বাণিজ্য সম্মিলিত শাখায় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গবেষক হিসেবে নির্বাচিত হন।

পাপড়ীন নাহার

পাপড়ীন নাহার নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ১৯৯৪-২০০৭ পর্যন্ত আইসিডিডিআরবিতে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তারপর ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স স্কুলে কাজ করেন। উন্নয়নশীল দেশ ও প্রবাসীদের স্বাস্থ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দিক তাঁর আগ্রহের গবেষণা বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে Translated by Papreen Nahar & Original by Sonia Nishat Amin (2003). *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939 (Translated from English to Bengali)*. Bangla Academy Publishers, Dhaka.

মার্টিন ভ্যান রিওয়্যাক

মার্টিন ইম্পেরিয়াল কলেজের পুরকৌশল ও পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদের ফ্লুইড মেকানিকস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক। তিনি ফ্লুইড মেকানিকস এ ডেল্ফট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি এবং পিএইচডি করেছেন।

রিয়া রিইস

রিয়া রিইস আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং আমস্টারডাম ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর হেলথ কেয়ার অ্যান্ড বডি রিসার্চ প্রোগ্রামের যুগ্ম পরিচালক। তিনি লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। পনেরো বছর ধরে তিনি শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি, দ্বন্দ্ব, অসমতা, কৌশল ও কল্যাণে কাজ করছেন।

মিজানুর রহমান খান

সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ। *প্রথম আলো*র যুগ্ম সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা: *তত্ত্বাবধায়ক সরকার: এর অশনিসংকেত* (আগামী, ২০০৯); *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫); *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* (প্রথমা, ২০১৩)।

রেজাউল হক

গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। ফরাসি ভাষার শিক্ষক ও সাংবাদিক ছিলেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন:

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন: ৮১৮০০৮১


প্রতিদিন
৫৫ লাখ*
পাঠক
বিশ্বজুড়ে পড়ছেন
প্রথম আলো
ন্যাশনাল মিডিয়া সার্ভে ও গুগল অ্যানালিটিক্স
প্রথম আলো

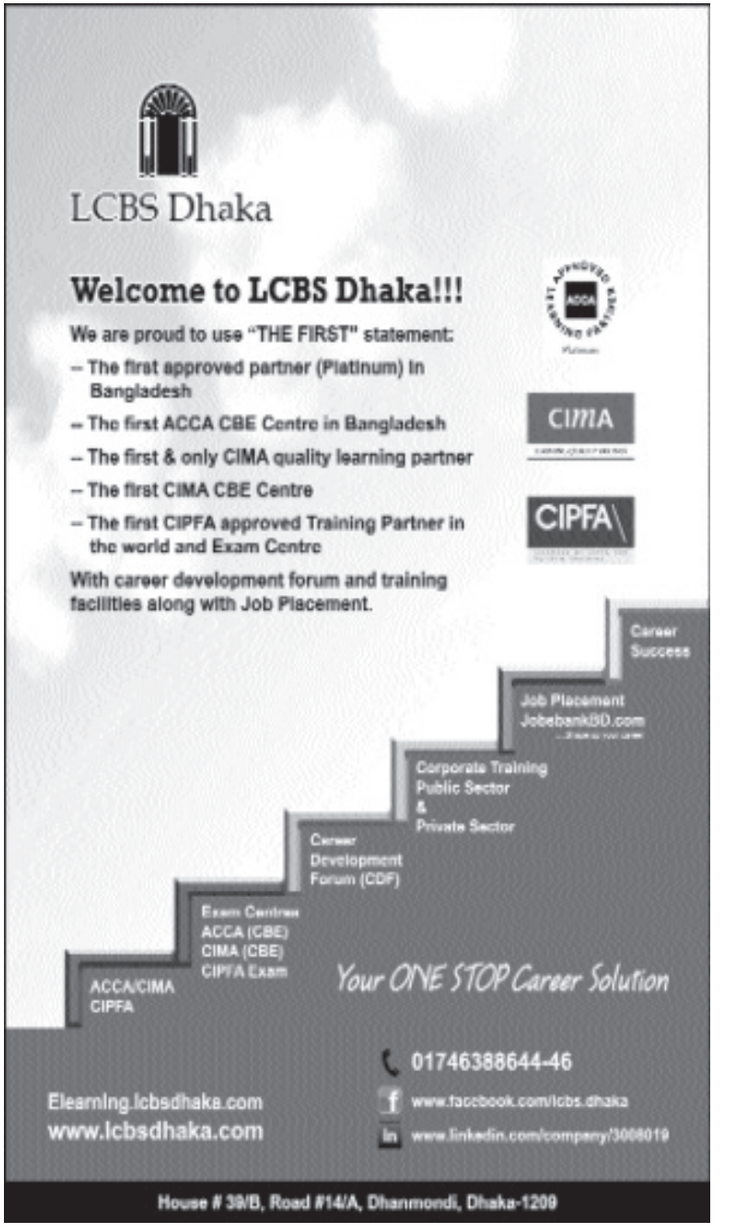
LCBS Dhaka
Welcome to LCBS Dhaka!!!
We are proud to use "THE FIRST" statement:
-- The first approved partner (Platinum) in Bangladesh
-- The first ACCA CBE Centre in Bangladesh
-- The first & only CIMA quality learning partner
-- The first CIMA CBE Centre
-- The first CIPFA approved Training Partner in the world and Exam Centre
With career development forum and training facilities along with Job Placement.
ACCA
CIMA
CIPFA
Career Success
Job Placement
Jobebank BD.com
Corporate Training
Public Sector
&
Private Sector
Career
Development
Forum (CDF)
Exam Centres
ACCA (CBE)
CIMA (CBE)
CIPFA Exam
ACCA/CIMA
CIPFA
Your ONE STOP Career Solution
01746388644-46
www.facebook.com/lcbs.dhaka
www.linkedin.com/company/3008019
Elearning.lcbsdhaka.com
www.lcbsdhaka.com
House # 39/B, Road #14/A, Dhanmondi, Dhaka-1209


Study in Abroad
Student, Spouse
Business & Visit
VISA Support
USA · Canada · Australia
Austria · Hungary · Slovakia
New Zealand · Germany
Finland · Sweden · Switzerland
UK · Cyprus · Malaysia · China
ইউরোপে একই ভিসায় SCHENGEN ভূক্ত ২৫টি দেশে ভিজিট করার সুযোগ।
Certificate / Diploma / Undergraduate /Postgraduate / Masters Programs
-এ প্রায় ৩০০ এর বেশি বিষয়ে পড়ার সুযোগ
বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী HSC ২০১৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক -এর মাধ্যমে
মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য
AirAsia Free Ticket
BSB
Global Network
Admission & Information
Plot-22, Gulshan Circle-2, Dhaka
Tel: 9890523, M: 01720557104-8, 0172057118/113